(প্রথম ভাগ)

(স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের সাথে কথোপকথন)

সম্পাদনা

স্বামী ঋতানন্দ

(প্রথম ভাগ)

(স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের সাথে কথোপকথন)

সম্পাদনা

স্বামী ঋতানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ সংঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের অনেকের সঙ্গলাভ করেছেন এবং মঠের আদিপর্বের জীবনচর্যা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে একান্তভাবে সুপরিচিত ছিলেন। এর ফলে এক অমূল্য স্মৃতি-ভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। একই সঙ্গে তাঁর ছিল উচ্চকোটির সাধুজীবন, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও প্রখর রসবোধ। সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের সঙ্গে শাস্ত্র এবং ধর্ম ও ধর্মজীবন সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় তাঁদের জিজ্ঞাসু মনের সংশয় নিরসনে মহারাজ অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি পেতেন। সেই সমস্ত তত্ত্বগর্ভ প্রশ্নোত্তর বহুবছর ধরে একান্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান সম্পাদক স্বামী ঋতানন্দ। তারই কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'পরিপ্রশ্ন' বিভাগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অনেকেই এই আলোচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মায়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ উৎসব উপলক্ষে বর্তমান বছরে আমরা 'পরিপ্রশ্ন' পুস্তকটির প্রথম ভাগ প্রকাশ করতে পারলাম। পুস্তকটি পরম শ্রদ্ধায় ও যত্নে সম্পাদনা করেছেন স্বামী ঋতানন্দ। আশা রাখি ধর্মপিপাসু, অনুসন্ধিৎসু সকলের মনের অনেক প্রশ্নের সমাধান স্বামী ভূতেশানন্দজীর সঙ্গে এইসব অমূল্য শাস্ত্রসঙ্গাত কথোপকথনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

এই পুস্তক প্রকাশে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ তাঁদের ওপর বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা।

১২ জুন ২০১৩ **স্বামী বিশ্বনাথানন্দ**

শ্রীমা সারদাদেবীর শুভ পদার্পণ জয়ন্তী অধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০০৩

সম্পাদকের কথা

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পরম আশীর্বাদে 'পরিপ্রশ্ন' গ্রন্থটির প্রথম ভাগ মায়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ তিথিতে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হল।

এই গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কথোপকথন ও আলাপচারিতার কিয়দংশ যথাযথভাবে প্রকাশের প্রয়াস।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে অনেকের সান্নিধ্য পেয়েছেন, দীর্ঘকাল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের জীবন অনুধ্যান করেছেন এবং রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃচ্ছ্রতা, ত্যাগ, তপস্যা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দীর্ঘকালব্যাপী সংঘের বিস্তার ও প্রচারের একজন সাক্ষিস্বরূপ। মহারাজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল তাঁর গুরু স্বামী সারদানন্দজীর মাতৃসুলভ ভাব। যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাঁর মাতৃভাবের স্পর্শ পেয়ে তারা সকলেই নিজেদের ধন্য মনে করেছে এবং তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আবার একটা আন্তরিক টান অনুভব করেছে। মহারাজের সন্নিধানে একটা আকর্ষণীয় আবহ তৈরি হতো। সেটা কখনো রঙ্গরস বা হাসিঠাট্টা দিয়ে শুরু হলেও বেশির ভাগ সময়ই শেষ হতো গভীর শাস্ত্রব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। আবার কখনো পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে মহারাজ যেন চলে যেতেন কোন্ সুদূর এক অজানালোকের চির আকাঙ্ক্ষিত স্মৃতিমেদুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের দিব্যজীবন-আঙিনায়। কখনো বা তাঁর রসবোধের বিচ্ছুরণে সমগ্র বাড়িটা আনন্দে উদ্বেল হয়ে হাসিতে ফেটে পড়ত। কখনো গভীর-গম্ভীর অনুধ্যানে তিনি উপস্থিত সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন জীবনের লক্ষ্যের প্রতি দুর্দমনীয় এক প্রতিজ্ঞার অঙ্গীকার।

মহারাজ রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের একজন বিচক্ষণ বোদ্ধা ও বিশ্লেষক। মানুষের সাথে কথোপকথন ও ভাববিনিময় ছিল তাঁর ভাবপ্রচারের এক বিশেষ অনুষঙ্গ। তাঁর জীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যখনই কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসত, তিনি কুশল জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে তার মনের যেকোন প্রশ্নের সমাধান অকাতরে করতেন। বিভিন্ন সময় যখন যেখানে থেকেছেন, তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলেই সাধু-ব্রহ্মচারীরা নির্বিবাদে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। ভক্তদেরও তিনি অকাতরে এরকম সংশয় মেটানোর অবকাশ দিতেন।

মহারাজের সঙ্গে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত এবং চিকিৎসকবৃন্দের যে প্রশ্নোত্তর-পর্ব চলত, সেগুলি যথাযথভাবে সংগ্রহ ও একত্রে সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। আমাদের আগ্রহ আরো ঘনীভূত হল ১৯৮৯ সালে মহারাজ বেলুড় মঠে অধ্যক্ষ হয়ে আসার পর থেকে। এর আগেও যোগোদ্যানে এবং অন্যত্র মহারাজের কথোপকথন, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা যতটা সম্ভব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে রাখার একটা চেষ্টা করছিলাম। মহারাজ মঠে অধ্যক্ষ হয়ে আসার পরে এই প্রয়াস যেন অন্য গতি পেল। আমরা কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী প্রতিদিন রাতের প্রসাদের পর মহারাজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হতাম। মহারাজ শুতে যাওয়ার আগে ১৫-২০ মিনিট সময় দিতেন। পরবর্তী কালে মহারাজের শারীরিক অসুস্থতার ফলে রাতের বদলে নিত্য প্রণামের সময় এই ধরনের প্রশ্নোত্তর-পর্বটি যেন একটা রুটিনে পরিণত হয়েছিল। সকল সাধু-ব্রহ্মচারী জানতেন যে, প্রণামের পর মহারাজের সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়ালেই আসরটি শুরু হবে। এই সুযোগে আমরা বেশ কয়েকজন মহারাজকে প্রশ্ন করার জন্য সাহস করে এগিয়ে যেতাম। মহারাজের কাছে নিঃশঙ্কে, নিশ্চিন্তে জিজ্ঞাসা করা যেত। হয়তো খুবই সাধারণ বা সামান্য অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন—তবুও মহারাজ ভরসা দিতেন, সাহস যোগাতেন এবং কখনো তিনিই যেন প্রশ্নটি ধরিয়ে দিতেন। তিনি বারবার আগ্রহ প্রকাশ করতেন : "তোমরা ভাল কথা বল, তোমাদের কী জিজ্ঞাসা আছে, তাড়াতাড়ি বল। সময় চলে

যাচ্ছে।" এই কথাগুলি মহারাজের সংস্পর্শে আসা প্রায় সকলেরই স্মরণে আসবে। তাঁদের কানে এখনো ঐ কথাগুলি নিশ্চয় অনুরণন তোলে। মনে পড়ে, সেসময়ে মঠের ম্যানেজার ছিলেন প্রয়াত সহ-সংঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ। মহারাজ প্রত্যেকদিন সকালে পূজনীয় মহারাজের কুশল সংবাদ নিতে যেতেন। ফেরার সময় আমরা মহারাজজীর প্রণামে যাচ্ছি দেখে বলতেন : "মহারাজের কাছ থেকে যত পার ঠাকুরের সন্তানদের কথা শুনে নাও, মঠের ট্র্যাডিশন জেনে নাও। এরপর এরকম মানুষ আর আমরা পাব না।"

কোন বিশেষ কারণ বা মহারাজের অসুস্থতার জন্য কখনো প্রশ্নোত্তর-পর্বটি সংঘটিত না হলে মহারাজ অখুশি হতেন। এটা লক্ষ করে তাঁর সেবকরাও আমাদের এগিয়ে দিতেন প্রশ্ন করতে—যাতে আলাপ-আলোচনায় মহারাজের মনটা খুশি থাকে। সকলেই তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে পারতেন। স্বামী নিরন্তরানন্দ (জগদীশ মহারাজ) ও আমিই হয়তো মহারাজের কাছে বেশি প্রশ্ন করেছি, তবে অন্যদেরও তিনি উৎসাহিত করতেন। প্রবীণদের মধ্যে যাঁরা প্রশ্ন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ে পূজনীয় শিবময়ানন্দজী মহারাজ, চেতনানন্দজী মহারাজ, নিখিলেশ্বরানন্দজী মহারাজ প্রমুখের কথা। মনে আছে—একবার চেতনানন্দজী মহারাজ পূজনীয় মহারাজের কাছে বিশেষ সময় নিয়ে হাজির হয়ে বললেন : "মহারাজ, আমার কাছে ৩৪টা প্রশ্ন আছে। গার্গী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে একটি একটি করে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, তেমনি আমিও আপনাকে এই ৩৪টা বাণ নিক্ষেপ করব।" মহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গালভরা হাসিতে তাঁকে পাশে বসতে বলে বললেন : "আমিও তোমার বাণগুলো একটা একটা করে ভেঙে দেব।"—বলেই দুজনের সে কী প্রাণখোলা হাসি! সেসব প্রশ্ন ও তার উত্তরও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার যাঁরা আমাদের প্রশ্ন করতে উসকে দিতেন ও নিজেরাও কখনো প্রশ্ন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে পূজনীয় উমানাথানন্দজী (শ্রীশ মহারাজ), শুদ্ধব্রতানন্দজী (আনন্দ মহারাজ),

তপনানন্দজী (মিহির মহারাজ), বরানন্দজী (গোবিন্দ মহারাজ), মুক্তিনাথানন্দজী (সুজিত মহারাজ) প্রমুখের কথা স্মরণ না করলে অপরাধ হবে।

দীর্ঘ কয়েক বছর আমরা মহারাজকে এভাবে প্রশ্ন করতে এবং উত্তর পেতে আগ্রহী হয়েছি লক্ষ করে কিছু প্রবীণ সন্ন্যাসী মহারাজও কখনো সংঘের পুরনো দিনের প্রসঙ্গ তুলতেন ও বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক সমস্যার উল্লেখ করতেন। অনেকের কথাই এখন মনে পড়ছে। সেসব প্রশ্ন ও তার উত্তরে মহারাজের বক্তব্য যতটা আমাদের সংগ্রহে আছে—তা পুস্তকাকারে কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করার আগ্রহ বহুদিন আগে থেকেই আমাদের মনে ছিল। এরই মধ্যে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১১১তম বর্ষের (২০০৯ সাল) মাঘ সংখ্যা থেকে কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। কয়েকটি পর্ব প্রকাশের অব্যবহিত পর থেকেই সাধু, ব্রহ্মচারী, ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছ থেকে বারবার ফোন, চিঠি, ই-মেল এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে অসংখ্য অনুরোধ আসছিল আলোচনাগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য। এর মধ্যে মঠের বিশিষ্ট ও প্রবীণ সাধুরাও রয়েছেন। মহারাজের দিব্য আধ্যাত্মিক জীবন, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, মঠের ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর ব্যাপক ধারণা ও অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন বিষয়ে স্মৃতিচারণ এবং সর্বোপরি তাঁর সাবলীল ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি আমাদের যেভাবে প্রত্যয় বাড়িয়েছেন—এগুলি যথাযথভাবে গ্রন্থাকারে বিধৃত থাকুক সকলেই আশা পোষণ করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের পটভূমিতে অমূল্য উপাদান মনে করে অনেক প্রবীণ সাধুই আমাদের প্রশ্নোত্তর-ভাণ্ডারটিকে সংরক্ষিত রাখার উপদেশ দিয়েছেন। পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী বিদেশ থেকে বেশ কয়েকবার প্রয়োজনীয় ক্যাসেট পাঠিয়েছেন; সতর্ক করেছেন—মহারাজের কথাগুলি যেন কখনোই miss না করি ক্যাসেট বা অর্থের অভাবে। স্বামী বরানন্দজী নিজের ছোট টেপ-রেকর্ডারটি দিয়ে রেখেছিলেন এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারকে ধরে রাখার জন্য। এপ্রসঙ্গে ঢাকা মঠ ও মিশনের স্বামী স্থিরাত্মানন্দজী মহারাজ

(নিরঞ্জন মহারাজ)-এর কথা মনে পড়ছে। পূজনীয় মহারাজের আলোচনাগুলি অনেকদিন আমার খাতায় ও ক্যাসেটে আবদ্ধ ছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলি ধীরে ধীরে অনুলিখন করি কয়েকবছর ধরে। কিন্তু সেগুলি বাংলায় টাইপ করার তেমন ব্যবস্থা বেলুড় মঠে ছিল না। নিরঞ্জন মহারাজ কিছু কিছু করে ক্যাসেট নিয়ে খাতার সঙ্গে মিলিয়ে টাইপ করে মোট পাঁচটি খাতা পাঠিয়ে দেন। তারপর থেকেই এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার আগ্রহ প্রবল হয়। এঁদের কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ। মহারাজের ভাব-ভাষা, বাচনশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সর্বাঙ্গীণভাবে অটুট ও অবিকৃত থাকে তার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে কাজটি করতে হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং পূজ্যপাদ মহারাজের আশীর্বাদ ও কৃপায় এটি সম্ভব হয়েছে—সন্দেহ নেই।

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ উৎসবে বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। মহারাজের জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের অন্যতম স্বামী শিবানন্দ মহারাজের। মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্য, আশীর্বাদ ও অসীম কৃপা পেয়েছেন ভূতেশানন্দজী। তাঁর নিজের মন্ত্রগুরু স্বামী সারদানন্দজীর মাতৃভাব যেমন তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি মহাপুরুষ মহারাজের শরণাগতির ভাবও সমভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। 'পরিপ্রশ্ন' গ্রন্থের প্রথম ভাগটি মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণে উৎসর্গ করে আমরাও ধন্য বোধ করছি।

বর্তমান গ্রন্থটি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত ও অনুরাগীদের মনের জিজ্ঞাসাকে শাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের আলোকে তৃপ্ত করে সকলের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে, এই আমাদের আশা। সেখানেই এই গ্রন্থপ্রকাশের সার্থকতা। বইটির প্রস্তুতিতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও মহারাজের আশীর্বাদ অঝোরে ঝরে পড়ুক—তাঁদের শ্রীচরণে আমাদের এই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ তিথি

১২ জুন ২০১৩

স্বামী ঋতানন্দ

॥ ১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করি। কিন্তু ঠাকুরের তো অনন্ত ভাব। তাঁর কোন্ ভাবটি নিয়ে ধ্যান করব?

মহারাজ : আমরা ঠাকুরের ধ্যান করি। ঠাকুর সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা। তা থাকবেই, কারণ তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। যতই আমাদের নিজেদের পরিবর্তন হতে থাকে, ততই আমাদের আদর্শ আরো স্পষ্ট হতে থাকে। আদর্শ বিবর্তিত হয়। মানে, যেমন দূর থেকে একটা বাড়ি দেখছি অস্পষ্টভাবে—যেন একটা রূপরেখা। যতই বাড়িটির কাছে এগোচ্ছি, ততই সেটি আমাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

প্রশ্ন : ধ্যানের সময় চোখ বুজতে হয় কেন? ঠাকুরের ছবির দিকে চেয়ে থাকলে হয় না?

মহারাজ : চোখ বুজতে হয় কারণ, মনে হয় আমরা ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে আছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা-ওটা দেখছি, চোখ এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে। চোখ সর্বদা এক জায়গায় থাকে না। অনেকে একটা বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু দৃষ্টি একটা বিন্দুতে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তাই চোখ বুজতে হয়। চোখ বুজলে বাইরের বিক্ষেপগুলি প্রতিহত হল। এখন শুধু ভিতরের বিক্ষেপগুলিকে দূর করার চেষ্টা। চোখ খুলে রাখলে ভিতর ও বাহির দুদিকের বিক্ষেপই রয়ে গেল। সুতরাং চোখ বুজে ধ্যান করলে বিক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা কমে যায়। ধ্যান করতে করতে ভিতরের বিক্ষেপও দূর হয়। ধ্যান মানে

বিজাতীয় বৃত্তির নিরাকরণ এবং স্বজাতীয় বৃত্তির সন্ততি। প্রকৃত ধ্যানে ধ্যান, ধ্যাতা ও ধ্যেয় এক হয়ে যায়। মন তখন থাকে না। কারণ, মন মানেই সঙ্কল্প-বিকল্প অর্থাৎ চঞ্চলতা। মন যখন একেবারে স্থির, তখন মন আর থাকে না। এজন্যই বলা হয়—ধ্যান, ধ্যাতা ও ধ্যেয় এক হয়ে যায়।

আরেকটা কথা—ধ্যানের সময় ইষ্টের সত্তার কথা মনে রাখতে হয়। যেমন, এখন আমি ঠাকুরের সমাধির ছবিটি ধ্যান করছি। পুরোটা সবসময় আসছে না। কখনো মুখটা দেখছি, কখনো বুকের ওপর কাপড়টা দেখছি। এরকম করতে করতে যখন ধ্যান গাঢ় হবে তখন ঠাকুরের মন, ঠাকুরের দৃষ্টি কোন্ গভীরে রয়েছে অর্থাৎ তাঁর সত্তার গভীরে আমরাও ডুব দেব। এখন আপাতদৃষ্টিতে ঠাকুরের ছবিটি দেখে আমরা বুঝতে পারব না যে, ঠাকুরের দৃষ্টি কোন্ গভীরে চলে গেছে। কিন্তু যতই আমাদের ধ্যান গভীর হবে, যতই গভীরভাবে চিন্তা করব ততই ঠাকুরের সত্তার পরিচয় আমরা পাব।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা তো ধ্যান ছাড়াও জপ করি। আবার জপ করার সময় ধ্যানও তো করতে হয়, তাই না?

মহারাজ : ধ্যান ও জপ আলাদা কিছু নয়। দুটো প্রকৃতপক্ষে একই, একাগ্র মনে জপ করা ধ্যানই। তাই জপ করতে করতে ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান করতে হয়। আর ধ্যান মানে আমরা বুঝি ঠাকুরের মূর্তিচিন্তা। এই ঠাকুরের বসা ছবিটি মনে করার চেস্টা করা। আসলে ধ্যান মানে শুধু মূর্তিচিন্তা করা নয়। ধ্যান হচ্ছে তত্ত্বচিন্তা, স্বরূপচিন্তা। ধ্যানের সময় ঠাকুরের স্বরূপচিন্তা করতে হয়। স্বরূপচিন্তা কিন্তু গুণচিন্তন বা লীলাচিন্তন নয়। যাঁর লীলা যাঁর গুণ চিন্তন করছি—তাঁর চিন্তা করা হচ্ছে তত্ত্বচিন্তা বা স্বরূপচিন্তা। আমাদের মন পবিত্র ও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকলে এটা আমরা ধরতে পারব। এখন আমাদের মন শুধু স্থূল জিনিস ধরতে পারে। তাই আমরা গুণচিন্তন করতে পারি। কিন্তু মন শুদ্ধ হতে থাকলে, সূক্ষ্ম জিনিস মন ধরতে পারবে। তখন ঠাকুরের তত্ত্বচিন্তা সম্ভব।

যেমন—ধরা যাক, ঠাকুরের বসা ধ্যানমূর্তিটি। ঠাকুর নিজে বলেছেন : "এ খুব উঁচু যোগের অবস্থা।" আমরা কি কিছু বুঝি? কেন বুঝি না? কারণ, উচ্চ যোগের অবস্থা বুঝতে গেলে যোগী হতে হবে। আমরা যোগী নই, তাই সেটা বুঝতে পারি না। তবে ছবিটিকে গভীরভাবে ধ্যান করলে, দেখলে, চিন্তা করলে একটা জিনিস বোঝা যায়। যদিও এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ধারণা বা অনুভব। নিজের যেমন মনে হয়, তাই বলছি। সেটা হল ঠাকুরের গভীর অন্তর্মুখিতা। চোখদুটি যেন প্রায় বন্ধ। জগৎ যেন তাতে লয় হয়ে গেছে। বাইরের কোন হুঁশই নেই। কী অন্তর্মুখিতা! যেন কোথায় ডুবে রয়েছেন। জগতের হুঁশ নেই। এই অন্তর্মুখী অবস্থায় ঠাকুর কী ভাবছেন বা কিসে ডুবে রয়েছেন, সেটি ধ্যানের সময় আমাদেরও ভাবা দরকার। তাছাড়া ভাবা যেতে পারে যে, যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ-রূপে যুগে যুগে জগৎকল্যাণের জন্য অবতার হয়ে এসেছিলেন—তিনিই এবার (স্বয়ং ভগবান) মায়া অবলম্বনে মানুষ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এসেছেন—এরকম। 'শিবমহিম্নঃস্তোত্র'-এ এক জায়গায় আছে—শিবকে সম্বোধন করে পুষ্পদন্ত বলছেন—যোগীরা ধ্যানে যে-তত্ত্ব চিন্তা করে সেটি তুমিই—

> "মনঃ প্রত্যক্‌চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ
> প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।
> যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে
> দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্॥" (২৫)

অর্থাৎ, যমাদিযুক্ত যোগীরা শাস্ত্রানুযায়ী প্রাণায়াম-সহায়ে প্রত্যগাত্মাতে মনকে সমাহিত করে পুলকিত শরীরে ও আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে যে অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয় তত্ত্ব দর্শনপূর্বক অমৃতময় হ্রদে নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় আহ্লাদিত হয়ে থাকেন, তা অবশ্য তুমিই।

প্রশ্ন : জপ-ধ্যানের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি চিন্তা করার সময় শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিও মাঝে মাঝে মনে ওঠে। কিন্তু সংশয় হয় যে, যখন ঠাকুরের নাম জপ ও তাঁর ধ্যান করছি তখন মায়ের মূর্তি মনে এলে ঐ মূর্তিই ধ্যান

করা উচিত, না মায়ের মূর্তির চিন্তা প্রতিরোধ করে ঠাকুরের মূর্তি মনে আনার চেষ্টা করা উচিত?

মহারাজ : অনেকের মনে এই সংশয় আসে। এর উত্তর হচ্ছে—যখন ঠাকুরের নাম জপ করছি, তখন ঠাকুরের মূর্তিই বিশেষ করে মনে কেন্দ্রিত হওয়া উচিত। তবে মা আর ঠাকুর যে অভিন্ন, মা একথা নিজেও বলেছেন। কিন্তু মূর্তি তো ভিন্ন। কাজেই, যখন ঠাকুরের চিন্তা করব, তখন ঠাকুরেরই মূর্তি চিন্তা করব। তারপরে অবশ্য মাকে ঠাকুরের সঙ্গে অভিন্ন বুদ্ধিতে চিন্তা করতে পারি। একসঙ্গে এটা করব, না, ওটা করব—ওরকম সংশয় মনে রাখা ঠিক নয়। মনকে যখন কেন্দ্রীভূত করার জন্য জপ করছি, তখন একটি মূর্তিতেই মনকে নিবিষ্ট করা প্রয়োজন। তবে ঠাকুরের সন্তানেরা কখনো কখনো একই জনকে দুটি মন্ত্রও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে একসঙ্গে তো আর দুটি মন্ত্রই জপ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আগে ঠাকুরের মন্ত্র জপ করে তারপরে মায়ের মন্ত্র জপ করতে হবে। আর তোমরা যা বলছ, সেক্ষেত্রে ঠাকুরের মন্ত্র জপ করার সময় ঠাকুরের মূর্তিই আগে চিন্তা করতে হয়। তারপর ইচ্ছা হলে মায়ের মূর্তি চিন্তা করতে পার। এর জন্য আলাদা কোন মন্ত্র জপ করার দরকার নেই। এ হল বাস্তবসম্মত কথা। তবে যদি তোমরা গুরুর কাছে অন্য কোন নির্দেশ পেয়ে থাক, তবে তাই মেনে চলবে। তাতে কোন সংশয় করবে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, মন যে একাগ্র হয় না, উপায় কী?

মহারাজ : ধ্যানের সময় লক্ষ করলে দেখা যায়, মনে সর্বদাই চিন্তার স্রোত চলছে। মনকে চিন্তাশূন্য করা দুরূহ। আর আশ্চর্য কী—আমরা সেই চিন্তার স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলি। অনেকক্ষণ পর যখন সচেতন হই, বলি—'কী সব মাথামুণ্ডু ভাবছিলাম।' অর্থাৎ সচেতন ছিলাম না। মন আমাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল, আমিও সেইদিকেই যাচ্ছিলাম। মনকে লক্ষ করলে, মনকে পরখ করলে ধীরে ধীরে মনের স্রোত আমাদের টেনে নিতে পারে না। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে। মন আমার

ওপর আধিপত্য করতে পারে না। আমরা মনের ওপর আধিপত্য করতে পারি। মনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমি খুব ভাবি। সেটি হল—একই মন দুভাগে বিভক্ত। একটি দ্রষ্টা-মন আর অপরটি দৃশ্য-মন। দ্রষ্টা-মন যখন দৃশ্য-মনকে পরখ করে, তখন মনের চিন্তার সঙ্গে আমাদের আর ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বামীজী বলেছেন : "আসনে বসেই ধ্যান শুরু করবে না। মনকে কিছুক্ষণ লক্ষ কর। মন কী করছে লক্ষ কর। দেখবে ধীরে ধীরে মনের ছোটাছুটি বন্ধ হয়ে আসবে। মন একাগ্র হবে। তারপর ধ্যান করতে হবে।" তাই বলছিলাম, মনকে চিন্তাশূন্য করা অত্যন্ত কঠিন। অনেকের ধারণা চিন্তাকে একেবারে রুদ্ধ করলে মানুষ তো জড় হয়ে যাবে। না, মানুষ কখনোই জড় হতে পারে না। চিন্তাকে রুদ্ধ করলে বা মনকে বৃত্তিশূন্য করলে সমাধি হবে। তিন অবস্থায় মন কার্য করে না—মূর্ছা, সুষুপ্তি আর সমাধি। সুষুপ্তিতে মন কার্য বন্ধ করে স্বাভাবিকভাবে, আর সমাধিতে মন কার্য বন্ধ করে সাধনার দ্বারা।

প্রশ্ন : মহারাজ, ধ্যান ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে তফাত কী?

মহারাজ : ধ্যান ও নিদিধ্যাসন এক নয়। ধ্যান হল বিজাতীয় বৃত্তির দূরীকরণ এবং স্বজাতীয় বৃত্তির সন্ততি বা প্রবাহ। আর নিদিধ্যাসন হল বৃত্তিরহিত অবস্থা, শান্ত অবস্থা। ঐ যে মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥" (২।২।৪)

—প্রণব ধনু, শর আত্মা। আত্মা মানে এখানে জীবাত্মা। 'ব্রহ্ম তদ্ লক্ষ্যম্ উচ্যতে'—ব্রহ্মই লক্ষ্য। 'অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং'—অপ্রমত্ত হয়ে তাঁকে ভেদ করতে হবে। এই 'অপ্রমত্তেন'—এটাই ধ্যান। আর 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'—সেই ব্রহ্মকে ভেদ করে তাঁতে স্থিতি—সেটাই নিদিধ্যাসন। সেখানেও সাবধান থাকতে হয়। তাই বলছেন, 'শরবৎ তন্ময়ো'—সেখানে একেবারে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা, স্খলন বা চ্যুতির কারণ আর না থাকা।

প্রশ্ন : মহারাজ, ধ্যানের পক্ষে কীরকম স্থান অনুকূল বা প্রশস্ত?

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) একজায়গায় বলেছেন : "চাঁদের আলোয় ধ্যান করতে নেই।" কারণ, চাঁদের আলোয় মনে অন্যরকম ভাবের সৃষ্টি হয়। বিলাসিতার ভাব আসে। ধ্যানের জন্য খোলা মাঠ, পর্বত, নদীর কূল—এগুলি প্রশস্ত। সমুদ্রের তীর প্রশস্ত নয়। সেখানে খুব বাতাস বয়। আবার একেবারে বাতাসহীন স্থানও ধ্যানের অনুকূল নয়। ধ্যানের জন্য গুহা অনুকূল। "তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।"

রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলেছেন : "এক এক জায়গা এক এক সময় ধ্যানের জন্য অনুকূল।" তা-ও আছে। স্থান-মাহাত্ম্য আছে। উঁচু পর্বত ধ্যানের স্থান। আমরা দেখেছি, পুরী ভজন-কীর্তনের অনুকূল স্থান—ধ্যানের স্থান নয়। ওখানে ভজন-কীর্তনের একটা ভাব আসে।

এসব যাই হোক, আসল কথা—আগ্রহ। আগ্রহ থাকলে যেকোন স্থানেই হবে। ঠাকুরের জীবনটা দেখলেই হয়। সমগ্র জীবনের সকল সাধনাই তিনি একজায়গায় থেকে করলেন। আমাদেরও যেকোন উপায়ে ঠাকুরকে মনে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে। মন একাগ্র হলে স্বাভাবিকভাবে ধ্যান হতে থাকবে। এপ্রসঙ্গে উত্তরকাশীর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একজন প্রবীণ সাধু লক্ষ করলেন যে, একজন নবীন সাধু বারবার ধ্যানের স্থান পরিবর্তন করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন এমনটা করছ?" যুবক সাধু বললেন—"যেখানেই বসছি, গাছের ওপর পাখিগুলি খুব কিচিরমিচির করছে।" একথা শুনে বৃদ্ধ সাধু বললেন—"বাবা, আগে নিজের মনের কিচিরমিচির বন্ধ কর।"

প্রশ্ন : ধ্যান তো একপ্রকার কল্পনা, মহারাজ? কল্পনা কী করে সদ্‌বস্তুর অনুভব আনবে?

মহারাজ : ধ্যান এবং কল্পনার ভিতর তফাত আছে। কল্পনা হচ্ছে অবাস্তব বিষয়ের চিন্তা করা—যে-বিষয় বাস্তবে নেই। আর ধ্যানে যে-বিষয়ের

চিন্তা করা হয় তার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি যে, আমাদের ধ্যানের বস্তুর অস্তিত্ব আছে। যদিও এখন আমরা কল্পনার সাহায্যেই ধ্যান করার চেষ্টা করছি, তবু সেটা নিছক কল্পনা নয়। অবাস্তব জিনিসের, যার কোন প্রকৃত সত্তা নেই—তার চিন্তা হল কল্পনা। যেমন, আকাশে বাগান কল্পনা করা। এটার বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। এটা শুধুই কল্পনা। আকাশে বাগান থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ধ্যানের বিষয়বস্তুর অস্তিত্বে আমরা অবিশ্বাস করি না। স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন যে, যদি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মত্ব না হতো, হাজার মনন-নিদিধ্যাসন আমাদের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করাতে পারত না। যেহেতু আমাদের সত্তা ব্রহ্মত্ব—মনন-নিদিধ্যাসন কেবল সেই স্বরূপের বিপরীত জ্ঞান বা অনুভবকে দূর করে আমাদের স্বরূপ অনুভবে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : জপধ্যান করতে বসে মাঝে মাঝে তো আমাদের মন বসে না, তখন কি উঠে পড়ব?

মহারাজ : উঠে পড়বে কেন? চেষ্টা করবে যাতে বসে। তাতেও না হলে কিছুটা করে সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করে নেবে। আবার বসার চেষ্টা করবে। ধ্যানজপের সময় মনে যেসব ভরা আছে, সেগুলোই ওঠে। মনের তো এখনই সে জোর নেই যে, বাজে চিন্তা সরিয়ে দিয়ে ঠাকুরের চিন্তা করবে। কাজেই এগুলি হবেই। উপায়—যথাসম্ভব মন থেকে অন্য চিন্তা সরিয়ে তাঁর চিন্তা বেশি করে করা। নইলে যা দিয়ে মন ভর্তি সেই ফুটগুলোই উঠবে। আর সেগুলোই মনকে চঞ্চল করে তোলে এবং সাধককে আসন থেকে উঠতে যেন বাধ্য করে। আসল কথা কী, সারাটা দিন কাজকর্ম করে, গল্পগুজব করে, নানাভাবে সময় কাটিয়ে সামান্য সময়ের জন্য সাধনভজন করতে বসা। সাধনভজন কি এতই সোজা? এমন করে কি হয়? প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাচ্ছে, দিনগুলি বৃথা কেটে যাচ্ছে—একথা ভাবলে তো অস্থির হতে হয়, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। আমাদের কোথায় সে-ব্যাকুলতা? অধিকাংশের ভাবই হল—হচ্ছে-হবে, যাচ্ছি-যাব। যদিও সেরকম তীব্র ব্যাকুলতা সাধারণ

মানুষের হয় না। কত বছরের অবিরাম সংগ্রাম ও নিরন্তর সাধনায় ব্যাকুলতা আসে। অশান্তি চাই। রাজা মহারাজ বলেছেন, মনের মধ্যে তাঁকে না পাওয়ার একটা অশান্তি জাগিয়ে রাখতে হয়। খুব বড় কথা। অশান্তি অগ্রগতির মূল। না পাওয়ার অশান্তি চাই।

॥ ২ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলা হয় কেন? রাম, কৃষ্ণ—এঁরা কি কেউ কম?

মহারাজ : না, ঠাকুর—আমাদের ঠাকুর কিনা! কাজেই তিনি বরিষ্ঠ! (হাসি)। একটা দিক আমি বলি যে, বরিষ্ঠ বলার কারণ—তখনকার দিনে—প্রাচীনকালে মানুষের জীবন সহজ সরল ছিল। তার সমস্যাগুলিও জটিল ছিল না। যত দিন যাচ্ছে, তত মানুষের জীবনে জটিলতা বাড়ছে। আর সমস্যাগুলিও জটিল হচ্ছে, সমাধানও দুঃসাধ্য হচ্ছে। এত দুঃসাধ্য ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে যে অপূর্ব শক্তির প্রকাশ হয়েছে, তা প্রাচীনকালে দরকার ছিল না। এখন দরকার হয়েছে। এইজন্য অবতার যখন আসেন, তখন প্রয়োজন অনুসারে তাঁর ভিতর থেকে—অনন্ত শক্তির ভিতর থেকে যতটুকু প্রয়োজন, তিনি ততটুকু বার করেন। অনন্ত শক্তির প্রকাশ করে তো লাভ নেই কিছু, কেউ ধরতে পারবে না। এইজন্য যখন যেমন শক্তির প্রয়োজন, তখন সে-অবতারের সেরকম শক্তির প্রকাশ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে বর্তমান যুগের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যে-শক্তির প্রকাশ হয়েছে, তা অসাধারণ। এই অসাধারণ শক্তির প্রকাশের জন্য তাঁকে অবতারশ্রেষ্ঠ বলা হয়। এই একটা দিক।

আরেকটা দিক, প্রাচীনকালে জগৎটা ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এক খণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য খণ্ডের অধিবাসীদের যোগ ছিল না। তার ফলে কোন জায়গায় কোন সমস্যা উঠলে সেই খণ্ডের অধিবাসীরা শুধু তাতে যুক্ত হতো। আর বর্তমান কালে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে

মানুষের সর্বত্র অবাধ গতিবিধি হয়েছে। তার ফলে জগতের যেকোন প্রান্তে একটা সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমস্ত জগতের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে ঠাকুর এসে যে সমস্যার সমাধান করেছেন, তাতে সমস্ত জগতের লোক লাভবান হচ্ছে। এই বিশালতা, ব্যাপকতাকে লক্ষ করেও তাঁকে অবতারশ্রেষ্ঠ বলা হয়। প্রাচীনকালে অবতারদের কর্মক্ষেত্র ছিল সীমিত। ঠাকুরের ক্ষেত্র অসীম। এই দৃষ্টিতে দেখে তাঁকে অবতারশ্রেষ্ঠ বলা হয়। তা না হলে, অবতারের ভিতরে কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউ নিকৃষ্ট হলে তাঁদের অবতার বলা যায় না। ভগবানের অবতার—ভগবান অনন্ত, তাঁর খণ্ড হয় না। তাঁকে সীমিত করা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক অবতারের ভিতরেই অনন্ত শক্তি রয়েছে। কিন্তু তার বিকাশ হয় যুগের প্রয়োজন অনুসারে। হয়েছে?

—মহারাজ, এই যে শক্তির প্রকাশ, এ তো জড়শক্তি নয়, আধ্যাত্মিক শক্তি।

মহারাজ : হ্যাঁ, জড়শক্তি নয়, আধ্যাত্মিক শক্তি। প্রাচীনকালে অবতারেরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এবারে 'প্রণাম অস্ত্র'। গিরিশবাবু বলতেন। এবারে আর কোন অস্ত্র নেই। কোন অবতার কি বলেছেন—আমি কিছু নই, আমি কিছু নই? কোন অবতার বলেননি। ঠাকুর বারবার বলেছেন। এই যে আত্ম-অবলুপ্তি, এটি ঠাকুরের ভিতর যেমন দেখা যায়, আর কোন অবতারের ভিতর তেমন দেখা যায় না। অথবা অবতারদের যাঁরা বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সেই ভাবটি পছন্দ করতেন না। অনন্ত শক্তি ও অলৌকিকত্বের ওপরেই যেন তাঁরা বেশি বিশ্বাস করতেন! আমরা ঠাকুরের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে বুঝেও যেমন সাধারণ মানুষের মতো তাঁকে গ্রহণ করতে পারছি, পূর্বের অবতারদের এরকমভাবে গ্রহণ করা যেত না।

—মহারাজ, একটা কথা বললেন যে, ব্যাপকতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার পরিধি বিশালতম। কিন্তু আগেকার অবতারপুরুষদের শিক্ষাও তো এখনো জগৎকে ব্যাপ্ত করছে।

মহারাজ : কতদিন পরে?

—অনেকদিন পরে। এখন বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ার ফলে সেটা জগতে এসেছে।

মহারাজ : এখন আমরা বুদ্ধকে অবতার বলি। আগে কজন জানত বুদ্ধকে? বুদ্ধের প্রভাব কতটুকু ছিল?

—কিন্তু মহারাজ, সব অবতারই তো সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্যই আসেন।

মহারাজ : আসেন ঠিকই, কিন্তু জগতের কল্যাণের প্রয়োজন হয় এক এক সময় এক এক রকম। সবসময় একরকম প্রয়োজন হয় না। জগৎটাও আমাদের দৃষ্টিতে এক এক সময় এক এক রকমভাবে প্রকাশিত হয়।

—কিন্তু মহারাজ, বর্তমান কালে ঠাকুরের কথা বা ঠাকুরের জীবন ও বাণীর প্রচার সমগ্র জগতে আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় বা মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে, কিন্তু অন্য অবতারদের তো সেরকম হয়নি। তাহলে আমরা কি করে দাবি করব যে, সেটা অন্য জাতির এবং অন্য দেশের জন্যও?

মহারাজ : এখন আমরা হিসাব করে বলছি, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য অবতার। কিন্তু আগে তো সে-হিসাব ছিল না। যিশুখ্রিস্ট যখন জন্মেছেন, তখন সকলের বিশ্বাস ছিল, তিনি এসেছেন ইহুদিদের জন্য। যিশু নিজেও তাই মনে করতেন। একটি সামারিটান মেয়েকে যিশু বলছেন—"তুমি আমার কাছ থেকে চাইছ কেন? আমি তো তোমাদের জন্য নই, আমি তো ইহুদিদের জন্য জন্মেছি।" মেয়েটিও খুব বুদ্ধিমতী। সে বলল—"সে-কথা ঠিক। তোমরা যখন টেবিলে বসে খাবে, টেবিল থেকে খাবারের টুকরো-টাকরা যাকিছু পড়বে তা আমি কি একটু পেতে পারি না?" যাহোক, যিশুর সময় যিশুর ছিল ছোট্ট জগৎ। যেখানে জন্মেছেন—সেটাই তাঁর জগৎ।

—চৈতন্যদেবও তো অবতার ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষার পরিধিও খুব ছোট।

মহারাজ : সব জায়গাতেই যত অবতার এসেছেন, সকলের ক্ষেত্রেই সেকথা প্রযোজ্য। এখন আমরা কৃষ্ণ বা বুদ্ধকে যেভাবে জানছি বা বুঝছি, আগে কি তাঁদের সেভাবে বোঝা হতো? জগতে বুদ্ধির যত প্রসার হচ্ছে, তাঁদেরও প্রসার ব্যাপক হচ্ছে। তবে ঠাকুরের লীলা অসাধারণ। আমরা একথাও বলতে পারি যে, ঠাকুরের নামই কি সকলে জানত বা এখনো কি সকলে জানে? নামের কথা নয়, ভাবের কথা। একটি ঘটনা শুনেছি। বলছি সেটি। দক্ষিণ ভারতের একটি অখ্যাত জায়গা। আমাদের একজন সাধু বেড়াতে গেছেন। সেখানে একটি পানের দোকানে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি দেখে অবাক হয়ে গেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি এখানে এ-ছবি কোত্থেকে পেলে?" দোকানি বলল—"এখন মনে নেই কোত্থেকে পেয়েছি, কিন্তু এ-ছবিটি আমার পক্ষে কল্যাণকর।" আশ্চর্য ব্যাপার!

আর একবারের কথা। আমাদের একজন প্রাচীন সাধু (স্বামী পূর্ণানন্দ) কেদার-বদরি বেড়াতে গেছেন। রাস্তায় একজায়গায় স্নান করছেন। তাঁর গলায় শ্রীশ্রীমায়ের ছবির একটা লকেট ছিল। তা স্নান করার সময় সেটা তো আর ঢাকা নেই। দেখেছেন একজন। তিনি সাধুকে জিজ্ঞেস করছেন : "Who is that lady?" আমাদের সাধু বলছেন : "She is the wife of Ramakrishna Paramahamsa." অন্য একটি লোক তা শুনে চটে গেছেন, বলছেন : "Do you not call her Holy Mother?"

বিদেশে আবার অনেকে মনে করে ঠাকুর নয়, স্বামীজীই অবতার। আমাদের একজন অস্ট্রেলিয়ান ব্রহ্মচারী ছিল। নাম ওয়েল। তার কাছে শুনেছি। সে বলত—"স্বামীজী আমাকে পথের ধুলো থেকে তুলে এনেছেন।" সে এক অলৌকিক ব্যাপার! সেদিন ছিল তার জন্মদিন। বাজারে মদ কিনতে গেছে। জন্মদিন পালন করবে। তার বন্ধুদের নেমন্তন্ন করেছে। ওদের জন্মদিনে মদ একটা অপরিহার্য জিনিস। কিনে আনছে। এমন সময় পথে একটা দর্শন হল—একটা ছবি দেখল। তার মনে হল—কে এ? এ কাকে দেখলাম? নাম তো জানি না। মনে হচ্ছে কোন

সেন্ট হবেন। আর সেন্ট আমাকে দর্শনই বা দিলেন কেন? নিশ্চয়ই আমার জীবনে কোন পরিবর্তন আনবার জন্য। এই ভেবে সেই রাস্তাতেই মদের বোতলগুলো ভেঙে ফেলল। শুধু-হাতে বাড়ি ফিরল। তার বোন বলল—"মদ কোথায়?" সে বলল—"আজ থেকে মদ আমি আর ছোঁব না।" এরপর সে যাঁর দর্শন পেয়েছে তাঁর খোঁজ শুরু করল। চারদিকে খোঁজ করল, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না। দুশো মাইল দূরে সিডনি। চলে গেল সেখানে—যদি কোন খোঁজ পাওয়া যায়। সিডনিতে ঘুরতে ঘুরতে একটা বইয়ের দোকানে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল—একটা বইয়ের মলাটে স্বামীজীর ধ্যানস্থ ছবি। বইটি 'রাজযোগ'। স্বামীজীর ছবি দেখে তার মনে হল—এইতো তিনি, ইনিই তো আমাকে দর্শন দিয়েছেন। তারপর সে বইটি কিনে এনে পড়ল। তাতে অদ্বৈত আশ্রমের ঠিকানা ছিল। সেখানে চিঠি পাঠাল। তখন অশোকানন্দ স্বামী 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। আর মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে বলেছিলেন, সে যেন তার আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সব তাঁকে করে। তখন থেকে সে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করত। তারপর সাধু হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহাপুরুষ মহারাজ লিখলেন—"বাপু, তোমাদের দেশের লোকের এখানে এসে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। কাজেই এসো না।" কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। মহাপুরুষ মহারাজ তখন দুশ্চিন্তা নিয়ে লিখলেন—"আচ্ছা, তাহলে এসো। কিন্তু ফিরে যাওয়ার টাকা এখানে এনে জমা রাখবে। তা না হলে আমরা কোথায় টাকা পাব? টাকা দিয়ে তোমাকে ফেরত পাঠাব কী করে, যদি তোমার স্বাস্থ্য এখানে না টেঁকে?" ঠিক তাই হল। আসার কয়েক বছর পর তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তখন তাকে ফিরে যেতে বলা হল। টাকা তো ছিলই। ফিরে গেল। কিন্তু গিয়ে সমস্ত জীবন স্বামীজীর ভক্ত হয়েই রইল। একবার তাকে নিয়ে মাস্টারমশায়ের কাছে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় মাস্টারমশাই বললেন—"ঠাকুর হলেন অবতার।" সে ঠাকুরের ভক্ত নয়। সে বলল—

"স্বামীজী অবতার।" মাস্টারমশাই আবার বললেন—"স্বামীজী অবতার নন। ঠাকুরই অবতার।" সে কিছুতেই মানবে না।

অন্যত্র স্বামীজী ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন—'ভগবানের বাবা'। ভগবান কিনা অবতার। আর 'বাবা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ 'ভগবানের বাবা' মানেও 'অবতারবরিষ্ঠ'।

অবতারের বিশেষত্ব এই যে, তাঁর ভিতর একটি মানব-ভাব এবং আরেকটি দেব-ভাব—একই সঙ্গে থাকে। ঠাকুর বলেছেন : "এর ভেতর দুটি আছে—একটি ভক্ত, অপরটি ভগবান।" দুটি ভাবই আছে। পাশাপাশি আছে। সাধারণত আমরা সেটা বুঝতে পারি না। একটির সঙ্গে আরেকটিকে মিশিয়ে দিলে হবে না। একটির সঙ্গে অপরটির সহাবস্থান আছে। ইচ্ছা করলেই দুটি ভাবের যেকোনটিতে তিনি থাকতে পারেন। দুটি ভাব বিপরীত। একটি পূর্ণ এবং আরেকটি অপূর্ণ। কিন্তু দুটি একই জায়গায় একই ব্যক্তিতে অবস্থান করতে পারে। তিনিই অবতার। অবতারের ভিতর যদি মানব-ভাব না থাকত, তাহলে তাঁর অবতারত্ব কিছু হতো না। মানুষের মধ্যে মানুষের মতো হয়ে তাঁকে ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে তিনি কী করে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করবেন? এজন্য মানব-ভাবে থাকতে হয়। শুধু মানব-ভাবে থাকা নয়, মানব-ভাব থেকে দেব-ভাবে ইচ্ছা করলেই নিজেও যেতে পারেন এবং অপরকেও নিয়ে যেতে পারেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন : "কলিতে নারদীয়া ভক্তি।" অর্থাৎ ভগবানের নামগুণগান, পূজা ইত্যাদি করলে তাঁর ওপর ভালবাসা আসবে। আর স্বামীজী বলেছেন—যেদিন থেকে ঠাকুর এসেছেন অর্থাৎ জন্ম নিয়েছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগের সূচনা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান যুগটি সত্যযুগ না কলিযুগ—আমাদের সংশয় হচ্ছে। একটু বুঝিয়ে বলবেন?

মহারাজ : দেখ, এটা কোন্ যুগ তার উত্তর হল—তোমার মন কোন্ স্তরে আছে? সময় বা কালটা মুখ্য নয়। তোমার মনের অবস্থাটাই মুখ্য।

সত্যযুগেও অসৎ লোক ছিল, কলিযুগেও আছে। হ্যাঁ, ঠাকুর বলেছেন : "কলিতে নারদীয়া ভক্তি।" 'নারদীয়া ভক্তি'র অর্থ অহেতুকী নিষ্কাম ভক্তি, যাতে ভক্ত ভগবানের কাছে কোন প্রতিদান চায় না, কেবল তাঁকে নিজের হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণ করেই চরিতার্থ বোধ করে। 'ভাগবত'-এ আছে—

"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ বহু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥" (১১।৫।৩৮)

যাঁরা সত্যযুগের লোক তাঁরা কলিযুগে জন্ম নিতে ইচ্ছা করেন। কারণ, কলিতে ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি ঠাকুরের ভাবের অনুসরণ করি, তাহলে সত্য আর কলির এরকম পার্থক্য করলে চলবে না। ঠাকুর বিভিন্ন ভক্তকে একই কালে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এরকম বাঁধাধরা কোন নিয়ম হতে পারে না যে, কলিতে ভক্তিযোগ, সত্যে জ্ঞানযোগ, আর ত্রেতায় কর্মযোগ অভ্যাস করবে। অর্থাৎ যুগ প্রধান কথা নয়, মনের অবস্থাটাই হল প্রধান কথা। সুতরাং ঠাকুর কখনোই সকলের জন্য এক নিয়মের কথা বলে যাননি। তিনি অধিকারী বিচার করে উপদেশ দিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যেও দেখতে পাই অধিকারিভেদে উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন। কাউকে বলছেন : "বাবা, বিয়ে করনি, বেশ।" আবার কাউকে বলছেন : "হ্যাঁ বাবা, বিয়ে করবে বৈকি, দেখ না সবকিছুই দুটি দুটি।" এর কারণ হল অধিকারিভেদ, যুগভেদ নয়। একই যুগে ত্রেতাযুগের লোক আছে, আবার কলিযুগের লোক আছে। যে-ভাগবতে নাম-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে, সেই ভাগবতেই আবার অধিকারিভেদের কথা বলা হয়েছে। কারো পক্ষে জ্ঞানযোগ, কারো পক্ষে ভক্তিযোগ, কারো পক্ষে কর্মযোগ প্রশস্ত। কাজেই আমরা কোন নির্দিষ্ট যুগে জন্মাইনি। স্বামীজী যে বলেছেন—ঠাকুরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের সূচনা হয়েছে, তার অর্থ ভিন্ন। ঠাকুর তাঁর সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের পথ সুগম করে গেছেন। এ-পথ অনুসরণকারীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে অধিক

হবে এবং মানুষের মন চৈতন্যের উচ্চস্তরে উঠতে থাকবে। যাহোক, বর্তমানকালে পুরাণের মত মেনে যুগবিভাগ করলে চলবে না। কাজেই মানুষের মনের অবস্থা অনুযায়ী যুগবিভাগ করতে হবে। সত্যযুগেও যে লোকের মন অধোগামী ছিল, পুরাণে তো এরকম উদাহরণের কোন অভাব নেই। স্বামীজী বলেছেন—সত্যযুগ এসেছে। তা সত্যযুগ তো জ্ঞানপ্রধান। তাহলে তিনি কর্ম করতে বললেন কেন? মনে হবে এটা বিরুদ্ধ কথা। কিন্তু কোন বিরোধিতা এখানে নেই। যেরকম মনের অবস্থা, তার ওপর যুগটা নির্ভর করছে। এখন প্রশ্ন হল এই যে, মনের অবস্থা কীরকম, কে বলে দেবে? উত্তর হল—তোমার মনই বলে দেবে, যদি তুমি নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পার। অর্থাৎ যদি পক্ষপাত না রেখে বিচার কর, তোমার মনই বলে দেবে—কোন্ যুগে তুমি আছ। যেরকম মনের অবস্থা, সেই অনুসারে অধিকার। যে কর্মপ্রবণ, সে কর্মযোগের মধ্য দিয়ে যাবে। যে যুক্তিপ্রবণ, সে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে যাবে। এর জন্য সাধারণ কোন নির্দেশ থাকা সম্ভব নয় যে, এক বিশেষ কালে সকলেই একটি বিশেষ যোগের মধ্য দিয়ে যাবে।

॥ ৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, জপের সময় ঘুম আসে কেন? কিভাবে এটা দূর করা যায়?

মহারাজ : হ্যাঁ, এটা একটা পরম শত্রু, যোগের বিঘ্ন। ঘুম পেলে চোখে জল দিয়ে বসতে হয়। এতে কিছুক্ষণের জন্য কাজ দেয়। ঘুম পাওয়ার কারণ, মন যেসব বিষয়ে সাধারণত ঘুরে বেড়ায়, ধ্যানের সময় মনকে সেসব বিষয় থেকে সরিয়ে আনা হয়। কিন্তু মনকে ধ্যেয় বস্তুতে রাখতে না পারলে মন অবলম্বনহীন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এটা দূর করার উপায়—সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকার চেষ্টা করা।

—মহারাজ, চেষ্টা করি, কিন্তু আবার কখন ঘুম এসে যায়! কী করব বুঝতে পারি না।

মহারাজ : যেবিষয়ে ধ্যান করছি তাতে যদি তীব্রতা বেশি থাকে অর্থাৎ তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা খুব তীব্র থাকে তবে কি আমরা অসতর্ক হতে পারি? যেমন বলা হয়, পাশের ঘরে মণিমুক্তো লুকানো আছে—একথা জানতে পেরে চোর কি এ ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে? না, পারবে না। যতক্ষণ না সে সিঁধ কেটে পাশের ঘরে ঢুকছে এবং মণিমুক্তো লাভ করছে, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে না। সেইরকম, যদি আমরা জানি—আমাদের হৃদয়ে তিনি আছেন, তাঁকে লাভ করতেই হবে, তবে কি আমরা অসতর্ক হতে পারি? ঘুমাতে পারি?

—তবে কি মহারাজ, ব্যাকুলতার অভাবেই এরকম হয়?

মহারাজ : তাছাড়া আর কী বলব? সেইজন্য সদাসর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকার চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা করতে করতে ক্রমে সেটা অভ্যাস হয়ে যায়, সংস্কার হয়ে যায়।

—ঘুম পেলে হেঁটে হেঁটে জপ করলে হয়?

মহারাজ : তা করতে পার। কিন্তু তাতে নয় ঘুমকে তাড়ানো গেল, কিন্তু ধ্যান তো আর হল না। ধ্যান মানে সব ইন্দ্রিয় নিজের নিজের কাজ থেকে বিরত থাকবে। আর মন শুধু ধ্যেয় বস্তুতে লেগে থাকবে। হাঁটলে তো আর ধ্যান হল না।

—মহারাজ, ধ্যান-জপের সময় আসনে বসেই জপ শুরু করা উচিত, না, কিছুক্ষণ পর শুরু করা উচিত?

মহারাজ : এব্যাপারে আমাদের সময়ের ফণী মহারাজ (স্বামী আত্মারামানন্দ) বেশ মজা করে বলতেন—একজন আসনটা নিয়ে এসে মাটিতে ফেলল, তারপর ধপাস করে বসে পড়ল, মালাটা টেনে বার করল, আর বার করেই নোঙর টানার মতো টানতে শুরু করল। (সকলের হাসি) এরকম করে নয়। স্বামীজী বলেছেন, আসনে বসে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে হয়। মনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এভাবে মন কোথায় যাচ্ছে, কী করছে ইত্যাদি লক্ষ করতে করতে অশান্ত মন শান্ত হয়ে আসে। তার ছোটা বন্ধ হয়। তারপর জপ-ধ্যান করা

উচিত। কিন্তু তার জন্য যতটা সময় দিতে হয়, তত সময় কোথায়? ব্যস্ততা থাকলে কি এরকম সম্ভব? হয়ত তাড়াতাড়ি উঠেই কুটনো কুটতে যেতে হবে, কী ট্রেনিং-এর পড়া তৈরি করতে হবে।

--মহারাজ, ব্যস্ততা থাকলে কী করব?

মহারাজ : কী আর করবে, ঐরকম নোঙর টানবে! (সকলের হাসি) আসল কথা, যতটুকু সময়ই কর না কেন, ভাবের সঙ্গে করার চেষ্টা করবে। ভাবটাই আসল। একটা ভাব নিয়ে করলে যতটুকু সময়ই কর তাতে উপকার হবে। মন শান্ত না হলে নিজেকে যাচাই করা যায় না, মনকে বিশ্লেষণ করা যায় না। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে :

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ॥" (২।৩।১৭)

অর্থাৎ ঘাসের কোরকটাকে যদি আলাদা করতে হয়, তবে সেটা হঠাৎ টান দিলে ভেঙে যাবে। খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে কোরকটাকে ঘাস থেকে পৃথক করতে হয়। সেইরকম খুব ধৈর্যের সাথে আত্মাকে অনাত্মা দেহাদি থেকে আলাদা করতে হয়। এই শ্লোকে আত্মাকে দেহ থেকে আলাদা করার কথা বলা হয়েছে। সেরকম ধ্যানের সময় মনকে যাতে নিবিষ্ট করতে চাইছি সেটা ছাড়া অন্য সব বস্তু থেকে মনকে পৃথক করে এনে ইষ্টবস্তুতে নিয়োগ করতে হবে। গীতাতে রয়েছে—

"শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥" (৬।২৫-২৬)

খুব ধীরে ধীরে—'শনৈঃ শনৈঃ' বলা হয়েছে। কারণ, সমাধির চেষ্টা করছি। যে-অবস্থা লাভ করতে চাই, তার জন্য মনকে তো শান্ত করতে হবে। ধ্যান করতে হলে মনকে শান্ত করতেই হবে। মন শান্ত হয়ে এলে জীবনটাতে তার ছাপ পড়বে। চলন-বলন সব শান্ত হবে। জীবনে শান্তভাব আসবে, চরিত্রে মৃদুভাব আসবে। তড়বড় করলে হবে না। কীর্তন যারা

করে—খোল-করতাল বাজিয়ে খুব নাচানাচি, লাফালাফি করে। ধ্যানীর এ-অবস্থা ভাল লাগে না। ঠাকুরের জীবনে দুটোই খুব লক্ষ করা যায়। যখন নাচছেন, সে কী নৃত্য! যারা সঙ্গে গাইছে বা নাচছে তারা শুধু নয়, যারা শুনছে বা দেখছে তারাও ঘেমে যাচ্ছে। আবার একসময় বলছেন : "এখন হৈচৈ ভাল লাগে না।" অর্থাৎ শান্তভাব। তিনি সব ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাবেন কিনা, তাই দুটোই দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন : এই যে ঘুমিয়ে পড়া, এটাকেই কি যোগে 'লয়' বলা হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, যোগের বিঘ্নগুলোর মধ্যে একটি হল 'লয়'। মাণ্ডূক্যকারিকায় আছে—

"লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥" (৩।৪৪)

লয়ের আসল অর্থ হল—সাধক ধ্যান করতে করতে হঠাৎ তার মনের সামনে থেকে ধ্যেয় বস্তু সরে যায়, মন জেগে থাকে কিন্তু ধ্যেয় বস্তু থাকে না। তখন সাধককে আবার সম্বুদ্ধ মনের সামনে ধ্যেয় বস্তুকে আনার চেষ্টা করতে হয়। আর আমাদের মতো সাধারণদের ক্ষেত্রে লয় মানে ঘুম। মন ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হয়। এরপর বিক্ষেপ—এটা সকলেরই হয়। সকলেই জানে। ধ্যেয় বিষয় ছেড়ে মন অন্য বিষয়ের চিন্তা করে। তখন মনকে পুনরায় ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করতে হয়। 'কষায়' মানে রঞ্জিত হওয়া। মন ভোগ-বাসনা বা বিষয়-বাসনার দ্বারা রঞ্জিত থাকলে সেই বিষয়ের দিকেই আকৃষ্ট হয়। বিষয়ের প্রতি মন যখন আকৃষ্ট হয়, মন যেন সে-ব্যাপারে সজাগ থাকে। বলছেন—'সকষায়ং বিজানীয়াৎ'। আরেকটি বিঘ্ন আছে। সেটা 'রসাস্বাদন'। সাধক একটু অগ্রসর হয়ে সাধনের বিন্দুমাত্র আনন্দ পেয়ে সেখানেই আনন্দ আস্বাদ করতে লেগে যায়। কিন্তু মনকে শাসন করে বোঝাতে হবে যে, আমার উদ্দেশ্য আরো অনেক দূর। যেমন, ঠাকুরের কাঠুরিয়ার আরো এগিয়ে যাওয়ার গল্প। সমপ্রাপ্ত হলে মন আর বিচলিত হবে না। অর্থাৎ যে উন্নত অবস্থায় মন উঠেছে, তাকে সেখানে ধরে

রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে আমাদের হতাশার কিছু নেই। আমরা যেটুকু চেষ্টা বা সৎ প্রচেষ্টা করি না কেন, তা যতই সামান্য হোক, বৃথা যায় না। তা জমা থাকে। আদর্শের দিকে, উদ্দেশ্যের দিকে যদি একটি ছোট্ট পা-ও ফেলে থাকি, ততটুকু দূরত্ব তো কমল। ততটুকু তো জমা হল। যদিও একথা ঠিক যে, মনে তীব্র ব্যাকুলতা না আসা পর্যন্ত আমরা যা-ই করি না কেন, কোন কিছুই কিছু নয়। তা বলে কি চেষ্টা ছেড়ে দিতে হবে? না, যতক্ষণ না এরকম ব্যাকুলতা হচ্ছে ততক্ষণ চেষ্টা করে যেতে হবে। আমাদের এতটুকু চেষ্টাও বৃথা যায় না, বৃথা যাবে না। জমা থাকবে। ভবিষ্যতে যখন জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত আসবে, তখন সেই ক্ষুদ্র অথচ সৎ চেষ্টাটুকু আমাদের বাঁচাবে। যত ছোট চেষ্টাই হোক না কেন, কোন সৎ চেষ্টাই ভুলতে নেই। সেটুকু স্মরণ করলেও দুর্যোগে বিপদে মনে বল আসে। নবানুরাগের বৈরাগ্য, চেষ্টা ইত্যাদি ভবিষ্যৎ জীবনে স্মরণ করতে হয়। তখন মনে হয়—আহা! কিরকমই না মনের অবস্থা ছিল। কত টান—কত বৈরাগ্য!

॥ ৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, হরি মহারাজ মহাপ্রয়াণের আগে বলেছেন— "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য।" তা, জগৎ কীরূপে সত্য?

মহারাজ : জগৎ-রূপে সত্য নয়।

—জগৎটা ব্রহ্ম-রূপে সত্য, তার মানে ব্রহ্মই হচ্ছে জগৎ?

মহারাজ : এই। আসল কথা হচ্ছে তাই।

—তাহলে জগৎ আর নেই, এটাই তো হল?

মহারাজ : জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া নেই—এটা সত্য। শুধু জগৎ নেই বললে বাস্তবকে পরিষ্কার করে বলা হল না। জগৎ জগৎ-রূপে নেই, ব্রহ্ম-রূপে আছে।

—আর ব্রহ্ম এসে গেলে কিছু বলার থাকে না। ব্রহ্মে পৌঁছে গেলে আর কিছু বলা যায় না। মুখ বন্ধ হয়ে যায়!

মহারাজ : ব্রহ্ম শব্দটা বলা হচ্ছে তো?

—তা বলা হচ্ছে।

মহারাজ : তাতে, সেটা তো আর ব্রহ্মের স্বরূপ হল না।

—যতক্ষণ শব্দ-দ্বন্দ্ব হচ্ছে, সেটি ব্রহ্মসত্তা নয়।

মহারাজ : কথা হচ্ছে, ব্রহ্ম কী—তা ঠাকুর বলেছেন—মুখে বলা যায় না। তাহলে যখন আমরা ব্রহ্ম বলছি, তখনো ব্রহ্মের প্রকাশ শব্দের দ্বারা হচ্ছে না।

—ব্রহ্মকে যদি আমরা অনুভব করতে চাই, তাহলে আমাদের শাস্ত্র অর্থাৎ শব্দরাশি—সেইটাই তো আমাদের অবলম্বন করতে হবে। আমাদের তো অবলম্বন শব্দই।

মহারাজ : যদি শব্দ অবলম্বন কর, তাহলে ব্রহ্মকে ধরতে পারবে না।

—তাহলে আমরা ব্রহ্মকে ধরার কী উপায় পাব?

মহারাজ : অশব্দম্। শাস্ত্র বলছে তো, তিনি অশব্দম্।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" (কঠোপনিষদ্, ১।৩।১৫)

—তিনি অশব্দম্ হলেন, কিন্তু আমরা তো শব্দ দিয়েই তাঁকে বোঝাই।

মহারাজ : আরে বাবা! তিনি ছাড়া আবার তোমরা আছ নাকি?

—সেই তো। প্রত্যক্ষ অনুভব হচ্ছে। আগে যেটি বললেন, প্রত্যক্ষকেও তো স্বীকার করতে হচ্ছে।

মহারাজ : প্রত্যক্ষ মানে চোখ দিয়ে দেখা?

—চোখ দিয়ে দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, তাও হচ্ছে।

মহারাজ : না। তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না।

—আমরা তো নিজেদের অনুভবটা বুঝতে পারছি যে, আমরা আছি।

মহারাজ : কথা হচ্ছে কী, ব্রহ্মের স্বরূপ কী, তা মুখে বলা যায় না। এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভাল কথা। সার কথা।

—কিন্তু ব্রহ্ম, এই যে শব্দটা ব্রহ্ম নয়, তাঁকে যে প্রকাশ করা যায় না, সেটা কে বলছে?

মহারাজ : সেটা, যে অজ্ঞান সে বলছে।

—তাহলে অজ্ঞান আছে?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তাহলে অজ্ঞান মানতে হবে।

মহারাজ : অজ্ঞানকে আমার না মেনে উপায় নেই। এটা তো প্রত্যক্ষ অজ্ঞান।

—তাহলে অজ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহলে অজ্ঞানের কার্যটাও প্রত্যক্ষ।

মহারাজ : অজ্ঞানের কার্য দ্বারাই তো অজ্ঞানকে আমরা দেখি। অজ্ঞানের কী হাত আছে, না পা আছে? অজ্ঞানকে তো আমরা কার্যের দ্বারাই দেখি। অজ্ঞানের তো হাত-পা নেই।

—সেটাই তো। অজ্ঞানের যে কার্য রয়েছে, আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সেটা অবলম্বন করেই তো আমরা তাহলে অজ্ঞানকে বুঝছি।

মহারাজ : তাতে কি ব্রহ্মকে ধরতে পারবে?

—তাছাড়া উপায় কী আর?

মহারাজ : উপায় নেই—ব্রহ্মকে ধরার উপায় নেই। তুমি যদি ব্রহ্ম হও, তুমি ব্রহ্মকে ধরবে কী করে?

—আর উপায় যদি না থাকে, সেটি কে বলছে তাহলে?

মহারাজ : যে বলছে সে অজ্ঞান।

—হল না, মহারাজ।

মহারাজ : হল না নয়। ব্রহ্মকে ধরবে কে? ব্রহ্ম ছাড়া যদি কেউ না থাকে, তাহলে ব্রহ্মকে ধরবে কে? ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে ধরবে যদি বল, তাতে দোষ হয়। আর ব্রহ্মকে ধরার কেউ নেই। তাহলেও দোষ হবে।

—তাহলে এরকম ধরনের যে ব্রহ্ম আছে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে, এগুলো সব মিথ্যে হয়ে যায়।

মহারাজ : তা-ই। মিথ্যাই তো। অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্যই তো সব বিচার। "তত্র বেদাঃ অবেদাঃ ভবন্তি।" বেদ তখন অবেদ হয়ে যায়।

—অশব্দম্, অস্পর্শম্ বলা হচ্ছে, সেটা তো শাস্ত্র শব্দ দিয়েই বলছে। যেটা বলতে চাইছিল শাস্ত্র, শব্দ দিয়েই তো বলছে।

মহারাজ : শব্দ নেই—এটা শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে কিনা? শব্দকে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে কি?

—ধরার জন্য বলা হচ্ছে। স্বরূপ না হলেও সেটার কথা বলা হচ্ছে।

মহারাজ : শব্দ নেই মানে শব্দের প্রতিষ্ঠা হল?

—শব্দ নেই কেন? ব্রহ্ম শব্দ তো ব্যবহৃত হচ্ছে। বেদে তো ব্রহ্ম শব্দ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

মহারাজ : শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে বলা যায় না। অশব্দ মানেই হচ্ছে, তার কোন শব্দ নেই। ব্রহ্ম শব্দও তার শব্দ নয়। ব্রহ্ম মানে সর্বব্যাপী। সর্বই নেই, তার ব্যাপকতা কোত্থেকে হবে?

—মহারাজ, শব্দ তার নেই, স্পর্শ তার নেই, সেই জিনিসটি যে আছে তার প্রমাণ কী?

মহারাজ : প্রমাণ দরকার হয় না। যে-বস্তু সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, সে-বিষয়ে প্রমাণ দরকার হয়। কিন্তু যে-বিষয় নিঃসন্দেহ, তাকে আর প্রমাণের দরকার হয় না।

—কী করে নিঃসন্দেহ হল? অশব্দম্, অস্পর্শম্ যে ব্রহ্ম তাকে আমরা নিঃসন্দেহ-রূপে পাচ্ছি কী করে? দেখতেই পাচ্ছি না, অনুভবে আসছে না।

মহারাজ : তোমরা কারা? তোমরা তো অজ্ঞান।

—কথা হল, আমরা অজ্ঞান হতে পারি, কিন্তু ব্রহ্ম যে আছে, তার প্রমাণ যদি না থাকে, তাহলে আর সেইটি নিয়ে বিচার করে কী হবে?

মহারাজ : আরে বাবা! সমস্ত প্রমাণ ব্রহ্মের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। ব্রহ্মকে তো অন্য প্রমাণ প্রমাণিত করতে পারে না।

-তাহলে আর ওটা নেই বললেই ভাল, মহারাজ।

মহারাজ : নেই বললে তো একটা ব্যাখ্যা হল। তা নয়। যে বলছে ব্রহ্ম নেই, সে কে?

—তাকে শব্দের দ্বারাও জানা যাচ্ছে, স্পর্শের দ্বারাও জানা যাচ্ছে—যে কথা বলছে।

মহারাজ : তাকে যদি খোঁজ কর, তার স্বরূপকে ধরতে চেষ্টা কর, তখন কি পাবে কিছু?

—যদি তার কিছু না থাকে, তিনি নেই, শূন্য।

মহারাজ : শূন্য বলতে গেলে তো শব্দের দ্বারা বলা হল।

—আমরা তো তাই বলছি, শব্দের দ্বারা প্রকাশিত জিনিসই আছে। শব্দের অতীত কোন জিনিস নেই।

মহারাজ : শব্দের অতীত কথাটা বলেই ব্রহ্মের স্বরূপকে বোঝানো হল। স্বরূপকে মুখে বলা যায় না। এই যে মুখে বলা যায় না, এটাই হল ব্রহ্মকে বোঝানো।

—এটাও তো বুঝতে হবে। বলা যায় না—এটাও তো শুনে বললে আমরাও বুঝতে পারব না। বলা যায় না, কোন পর্যায়ে কেন বলা যায় না?

মহারাজ : বলা যায় না—এটাও তো বলা হচ্ছে। এ তো উলটো কথা। বলা যায় না মানে, সেটি শব্দাতীত। তাতে আবার বলা যায় না—এটাই বলা হল। এ কোন্ দেশি কথা?

—পূর্বপক্ষীর তো কথা এই যে, যাকে জানার কোন উপায় নেই, সেটা আবার আছে কী করে?

মহারাজ : না, না। বলছি। যে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তাকে আবার আলাদাভাবে প্রমাণ করার কী প্রয়োজন?

—কোন সন্দেহের অবকাশ নেই!

মহারাজ : তোমার কি সন্দেহ আছে, তুমি আছ কী নেই?

—আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

মহারাজ : সন্দেহ নেই, এখন তোমার অস্তিত্বটি কী, সেইটি বিচার করে দেখতে দেখতে সব শূন্য হয়ে যায়। তোমার অস্তিত্ব খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না কিছু। এই হল তোমার স্বরূপ।

॥ ৫ ॥

প্রশ্ন : বৈশাখী পূর্ণিমাকে 'Thrice blessed day' কেন বলা হয় মহারাজ?

মহারাজ : ভগবান বুদ্ধের সেদিন জন্ম, বোধিলাভ এবং মহাসমাধি।

—আর্য সত্য কেন বলা হয়?

মহারাজ : আর্যদের দ্বারা পরীক্ষিত সত্য। এখানে আর্য মানে জাতি নয়—পূজ্য যাঁরা, তাঁদের দ্বারা।

জনৈক মহারাজ শরীরের কুশল জিজ্ঞেস করলে পূজনীয় মহারাজ বললেন, 'শরীর জানে দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।' হরি মহারাজ বারবার ঠাকুরের এই কথাটি বলতেন। তবে অন্য কারুর কাছে ঠাকুর বলেছেন কিনা উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

—নির্বাণ কী, মহারাজ?

মহারাজ : অহমাত্মিকা বুদ্ধির নিবৃত্তি। চিত্তবৃত্তি, বাসনা বা তৃষ্ণার নিবৃত্তি। তার দ্বারা হয় কী, যে 'আমি' 'আমি' করছে, তার শেষ হয়ে যায়। দীপ নিভে যায়।

—তাহলে রইল কী?

মহারাজ : কিছুই রইল না। তুমি কী চাইছ, 'আমি'টা থাকুক?

—'আমি' না থাকলে অভাব কার হবে?

মহারাজ : প্রবর্তকের হবে। যে এই পথে চলবে, তার হবে।

—প্রবর্তক না থাকলে নির্বাণ কার হবে?

মহারাজ : দীপ জ্বলছে, তার পর নির্বাণ হল। বাসনারূপ তেলের দীপ জ্বলছিল। তেল শেষ হয়ে গেল। দীপ শেষ হয়ে গেল।

—এটা তো মাছিকে মারতে লোকটাকে মারা হল।

মহারাজ : তুমি তো কটাক্ষ করছ। তার মানে, তুমি লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও? এর নামই বাসনা। নির্বাণে অনন্ত বাসনার নিবৃত্তি হবে।

—তাহলে নির্বাণ কার জন্য?

মহারাজ : 'কেউ' বলে সত্য যদি থাকত, তাহলে 'কার' নির্বাণ—এ-প্রশ্ন উঠত। যেটাকে দীপশিখা বলছ, সেটা—জ্বলন্ত তৈলকণাগুলোই দীপশিখা বলে প্রতীত হচ্ছে। যখন জ্বলন্ত তৈলকণা রইল না, কী রইল? মানুষ কী চায়? দুঃখের নিবৃত্তি। কার দুঃখের নিবৃত্তি? যার দুঃখ হচ্ছে, সে নিবৃত্তি চায়। যার দুঃখ রইল না, দুঃখনিবৃত্তি হয়ে গেল, তার দুঃখ কোথায় থাকবে?

—আমিত্বের বিনাশ কী মানুষ চায়?

মহারাজ : সাধারণ মানুষ তো এই সংসারটা ভোগ করতে চায়। তাই আমিটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়। যখন 'আমি' বলতে যে বন্ধন বোঝায়, সেগুলো চলে যায়; তখন আমি রইল কোথায়? তুমি, আমি কিছুই রইল না। ব্রহ্ম-স্বরূপে আমি-টামি থাকবে না।

—অনন্ত জীবনের কথা বলা হয়, সেটা কার?

মহারাজ : সাধকের। সাধক ভাববে, 'আমি ব্রহ্ম'। 'আমি ব্রহ্ম', 'আমি ব্রহ্ম' বলতে বলতে আমিত্বটা ঘুচে যাবে, ব্রহ্মই থাকবে।

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥"

(কঠোপনিষদ্, ২।১।১৫)

যেমন, এক শুদ্ধ জলবিন্দু শুদ্ধ জলরাশিতে পড়লে সে শুদ্ধ জলরাশিই হয়ে যায়, তার আর কিছু থাকে না; যে বিজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ—তার এই 'আমি'-রূপ গণ্ডিটা চলে গেলে তবে ব্রহ্মজ্ঞ হবে। ব্রহ্মজ্ঞ নয়, ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি হবে। কার স্থিতি হবে? ব্রহ্মের স্থিতি হবে। আরোপ চলে যাবে। এইজন্য শঙ্করের আলোচনায় আছে, অবিদ্যা কার? উত্তর—অবিদ্যা যার, তার। আমিই তো অবিদ্যায় ভুগছি। তাহলে আর প্রশ্ন করছি কেন? খুব তর্কসিদ্ধ কথা। অবিদ্যা থেকে 'আমি'র উৎপত্তি, অবিদ্যা নাশ হলে

'আমি' কোথায় যাবে? অবিদ্যার নিবৃত্তির সাথে সাথে 'আমি'রও নিবৃত্তি হবে। ব্রহ্মবাদীরা বলেন, যখন সমস্ত আরোপ দূর হয়ে গেল, হাতে আরোপ তো রয়ে গেল। তখন আর বর্ণনা কী করব? বলে, তখন বর্ণনা—অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্। শূন্য এবং ব্রহ্ম খুব বেশি তফাত নয়, এক। বৌদ্ধগণের শূন্য মানে জগতের শূন্য নয়, জগতের আরোপ হয় যেজন্য, সেই শূন্যের নিবৃত্তি।

—জটিল দর্শন নিয়েও বুদ্ধ কীভাবে এত জনপ্রিয় হলেন?

মহারাজ : বুদ্ধ তো কোন তর্কগ্রন্থ রচনা করেননি। তিনি বলেছেন, মানুষের যে-বাসনা, তার নিবৃত্তি। খুব বাস্তব কথা। বলেছেন, একজনের গায়ে তীর লেগেছে। তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে—তীরটা কোনদিক থেকে এল, তীরের ফলা কত বড় ইত্যাদি। সে বলছে, আগে তীরটা সরাও, তারপর প্রশ্ন কর। কোথা থেকে এল, কীভাবে এল—অত বিচারের দরকার কী? সোজা কথা—বাসনার নিবৃত্তি। আমাকে—সবাই এখানে এসে বলে—আমার খুব অশান্তি, অশান্তি কীভাবে যাবে? আমি বলি, একটা উপায় আছে। শুনে তারা সাগ্রহে বলে—কী উপায়? বলি, বাসনার নিবৃত্তি। কেউ বলে, আমার কোন বাসনা নেই। আমি বলি, তবে তোমার দুঃখও নেই। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য মনের আকাঙ্ক্ষা, তাকে বলে বাসনা। বাসনা নেই, তাহলে দুঃখ আসবে কোথা থেকে? কেউ বলে, সংসার চাই না। জিজ্ঞাসা করি, তবে কী চাও? তখন বোঝা যায়—সংসার থাকবে, কিন্তু সংসারের দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, এই চায়। পতি-পুত্র-কন্যা সবাই মিলে তারা এখানে অমর হয়ে থাকবে—এই চায়। আকাশকুসুমের মতো কল্পনা। এর পারে যেতে হবে। তাই তো উপনিষদ্ বলছেন : "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং

শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। য এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতে হসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি—।” (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৫।১৫)—অর্থাৎ, ‘কারণ যখন (ব্রহ্মে) দ্বৈতপ্রায় হয়ে থাকে, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন সমস্ত এর আত্মাই হয়ে গেল, তখন কি দিয়ে কাকে দেখবে, কি দিয়ে কাকে আঘ্রাণ করবে, কি দিয়ে কাকে আস্বাদন করবে, কি দিয়ে কাকে বলবে, কি দিয়ে কাকে শুনবে, কি দিয়ে কাকে ভাববে, কি দিয়ে কাকে ছোঁবে, কি দিয়ে কাকে জানবে? যাঁর দ্বারা লোকে এই সমস্তকে জানে, তাঁকে কি দিয়ে জানবে? যাঁকে ‘নেতি নেতি’ বলা হয়, ইনিই সেই আত্মা। ইনি অগ্রহণীয়, কারণ ইনি গৃহীত হন না; ইনি অক্ষয়, কারণ এঁর ক্ষয় নেই; ইনি অসঙ্গ, কারণ এঁর আসক্তি নেই; ইনি বদ্ধ নন, অতএব এঁর ব্যথা নেই ও বিনাশ নেই। (যিনি সকলের জ্ঞাতা) সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়ে জানবে?’ তোমরা জপ-ধ্যান কর যখন, তখন ‘আমি ব্রহ্ম’ চিন্তা করো কী?

—সন্ন্যাসী তো আত্মচিন্তা করবে।

মহারাজ : আত্মচিন্তা কেউ করে না। ভজরং ভজরং করে।

—ব্রহ্মচিন্তাই তো করবে সাধু, আর কী করবে?

মহারাজ : যে-জিনিসটা ধরতে পারে না, সেটা চিন্তা করবে কী করে? আগে আত্মচিন্তা কর, দেখ—আমি কে? তবেই তো ব্রহ্মচিন্তা আসবে—আমি ব্রহ্ম। শুধু ব্রহ্মচিন্তা মানে কী? ব্রহ্মকে ধরতে পারবে? “যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।” তো ব্রহ্মচিন্তা করবে কী করে?

—আবার আছে, “মনসা এব অনুপশ্যন্ত।”

মহারাজ : সে তো আছে। যখন মন শুদ্ধ হবে তখন আর 'তিনি এই', 'তিনি এই' বিচার করতে হবে না। বিচারের নিবৃত্তি হয়ে যাবে। তখন যা আছে তাই অদ্বৈত। শুধু অনুভব।

প্রশ্ন : মহারাজ, আগের একটি প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলছিলেন, আমাদের অস্তিত্বটি কী, সেটি বিচার করে দেখতে দেখতে সব শূন্য হয়ে যায়। অস্তিত্ব খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না কিছু। এই হল আমাদের স্বরূপ। তা এখন প্রশ্ন হল, কিছু না পাওয়া যায় যদি মহারাজ, তার মানে—ব্রহ্ম শূন্য?

মহারাজ : শূন্য—বেশ একটা ব্যাখ্যা হল। তা না। শব্দের অতীত তিনি।

—এটা তো মহারাজ, শ্রুতি থেকে খালি বলছেন কথাটি। কিন্তু এটি কী, কোন—মানে যুক্তির মধ্যে কি বলা যায় যে, শব্দাতীত বস্তু আছে?

মহারাজ : যুক্তি এখানে কাজ করে না। মুশকিল হচ্ছে এইটাই। যেখানে যে-বস্তু কাজ করে না, তাকে সেখানে প্রয়োগ করে কী হবে?

—তাই। তা, আমরা বলব, ব্রহ্ম যে সিদ্ধ বস্তু, সিদ্ধান্তী বলছে—এটাও সিদ্ধান্তীর বলা উচিত নয়।

মহারাজ : সিদ্ধান্ত নয়। স্বয়ংসিদ্ধ।

—স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু, মহারাজ, সেটি আবার সিদ্ধ যদি কেউ করতে চায়, তাহলে হয় না।

মহারাজ : সর্বসিদ্ধি। সর্ব যে, সন্দেহের অতীত তিনি। সুতরাং তাঁর প্রমাণের কোন দরকার নেই। সর্বসন্দেহের অতীত। তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে কি, তুমি আছ কিনা?

—সন্দেহ আছে, মহারাজ।

মহারাজ : আছে নাকি? সে কী?

—সন্দেহটা কীরকম, বলছি। সন্দেহটা—আমি শরীর, না আমি মন, নাকি অন্য কিছু?

মহারাজ : এ তো তোমার স্বরূপ সম্বন্ধে। কিন্তু তুমি আছ—এ যদি সন্দেহ কর, তাহলে কে বিচার করবে? আজ এ পর্যন্ত। এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

॥ ৬ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, গুরু কে?

মহারাজ : গুরুগীতায় 'গুরু' শব্দটির তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করা আছে—

"গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥" (শ্লোক-২০)

—'গু' শব্দের অর্থ হল অন্ধকার, 'রু' শব্দের অর্থ নিরোধক। অন্ধকার বা অজ্ঞানকে যিনি নিরুদ্ধ করেন, তাঁকে 'গুরু' বলা হয়। গুরুস্তোত্রে আছে—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য
জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ
শ্রীগুরবে নমঃ॥" (শ্লোক-৩)

—অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ব্যক্তির চক্ষুকে যিনি জ্ঞানরূপ শলাকা দ্বারা উন্মোচিত করেন, তিনিই গুরু।

প্রশ্ন : সদ্‌গুরুর লক্ষণ কী মহারাজ?

মহারাজ : সদ্‌গুরুর কোন আকাঙ্ক্ষা, বিষয়-কামনা থাকবে না। গুরু যদি শিষ্য করে তার সঙ্গে কারবার করেন, তাহলে হবে না। গুরু সদ্‌গুরু হলে তাঁর সান্নিধ্যে এলে মন শুদ্ধ হবে। সেই গুরু যে-পথে নিজে চলবেন—সেই পথ শিষ্যকে বলে দিতে পারেন। সেই পথে শিষ্য চললে পবিত্র জীবন যাপন করতে পারবে।

প্রশ্ন : যারা কুলগুরুর কাছে 'দীক্ষা' নিয়েছে, তাতে তাদের কি কোন কাজ হবে?

মহারাজ : ভগবানের নাম যে-কারোর কাছ থেকে নিলেই হল।

প্রশ্ন : গুরুকৃপা কী করে হয়?

মহারাজ : গুরুর কৃপা হয় গুরুকে ভালবাসলে। এখন বলবে ভালবাসা কী করে হয়, না, ভালবাসতে বাসতে।

প্রশ্ন : গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কীভাবে হয় মহারাজ?

মহারাজ : বহু জন্ম ধরে একটু একটু করে শুভ কাজ করতে করতে তার একটা শুভ ফল জমা হয়। এইভাবে জমতে জমতে যখন ফল খুব বাড়ে, তখনি গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়।

প্রশ্ন : গুরুপূর্ণিমার বিশেষত্ব কী মহারাজ?

মহারাজ : পবিত্র 'গুরুপূর্ণিমা' তিথিতে ভক্তেরা তাঁদের নিজ নিজ গুরুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে থাকেন। গুরুপূর্ণিমাকে 'ব্যাসপূর্ণিমা'ও বলা হয়। কারণ, এই তিথিতে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ব্যাসদেবের জন্মতিথিকে কেন 'গুরুপূর্ণিমা' বলা হয়?

মহারাজ : এককথায় বেদ-উপনিষদের দুরূহ তত্ত্বগুলিকে পুরাণাদি রচনার দ্বারা সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করেছেন বলে ব্যাসদেব 'গুরু' নামে পূজিত। বেদকে 'বিভাগ' করেছেন বলে তিনি 'বেদব্যাস' নামেও খ্যাত। এছাড়া তিনি সমস্ত উপনিষদের মূল বিষয়গুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করেছেন। অষ্টাদশ পুরাণও তাঁরই রচনা বলে কথিত। আবার মহাভারতও তাঁর রচনা। মহাভারতেরই অংশবিশেষ গীতা, যাতে সকল শাস্ত্রের মূল বিষয়গুলি অতি সহজভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মহাভারত ও পুরাণগুলি ছাড়াও ব্যাসদেবের রচনা বলে কথিত একটি সংহিতা গ্রন্থও আছে, যাতে হিন্দুদের আচার-পদ্ধতির বর্ণনা আছে। উনিশটি সংহিতার মধ্যে 'ব্যাস সংহিতা' অন্যতম।

প্রশ্ন : গুরু চিনব কী করে, মহারাজ—একটু বিস্তৃত বলবেন।

মহারাজ : গুরুর প্রধান গুণ হচ্ছে তিনি 'শাস্ত্রজ্ঞ' এবং 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' হবেন। তাঁর আচরণ শাস্ত্রসম্মত হবে। স্বার্থবুদ্ধি-রহিত হয়ে কেবল শিষ্যের প্রতি করুণার্দ্রচিত্তে অজ্ঞানসমুদ্র থেকে উদ্ধারের উপায় উপদেশ করবেন। 'শ্রোত্রিয়' এবং 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'—এই দুটি কথা গুরু সম্বন্ধে বলা হয়। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকলে প্রকৃত তত্ত্ব বোঝাতে পারবে না, আবার ব্রহ্মনিষ্ঠ না হলে সংশয় দূর হয় না। ব্যাবহারিক জীবনের গুরুর সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুর এখানেই পার্থক্য। গুরু কেমন? না, 'শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'—শাস্ত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। শিষ্য গুরুর কাছে কেমনভাবে

যাবে? 'সমিৎপাণিঃ'—অর্থাৎ গুরুসেবার উপযুক্ত উপকরণাদি নিয়ে, সেবার ভাব নিয়ে যাবে। পুরাণ ও উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে, কোন বিদ্যাকে সঠিকভাবে জানতে হলে সে-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়। বিশেষত অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে নির্দেশ আছে যে, যারা 'সংসার-দাবানলতপ্ত'—সংসারের দুঃখতাপে জর্জরিত, তারা দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য গুরুর কাছে গিয়ে একান্তভাবে উপদেশ প্রার্থনা করবে—"কীভাবে এই ভবসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হব, আমার প্রকৃত আশ্রয় কোথায়, কী-ই বা সাধনপদ্ধতি গ্রহণ করব—এসব আমি কিছুই জানি না। হে প্রভো, কৃপা করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমার সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলে দিন।" প্রকৃত গুরুর যেমন কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার, তেমনি শিষ্যেরও অর্থাৎ যে গুরুর কাছ থেকে উপদেশ ও নির্দেশ পেতে চায়, তারও কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। তবেই গুরুর নির্দেশ কার্যকর হবে। সেগুলি হল—পবিত্রতা, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর কথায় বিশ্বাস।

প্রশ্ন : শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে গুরু-পরম্পরার বিশেষত্বটা কী একটু বলুন না, মহারাজ।

মহারাজ : শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই একাধারে গুরু এবং ইষ্ট বলতেন। সেই অনুসারে তাঁদের সম্প্রদায়ের 'গুরু'রা কেউ নিজেকে গুরু মনে করেন না। তাঁরা নিজেদের শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনধারার ধারক ও বাহক মাত্র মনে করেন। 'ঠাকুর'ই গুরু। তবে প্রথমে দীক্ষাগুরুর ভিতরে তাঁকে ভাবতে হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দীক্ষাগুরুকে ইষ্টে লয় করতে হয়। ধ্যানের পক্ষে এটাই সহজ এবং স্বাভাবিক প্রণালী। এজন্য দীক্ষাগুরুকে প্রথমে সংক্ষেপে ধ্যান করে পরে তাঁকে ইষ্টে লয় করে ইষ্টের ধ্যান করে যেতে হয়। 'সচ্চিদানন্দ'ই গুরু। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সবসময়ে সকলের অন্তরে রয়েছেন। তিনিই সত্যিকারের গুরু। তাঁকে হৃদয়ে ধ্যান করতে হবে। দীক্ষাগুরু হলেন পথ। তিনি সেই পথে শিষ্যকে নিয়ে যাবেন পরম-গুরুর কাছে। তাঁর কাছে পৌঁছানোই শিষ্যের পরম লক্ষ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, সকলেরই গুরু সেই এক সচ্চিদানন্দ। কিন্তু যেহেতু আমরা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে ধরতে পারছি না, এজন্য সাধনের সহায়করূপে কোন মানব-গুরুকে আশ্রয় করতে হয়। আবার মানব-গুরুর প্রতি ঈশ্বরদৃষ্টি রাখতে হয়। শাস্ত্রের এই নির্দেশ। অর্থাৎ মানব-গুরু হলেন সেই ঈশ্বর-গুরুর প্রতীক বা প্রতিমা। সুতরাং যখনি আমরা বলছি—গুরু, ইষ্ট এক বা গুরু শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, তা এই শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকে লক্ষ করেই বলা হয়। মানব-গুরু তাঁর সাধ্যানুসারে শিষ্যকে চরম লক্ষ্যে, অর্থাৎ ঈশ্বরানুভূতিতে পৌঁছাতে সাহায্য করেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দগুরু সাধককে তাঁর স্বরূপপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যান এবং তিনিই সাধকের সাধনপথের সর্বদা সঙ্গী, পথনির্দেশক ও চরম লক্ষ্য।

প্রশ্ন : মহারাজ, শিষ্যের কী কী যোগ্যতা থাকা দরকার?

মহারাজ : অভীষ্ট আদর্শে পৌঁছানোর জন্য তার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা চাই। কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য দীক্ষা নেব—এরকম যেন না হয়। গুরুর নির্দেশের প্রতি পরম নিষ্ঠা থাকা চাই। শিষ্যের চরিত্র শুদ্ধ হতে হবে। গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই চরিত্র-শুদ্ধির ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিষ্যকে বিনীত হতে হবে, উদ্ধত নয়। গভীর শ্রদ্ধার ভাব না থাকলে গুরুর আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গুরুকরণের পূর্বে তাঁকে যথাসম্ভব পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন হলেও গুরুপদে বরণ করার পরে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করা শিষ্যের একান্ত প্রয়োজন। গুরুর জ্ঞান-সম্ভার গ্রহণে শিষ্যের নম্রতাই তাকে উপযুক্ত আধারে পরিণত করে। বিনয়, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা এবং সেবার মনোভাব না থাকলে গুরুসঙ্গ করে কোন লাভ হবে না।

॥ ৭ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, একটি প্রশ্নের আলোচনায় আমরা বলছিলাম যে, 'আমি'কে খুঁজতে গিয়ে আমাদের সন্দেহটা হয়—আমি শরীর, না মন, নাকি অন্য

কিছু? আমাদের স্বরূপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে না। আমরা সেটা বলছি না।

মহারাজ : তবে অস্তিত্ব তো একটা কথা হল।

—কথার মধ্য দিয়েই তো আমরা কিছু বলতে চাইছি। আমরা যখন কোন জিনিস বুঝতে চাইছি, তখন শব্দের মধ্য দিয়েই তা বুঝতে চেষ্টা করছি।

মহারাজ : শোন, শোন। পাশ্চাত্য দার্শনিক দেকার্ত বললেন : "Cogito ergo sum." তিনি বললেন, আমি সব সন্দেহ করব। সব আছে কিনা, প্রমাণ নেই। আচ্ছা, তা ঠিক। কিন্তু আমি যে তর্ক করছি, আমি তো আছি, না হলে করছি কী করে? Cogito ergo sum. আমি সন্দেহ করছি, সুতরাং আমি আছি।

—এই আমি আছি-টাই কি আত্মা বা ব্রহ্ম?

মহারাজ : সংশয়কর্তা আছেন এর সম্বন্ধে আর সন্দেহ করা যাবে না। তুমি আছ কিনা তোমার যদি সন্দেহ হয়, তাহলে তোমার অস্তিত্বই হল না। কাজেই তুমি স্বতঃসিদ্ধ। আর তুমিই ব্রহ্ম।

—মহারাজ, আমরা বলতে চাইছি, তিনি কে? তিনি কি শরীরটা?

মহারাজ : এই, এইটাই অন্বেষ্টব্য। এইটাই জ্ঞাতব্য। তুমি নিজেকে নিজে ধরতে পার না। কুকুরের লেজের মতো। কুকুর তার লেজকে ধরতে পারে না। সে যখনি লেজটা ধরতে যাচ্ছে, সেটা পিছিয়ে যাচ্ছে। এইরকম তোমাদের ব্রহ্মের অন্বেষণ হচ্ছে কুকুরের লেজ খোঁজার মতো।

—তাহলে আর কোনদিন ধরা যাবে না?

মহারাজ : কোনদিন ধরা যাবে না, যেহেতু যে ধরতে চাইছে, তার ভিতরেই তিনি রয়েছেন। ধরবে কী করে?

—যদি ধরা না যায়, তাহলে সেই জিনিস নেই মহারাজ। কারণ, জগতে আমরা তাকেই বলি আছে, যে-জিনিসটি আমাদের পক্ষে ধরা-ছোঁওয়া সম্ভব।

মহারাজ : না, যে-জিনিসটি তোমরা চোখ দিয়ে দেখতে পার, কান দিয়ে শুনতে পার, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পার, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটাকে

তোমরা মনে করছ সত্য। কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু হলে তাকে কী বলবে?

—তাকে বলব, অনুমানের দ্বারা গম্য। অনুমানের দ্বারা তাকে জানা যায়।

মহারাজ : অনুমান কাকে বলে? জ্ঞাত বস্তু যদি থাকে, আর তাকে তার অতিদেশ করা হয়, তাহলে অনুমান হয়। হ্যাঁ, বলছি যে, 'যত্র যত্র ধূম, তত্র তত্র বহ্নি'। এখন যে ধূমও দেখেনি, বহ্নিও দেখেনি—তার কাছে অনুমান সম্ভব হবে? কাজেই ধূম সম্বন্ধে তার ক্ষেত্রে অনুমান হয় না।

—এটা তো সকলেই স্বীকার করি, যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাকেই সৎ বলি। প্রত্যক্ষ করি না কিন্তু তাকে সৎ বলব কেন?

মহারাজ : রজ্জুতে সর্প তো প্রত্যক্ষ। তাহলে সেটি কি সত্য? প্রত্যক্ষ করলেই যে সত্য হয়, তা নয়।

—কিন্তু একটা জিনিসের অনুভব হয়, মহারাজ, যে এটা একটা সাপ।

মহারাজ : একটা শব্দ ব্যবহার করলেই হয়ে গেল?

—শব্দ, স্পর্শ বা কোন কিছু দিয়ে যার কাছে পৌঁছাতে পারি না এরকম কোন জিনিসকে আমরা সৎ বলে স্বীকারই করি না।

মহারাজ : পৌঁছাতে পারবে কী করে? তোমার স্বরূপে তুমি কী করে পৌঁছাবে? স্বরূপ থেকে তুমি যদি ভিন্ন হতে, তাহলে তুমি স্বরূপে পৌঁছাতে পারতে। তুমি তো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছ। তুমি নিজেকে কী করে খুঁজে পাবে?

—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছি, না অস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছি, সেইটাই তো আমরা বুঝতে পারছি না।

মহারাজ : বুঝতে পারছ না—এই অজ্ঞান দূর করার জন্যেই বিচার। সত্যকে প্রকাশিত করার জন্যে বিচার নয়। আসলে অজ্ঞানকে দূর করার জন্যে বিচার। এইটি ধরে রাখ।

—কিন্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমানগম্য না হলেও সেটি শাস্ত্রগম্য—এটা তো বলা হচ্ছে। শব্দব্রহ্ম যদি হয়, তাহলে তো শাস্ত্র থেকে সেই শব্দই শুধু আমরা জানতে পারছি।

মহারাজ : "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এটা তো শব্দ। তার দ্বারা কী বোঝাবে?

—তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। সেইটাই বলছি যে, সেখানে আমরা এই সিদ্ধান্তটা শুনছি।

মহারাজ : সিদ্ধান্ত তোমরা শুনছ। এর দ্বারা তোমাদের অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে। কিন্তু ব্রহ্মের অনুভূতি হবে না। বিচার হবে অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য। ব্রহ্ম বেদ। বেদ অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য। এইজন্য বলছেন—"তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি।" সেখানে বেদ গিয়ে অবেদ হয়ে যায়। বুঝলে তো?

প্রশ্ন : ঠাকুর স্বামীজী সম্বন্ধে দেখেছিলেন তিনি অখণ্ডের ঘরে সপ্তর্ষির ঋষি, কিন্তু তাঁকে আবার পরীক্ষা করে নিয়েছেন কেন?

মহারাজ : শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভব—তিনটে মিলিয়ে বিচার করতে হয়। পরীক্ষিত হতে হলে শাস্ত্রসম্মত, যুক্তিসিদ্ধ ও অনুভবগম্য হওয়া চাই।

—আধ্যাত্মিক দর্শনের পরেও যুক্তির প্রয়োজন আছে?

মহারাজ : আছে বৈকি। না হলে একজন পাগল বলবে, তার অনুভব সত্য। তা বলে কি মেনে নিতে হবে?

—লীলাপ্রসঙ্গে আছে, শুকদেবের জ্ঞান হওয়ার পরেও সংশয় যায়নি। তাঁকে জনক রাজার কাছে পাঠানো হয়েছিল। ব্রহ্মের অনুভবও কি যুক্তি ও শাস্ত্র দিয়ে মেলাতে হয়?

মহারাজ : না মেলালে, সেই অনুভবটা খেয়াল না সত্যিসত্যি তা কী করে জানবে? অবশ্য সেখানে বলেছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

(মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।২।৮)

তবু বিচার করার জন্য বলেছে—শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভব—তিনটে দিয়ে বিচার করবে।

—ঠাকুর প্রথমে জগন্মাতার দর্শন পেয়েছেন। আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণী এলে জিজ্ঞেস করেছেন—দেখো, এই সব কী আমার পাগলামি? নিজেই জিজ্ঞাসা করছেন।

মহারাজ : দেখ, অবতার যখন নরদেহ ধারণ করেন, তখন মানবীয় ভাব তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন, যুদ্ধে উগ্রসেনকে শত্রুরা কেটে ফেললেন। তিনি বললেন, এমন সুরক্ষিত মথুরাপুরীতে এটা কী করে সম্ভব হল? দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, এটা মায়া। রাম সোনার হরিণের পিছনে ছুটলেন। এগুলিও মানবধর্ম।

—ঠাকুর যখন মাটিতে পড়ে মুখ ঘষছেন—"মা দেখা দে" বলে, এটা কি অভিনয়?

মহারাজ : ঠাকুর বলেছেন, এখানে সব নজির দেখানোর জন্য।

—তখন কি তিনি সত্যিই মাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না?

মহারাজ : অভিনয় মানে, যেটা সত্য নয় জেনেও সেটা করা। রাজা সেজেছে যে—সে জানে, সে রাজা নয়। কিন্তু রাজার পোশাক পরেছে। অবতার জানেন যে, তিনি মানব নন, তবু মানবদেহরূপ পোশাক পরেছেন, তাই মানবের মতো ব্যবহার করছেন। ঠাকুর বলছেন, আমার কী অভিমান আছে? অহঙ্কার আছে? মাস্টারমশায় বলছেন, একটুখানি রেখে দিয়েছেন, মানব-কল্যাণের জন্য। ঠাকুর সংশোধন করে দিচ্ছেন—না, আমি রাখিনি, মা রেখেছেন।

—হরি মহারাজ কাশীপুরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন—কেমন আছেন? ঠাকুর বলছেন—দেখ না কষ্ট পাচ্ছি। হরি মহারাজ বলছেন—আমি তো দেখছি, আপনি আনন্দসাগরে ভাসছেন। দু-তিন বার এরূপ বলার পর ঠাকুর বলছেন—যাঃ, শালা ধরে ফেলেছে!

মহারাজ : এই তো অবতারের বৈশিষ্ট্য। ঠাকুর বলছেন—এর ভিতর একটি ভক্ত, আরেকটি ভগবান—দুই-ই আছেন। কখনো তিনি ভগবান ভাবে থাকেন আবার কখনো ভক্ত ভাবে থাকেন। যখন বলছেন—আমি কিছু নই, আমি কিছু নই; তখন ভক্তভাবে বলছেন। আর যখন বলছেন—তোরা কী চাস, দিতে পারি সব; তখন ভগবান ভাবে।

—মহারাজ, কথামৃতে আছে, ঠাকুর বলছেন, ভাবে না থেকে হাত ভেঙে গেল। এটার অর্থ কী? আমাদের ধারণা, ভাবে থেকেই হাত ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মহারাজ : প্রকৃতিভাবে তাঁকে আলিঙ্গান করতে গেলেন, এমন সময় পড়ে হাত ভেঙে গেল। ওখানে এরকম চলবে না। 'ভাবে না থেকে'—মানে, ভাবমুখে না থেকে। জগন্মাতা লোককল্যাণের জন্য ঠাকুরকে ভাবমুখে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মানে ভাবস্থ হয়ে থাকতে বারণ করেছিলেন। এখানে ঠাকুর তা না করে ভাবস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই বাহ্যজ্ঞান না থাকায় পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যায়। যেখানে যে সীমা দেখাচ্ছেন, সেই সীমার ভিতর থাকতে হবে।

—আবার বলছেন ঠাকুর, হাত ভেঙেছে অহঙ্কার নির্মূল করার জন্য। এর অর্থ কী?

মহারাজ : বলা মুশকিল। নরলীলা বোঝা খুব কঠিন। বারবার ঠাকুর বলছেন, চোদ্দ পোয়া সীমার ভিতর অসীম যে লুকিয়ে আছে—এটা বোঝা কঠিন। তবে একটা কথা মনে হয়, নরলীলায় থাকা বা নিত্যে থাকা—দুটোই যে জগন্মাতার নির্দেশে হচ্ছে, সেটিকে যেন সামান্য সময়ের জন্যও লঙ্ঘন করে নিত্যে ভাবস্থ হয়ে থাকতে চাওয়া বা যাওয়া—এই অহঙ্কারটুকু নির্মূল করার জন্য।

॥ ৮ ॥

প্রশ্ন : স্বামীজীকে প্রতিবেশীরা অহঙ্কারী ভাবত। কিন্তু জীবনীকারেরা বলেছেন, এটা আত্মবিশ্বাস বা Self-confidence. Self-confidence অথবা Self-assertion—এদের পার্থক্যটা কীভাবে বোঝা যায়?

মহারাজ : একজন মানুষকে শুধু তার কথা বা আচরণ দিয়ে বিচার করা যায় না। স্বামীজী যদি অহঙ্কারী হতেন, তাহলে অপরকে তুচ্ছ করতেন। তা তিনি করতেন না। তিনি বলতেন, সকলের ভিতরেই সেই ব্রহ্ম রয়েছেন। কাজেই এটা অহঙ্কারের কথা নয়। এইসব দিক দিয়ে দেখতে হবে। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বকেছেন। শরৎ মহারাজকে বলেছেন : "দে, দে, রেখে দে—এক ছটাকে বুদ্ধি, খরচ করিস নে, সুদে বাড়বে।" যাঁর ওপরে তিনি সমস্ত সংঘের ভার দিয়ে যাবেন সেক্রেটারি করে—তাঁকে

এই কথা বলেছেন। তারপর অন্য গুরুভাইদেরও তো এরকম কত বকেছেন। চেলাদের তো কথাই নেই। কিন্তু ভালবাসা কত! কাজেই এই ভালবাসা দিয়ে, সেই background দিয়ে বিচার করতে হবে।

প্রশ্ন : আত্মশ্লাঘা কী করে বুঝব? এটি দূর করার উপায় কী?

মহারাজ : অপরের অহঙ্কার বিচার করার চেয়ে নিজের অহঙ্কার কিনা—বিচার কর। নিজের অহঙ্কার কিনা বিচার করলে আর অহঙ্কার থাকবে না। পালিয়ে যাবে। নিজেকে বিচার করলে দেখবে, তুমি কত বিষয়েতে অপরের চেয়ে ছোট। সুতরাং অহঙ্কার রাখবার জায়গা পাবে না। অহঙ্কার আসতে পারবে না।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন : "লোকে কত পূজা জপ-তপ করে, কিন্তু বিশ্বাস নাই।" এর মানে কী?

মহারাজ : বিশ্বাস নেই এইজন্য যে, এত করেও বলে—'পাপ' 'পাপ'। জপ-তপ এত করেও বলে—'পাপী' 'পাপী'। নামে বিশ্বাস থাকলে আর নিজেকে 'পাপী' বলত না। এগুলির দ্বারা আমার সমস্ত মলিনতা দূর হবে—এই বিশ্বাস থাকা চাই। তাঁর নামেতে এসমস্ত মলিনতা দূর হয়ে যাবে।

"নামেতে কাল-পাশ কাটে,
জটে তা দিয়েছে রটে,
আমরা তো সেই জটের মুটে,
হয়েছি আর হব কার।
নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।"

এক রাজার ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়েছে। সে এক ঋষির কাছে ব্রহ্মহত্যার পাপ কী করে যাবে, তার বিধান নিতে গেল। ঋষি বাড়ি নেই। তাঁর ছেলে ছিল। রাজা বললে : "তুমি বিধান দাও।" ছেলে বলল : "তিনবার রামনাম কর। তিনবার রামনাম কর, যত পাপ-তাপ সব চলে যাবে।" তারপর ঋষি যখন ফিরে এলেন, ছেলে ঋষিকে বলছে : "এক রাজা এসেছিল। তাঁর ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কী করে হবে

আমায় জিজ্ঞেস করেছে। তা আমি বলেছি, তিনবার রামনাম করতে।” ঋষি বললেন : “বলিস কীরে? এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে। তিনবার রামনাম করাইলি তারে?” এত বিশ্বাস—এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে! এর নাম বিশ্বাস।

প্রশ্ন : মহারাজ, আরেকটা প্রশ্ন করছি। আমরা সবসময় শুনছি বা বলি, ভগবানলাভ, ভগবানলাভ। ভগবানলাভ—এক-এক জন এক-এক রকম করে ব্যাখ্যা করেন বা বোঝাতে চান। যেমন কেউ হয়ত অনাহত ধ্বনি শোনা, কেউ দেবদেবীর মূর্তিদর্শন বা জ্যোতির্দর্শন ইত্যাদি বলে বোঝাতে চান।

মহারাজ : অনাহত ধ্বনি শোনাকে ভগবানলাভ কেউ বলে না।

—কী দেখে বা কীভাবে বুঝব সেটি ভগবানলাভ, বা ভগবানলাভ বলতে কী বুঝব?

মহারাজ : ভগবানলাভ ঠিক ঠিক বুঝতে হলে বুঝবে যে, ভগবান যেমন শুদ্ধ, পবিত্র ও সর্বগুণসমন্বিত, যে তাঁকে লাভ করেছে সেও ঐরকম পবিত্র, শুদ্ধ ও সর্বগুণসমন্বিত হবে। এই—ভগবানলাভ মানে। সর্বগুণসমন্বিত হবে। আর তার অহঙ্কার থাকবে না। অভিমান থাকবে না। ভয় থাকবে না। আর ঐ যে সিদ্ধের লক্ষণগুলি—ঐগুলি ফুটে উঠবে তার ভিতরে। এই।

প্রশ্ন : আমরা তো সকলেই এই পথে চেষ্টা করছি সাধ্য অনুসারে। আমরা সবাই ঠিক পথে এগচ্ছি কিনা, এটা বোঝার মাপকাঠি কী?

মহারাজ : প্রথম কথা বিশ্বাস। গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস। অর্থাৎ, গুরু ও শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস। এটি হল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আন্তরিক চেষ্টা। তাহলে এগনো সম্ভব। আবার এগুলো হচ্ছে কিনা, বুঝব কী করে? তা ভাগবতে একটি শ্লোক আছে—যে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তার এ-তিনটি একসঙ্গে হয়—‘ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ-প্রবোধঃ’। ভগবানেতে অনুরাগ বাড়বে। ভগবান ছাড়া অন্য বিষয়েতে বৈরাগ্য আসবে। আর ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হবে। এই তিনটি

যেমন যেমন মানুষ এগবে সমভাবে তার ভিতরে প্রকাশিত হবে। শ্লোকটি হল—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

(ভাগবত, ১১।২।৪২)

এরকম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—যেমন একজন খেতে পায়নি। তার না খাওয়ার জন্য খিদেয় কষ্ট হয়, দুর্বলতা বোধ হয় এবং মনে একটা অশান্তি জাগে। তাকে যখন খেতে দেওয়া হয়, তখন গ্রাসে-গ্রাসে তার খিদের কষ্ট দূর হয়। তার শরীরে সে যেন বল পায়। আর মনের যে অসন্তোষ সেটা দূর হয়। এইরকম যারা ভগবানের শরণাপন্ন তাদের এই তিনটি একসঙ্গে হয়। 'ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ'—এই তিনটি।

প্রশ্ন : মহারাজ, একটি গানে আছে—"রাজরাজেশ্বর দেখা দাও। করুণাভিখারি আমি করুণা নয়নে চাও।" এর মানে কী?

মহারাজ : তিনি রাজরাজেশ্বর যদি না হতেন, তাঁর কাছে চেয়ে লাভ কী? তিনি যদি করুণাময় না হতেন, তা আমায় করুণা করবেন কোথা থেকে? এইজন্য এরকম প্রার্থনা করতে হয়।

—যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, যারা ঈশ্বরকে মানে না, তাদের কাছে তো এইসব কথার কোন অর্থ নেই।

মহারাজ : তারা বলেও না কিছু। ঈশ্বরকে মানে না, তা আবার দয়াময় আর করুণাময়!

—যে ঈশ্বরকে মানে না সে যদি প্রশ্ন করে যে, কেন তুমি ঈশ্বরকে দয়াময় বলছ?

মহারাজ : সে বলবে, আমরা তাঁর দয়ার ওপর নির্ভর করি বলে তাঁকে দয়াময় বলি। জেনে বলি না। প্রার্থনা করি। বিশ্বাস থাকলে আর দয়াময় বলতে হবে কেন? "মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।"

—কোন যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না?

মহারাজ : যুক্তি এই যে—আমরা যা চাই সেই গুণে তাঁকে ভূষিত করি। এই যুক্তি।

—অর্থাৎ, মনের ভাবটা। আমাদের যেরকম মনের ভাব, তাকেই ঈশ্বরের গুণ বলে আমরা বলছি, তাহলে ঈশ্বরকে যে দয়াময় বলি বা অন্যান্য যেসমস্ত গুণ সেগুলোর তো বাস্তবতা থাকছে না—সত্যতা থাকছে না।

মহারাজ : যে ঈশ্বরকে জেনেছে সে বলতে পারবে। যে জানেনি সে কী করে বলবে যে, তিনি কেমন। কাজেই সেও যে বলে দয়াময়, কারণ সে নিজে দয়ার প্রার্থী বলে বলছে—দয়াময়। শিখেরা ঠাকুরকে বলছেন : "ভগবান দয়াময়।" ঠাকুর বলছেন : "দয়াময় কেন?" তাঁরা বললেন : "তিনি আমাদের এই করেছেন, ঐ করেছেন।" ঠাকুর বলছেন : "তাঁর সন্তান তিনি পালন করবেন, তাতে আর বাহাদুরি কী আছে?"

॥ ৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন : "যে একবারও আমাকে আন্তরিক ডেকেছে, তাকে আমার কাছে আসতে হবে, এখানে আসতে হবে। একথার অর্থ কী?"

মহারাজ : এটা তো ঠিক ঠাকুরের কথা হল না। ঠাকুর বলেছেন : "যাদের ঠিক ঠিক ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তাদের এখানে আসতে হবে।"

—ঠাকুর আরো বলেছেন : "যে এখানে এসেছে, তার এটা শেষ জন্ম।" এই কথারই বা তাৎপর্য কী?

মহারাজ : যারা এখানে আসবে তাদের শেষ জন্ম। তাদের আর জন্ম নিতে হবে না—'জন্মবন্ধবিনির্মুক্ত'। গীতার ভাষায় বললে বুঝতে পারবে—হ্যাঁ! ঠাকুরের ভাষায় বললে বুঝতে পারবে না? "জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।"

—ঠাকুর বলেছেন, এখানে যে আসবে...। তা, ঠাকুর যখন ছিলেন—যাঁরা গেছেন মুক্ত হয়েছেন। এখন আমাদের কী হবে? শ্রীমা প্রসঙ্গক্রমে

বলেছেন, যতক্ষণ এতটুকুও বাসনা থাকবে, জীবকে আবার আসতে হবে। এখানে আসার পর, ভগবানকে ডাকার পর, ধরা যাক, কেউ মায়ায় জড়িয়ে পড়ল, মনে বাসনা জাগল, তাহলে তো তার মুক্তি হচ্ছে না। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, যে এখানে আসবে তার শেষ জন্ম। ঠাকুর ও মায়ের কথার মধ্যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে। তাই না, মহারাজ?

মহারাজ : ঠিক। আসল কথা হচ্ছে, বাসনা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আবার আসতে হবে।

—তাহলে কথাদুটি কি আলাদা হচ্ছে না?—যে এখানে আসবে, তার এটা শেষ জন্ম এবং বাসনা থাকলে আবার আসতে হবে।

মহারাজ : অর্থাৎ, এখানে এলে বাসনাশূন্য হবে। ঠাকুর বলতে চাইছেন, এখানে যারা আসবে তারা ক্রমে বাসনাশূন্য হবে।

—গতকাল ঠাকুরের সাধারণ উৎসব ছিল। কাল তো লক্ষ লক্ষ লোক এখানে এসেছে, তা সকলের মুক্তি হয়ে যাবে?

মহারাজ : তারা এখানে আসেনি। তারা মেলায় এসেছে।

—সকলে তো বেলুড় মঠে এসেছে। তাহলে, এখানে আসার মানেটা কী?

মহারাজ : এখানে এসেছি মানে, যারা এখানে জীবন সমর্পণ করেছি। আসার মানে, তাঁর ভাবকে গ্রহণ করা। পরিপূর্ণভাবে। সর্বান্তঃকরণে। আসা মানে এই।

—মহারাজ, ঠাকুর মথুরবাবু সম্পর্কে বলেছেন, তাঁকে আবার আসতে হবে। কারণ, তাঁর বাসনা ছিল।

মহারাজ : হ্যাঁ, বলেছেন, এসে আবার কোথাও রাজা-টাজা হবে। রাজা হয়ে ভোগ করবে, কষ্ট পাবে। কারণ, রাজা হয়ে আসা মানে সমূহ বিপদ ঘাড়ে নেওয়া!

—মহারাজ, জন্মগ্রহণ মানেই তো কষ্টভোগ!

মহারাজ : হ্যাঁ, ঠাকুর বলেছেন, মথুরের ভোগ আছে, বাসনা আছে। তার ভোগবাসনা ছিল। এমনকী, হৃদয়রাম সম্পর্কেও বলেছেন, তাকে আবার আসতে হবে, কারণ সেও ভোগবাসনাশূন্য ছিল না।

—হৃদয় ঠাকুরের এত সঙ্গ পেল, এত সেবা করল। তাতেও তার হল না।

মহারাজ : না। সুতরাং আমাদের কী গতি হবে! বুদ্ধিমান বুঝে নাও।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন যে, শুদ্ধ-মন আর শুদ্ধ আত্মা এক। কিন্তু মন তো জড় বস্তু, প্রকৃতি থেকে জাত। সেটা কী করে আত্মার সাথে এক হবে?

মহারাজ : মন ব্রহ্মতে আরোপিত বস্তু। তা না হলে তার প্রকাশ হতো না। কেন আরোপিত বলছি? চৈতন্যে আরোপিত হলে তবে প্রকাশ হয়। ব্রহ্মতে মন আরোপিত হলে তবে মনের প্রকাশ হয়। কাজেই, মন ব্রহ্মতে আরোপিত। সেই মন মানে হল যে, মনসাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। তা, শুদ্ধ হলে কী হবে? আরোপের লোপ হবে। তাহলে কী থাকল? ব্রহ্ম থাকল। এই হিসাব পেয়ে গেলে। শুদ্ধ-মন আর শুদ্ধ-বুদ্ধি এক। ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ-মন ও শুদ্ধ-বুদ্ধি এক। শুদ্ধ-বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। একই কথা হল।

—আরেকটা শ্লোকে ভগবান বলছেন :

> "ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
> ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।" (গীতা, ৪।১৪)

মহারাজ, এই যে ভগবান কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, কর্মফলে তাঁর বন্ধন হয় না—এইটা জানলে সাধক কর্মের দ্বারা বদ্ধ হবে না। দুটো কি একই রকম— ?

মহারাজ : বলা হচ্ছে, সে কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না। ভগবান দেহধারী হয়েও কর্মের বন্ধনে বদ্ধ নন। সাধক জানবে—দেহধারী হয়েও কর্মের বন্ধনে আমি বদ্ধ নই।

—কিন্তু ভগবানের যে-গুণগুলি বা স্বরূপ সাধক নিজেতে আরোপ করে, ব্যাপারটা কি এই রকম? কিন্তু আমরা তার দ্বারা কি কর্ম থেকে মুক্ত হচ্ছি? সেইটা প্রশ্ন থেকে যায়। ভগবান তো পূর্ণকাম। আমরা তো তা নই।

মহারাজ : আমাদের জানা মানে, ঐ জানার চেষ্টা করা। আরোপ যেমন বললে—আরোপ করা। এই হল। প্রথমেই পুরো জানা হয় না। ঐরকম জানলে সে কর্মের দ্বারা বন্ধ হয় না। এই কথা আছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, এরকম একটা ভাব আমাদের আছে যে, গৃহস্থ পণ্ডিতের কাছে পড়ব না, সাধুর কাছে পড়ব।

মহারাজ : গৃহস্থ বা সাধু—এরকম ভাগ করছ কেন? তত্ত্বজ্ঞ বা তত্ত্বান্বেষীর কাছে পড়া যায়।

—মহারাজ, অনেক পণ্ডিত আবার শাস্ত্র পড়ার আগে বলেন, বারো বছর ব্যাকরণ পড়ে এসো।

মহারাজ : হ্যাঁ, বারো বছর ব্যাকরণও পড়লাম না, আর শাস্ত্রও পড়লাম না!

—মহারাজ, এরকম হতে পারে যে, পড়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু এমন সেন্টারে পড়লাম যে, কাজের চাপে পড়াশোনার সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না।

মহারাজ : এত কাজ কেউ করে না যে, একটু সময় পায় না পড়ার জন্য।

—শুনেছি, রিলিফের কাজের সময়ে একটুও নাকি সময় পাওয়া যায় না। যদিও আমি রিলিফ করিনি।

মহারাজ : একথা একেবারে ঠিক নয়। আচ্ছা বল, খেতে সময় পাও তো, ঘুমাতে সময় পাও তো? বেড়াতে, গল্প করতে? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে? তবে?

—তার মানে, এরই মধ্যে সময় বার করে নিতে হবে।

মহারাজ : তাই। এই হল আসল কথা। সমুদ্রের সব ঢেউ শেষ হবে তারপর সমুদ্রে স্নান করব—এ কোনদিন হবে না। সমুদ্রের ঢেউ কোনদিন শেষ হবে না। যা করার এর মধ্যেই করে নেবে। আসল কথা হচ্ছে—নিজের ইচ্ছা।

—মহারাজ, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু সময় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই সময়টুকুতে শাস্ত্র পড়া বা শাস্ত্রার্থ চিন্তা করার ঠিক ভাব বা আগ্রহ আসে না।

মহারাজ : সেই ভাব আনার জন্য চর্চা করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বাইরের অসুবিধার থেকে আন্তর বাধাই প্রবল। তাই দরকার অন্তর্মুখী হওয়া। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁতে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হয়ে না থাকলে হয় না। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলি। তখন আমি উত্তরকাশীতে। ঠিক উত্তরকাশীতে না, নিচে নেমে এসে একটা গুহায় ছিলাম। দিনে একবার ভিক্ষা করে আনতাম। বেশ ছিলাম। একদিন গুহার ভিতরে রয়েছি। হঠাৎ শুনতে পাচ্ছি, বাইরে খুব কলরব। কী ব্যাপার দেখার জন্য বাইরে এলাম। দেখি, কোন এক পলিটিক্যাল পার্টির বেশ কিছু লোক সেখানে ক্যাম্প করেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতদিন থাকবেন? বললে, একমাস। আমি ভাবলাম, একমাস থাকবে! তাহলে তো আমার সর্বনাশ। তার পরদিন আমি, ওখানে আর থাকা যাবে না ভেবে, একটা নির্জন স্থান খুঁজতে বেরলাম। একটা গুহা পেলাম। কিন্তু বর্ষাকাল। দেখি চারদিক থেকে জল পড়ছে। জল পড়ে বেশ জল জমে গেছে। ওটা হল না। আরো খুঁজতে খুঁজতে একটা পেলাম। কিন্তু সেই গুহার সামনে সারাদিন লোকেরা আসে জল নিতে। সারাদিনই লোকের ভিড়। সেটাও পছন্দ হল না। আর এদিকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুব অবসন্ন হয়ে পড়েছি। পথে একটা গ্রামে কিছু ভিক্ষা করে খেয়েছিলাম। যাই হোক, সারাদিন কাটিয়ে নিজের গুহায় ফিরে এলাম। খুব ক্লান্তি! মনে হল, আরে আমি কেন নিজে ব্যস্ত হচ্ছি? যিনি আমার সব ব্যবস্থা করছেন, যিনি আমাকে দেখছেন—তাঁকে ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই না কেন? একথা ভাবতে ভাবতে সারাদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে উঠে দেখি কী জান! সেইসমস্ত লোক ক্যাম্প তুলে কোথায় চলে গেছে!

॥ ১০ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, সাধুজীবনে পড়াশুনার ব্যাপ্তি সম্পর্কে প্রসঙ্গ হচ্ছিল।

মহারাজ : হ্যাঁ, একবার কাশীতে গিয়ে আমার পড়ার ইচ্ছা হল। তখন

আমি মঠে। মহাপুরুষ মহারাজ মঠে ছিলেন না। শরৎ মহারাজ ছিলেন। তাঁর কাছে মনের ইচ্ছে জানালাম। মহারাজ বললেন, তুমি মঠে আছ, মহাপুরুষ মহারাজকে জানাও। লিখলাম মহাপুরুষ মহারাজকে। উত্তরে লিখলেন—কতকগুলো ব্যাকরণ চচ্চড়ি করা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যদি বেদান্ত পড়তে চাও তো মঠে পণ্ডিতের কাছে পড়তে পার। ব্যস্, আর কাশী গিয়ে পড়া হল না। পণ্ডিতি হল না, বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। নয়ত পাণ্ডিত্যই হতো, আর কিছু হতো না। আসল কথা কী—পণ্ডিত হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরকার। আমাদের অর্থাৎ সাধুদের তো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। তাই পণ্ডিত হওয়া যায় না। যার ভেতর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যতটুকু আছে, ততটুকু সাধুত্ব কমে যায়।

প্রশ্ন : মহারাজ, পড়াশোনা ও সাধুত্বের সামঞ্জস্য করে কীভাবে চলা যায়?

মহারাজ : মনে রাখলেই হবে যে, পড়াশোনার উদ্দেশ্য সাধুত্ব গড়া, পণ্ডিত হওয়া নয়। পড়াশোনা আমার সাধুজীবনকে সাহায্য করবে, সহায়ক হিসাবে। পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যই মুখ্য। তাদের পড়াশোনার সাথে সাধুত্বের কোন যোগ নেই। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সাধুত্বই লক্ষ্য। যা পড়ব, সেটা জীবনে অনুশীলন করা ও জীবনে প্রতিফলন করাই লক্ষ্য। সেটা কি পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য? তা নয়। তাদের পাণ্ডিত্যই লক্ষ্য। জীবনের সাথে সে-পড়াশোনার কোন যোগ থাকুক আর নাই থাকুক।

—মহারাজ, ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে জিজ্ঞেস করছেন, পঞ্চদশী-টশী পড়েছ? বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল বলছেন—সে আবার কী মশায়? ঠাকুর বলছেন, বেঁচে গেছ। ঠাকুর এরকম কেন বললেন?

মহারাজ : এধরনের বই পড়ে শুধু বড় বড় প্রশ্ন করে কী লাভ? যা আমরা বুঝতে পারব না, ধরতে পারব না, করতে পারব না তা নিয়ে শুধু প্রশ্ন করে কী হবে? এ তো শুধু কথার কথা। বইয়ে পড়েছি বা শুনেছি, বুঝতে পারছি কি?

—তবু মহারাজ, সিদ্ধান্ত আগে থেকে পড়া থাকলে বা শোনা থাকলে ভাল। তারপর সেটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যাবে।

মহারাজ : শুধু সিদ্ধান্ত জেনে কী হবে? এক লাফে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়? আমরা হাজারবার যদি বলি, 'আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম'—আমি কি ব্রহ্ম হচ্ছি? হাজারবার বললেও 'আমি ব্রহ্ম' উপলব্ধি হচ্ছে না, হবেও না। এক লাফে কি ছাদে ওঠা যায়? ছাদে উঠতে গেলে সিঁড়িতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, এই সিঁড়ির একটার পর একটা অতিক্রম করে আমাকে ছাদে পৌঁছাতে হবে। সিঁড়িকে না মেনে শুধু ছাদে উঠব—এ ভাবলে কি ছাদে ওঠা হবে? সিঁড়ি মানে সাধন। সাধনের কথা ঠাকুর বারবার বলছেন। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'—এই করে করে এগতে হবে। এরকম না করে কেউই বলতে পারবে না, উপলব্ধি করতে পারবে না 'সোঽহং'। 'নাহং' 'নাহং' থেকে 'সোঽহং'। একজন সোঽহং বলছে। ঠাকুর বলছেন, ওকি কথা এখন? বল—'নাহং নাহং'। এই 'নাহং' থেকেই 'সোঽহং' উপলব্ধি হবে। নতুবা 'স'-ও বুঝব না, 'অহং'-ও বুঝব না। অতএব, স এবং অহং-এর অভেদত্বও বুঝব না। হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরবে! সর্বদা বিচার করতে হবে। বিচার করতে করতে তত্ত্বের ধারণা হবে। তাই বলছে—"আসুপ্তে আমৃতে কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া।"—যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছি, যতক্ষণ এই দেহ থাকছে, ততক্ষণ সর্বদাই মনকে বেদান্তচিন্তা দ্বারা পূর্ণ করে রাখতে হবে। কেন? যাতে মনে কামাদি অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়। এইজন্য উপনিষদ্ পড়।

—মহারাজ, এই যে সদাসর্বদা বিচার করতে ঠাকুর বলছেন; আবার বলছেন—হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তবে উপায় কী?

মহারাজ : হাজার বিচার কর—এখানে 'বিচার' মানে শুধু আলোচনা, পড়া। তাতে হবে না। জীবনে বিচারের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে হবে। খুব ঘষতে হবে। এখন শুনছি, কিন্তু এক্ষুনি সংস্কার তৈরি হচ্ছে না। ঘষতে ঘষতে সংস্কার তৈরি হয়। খুব কঠিন। শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার বা আলোচনায় হবে না। সেজন্য আমার এই শ্লোকটা খুব ভাল লাগে। খুব দরকারি। এগুলিই আমাদের সাধন। এগুলি করলে এবং সঙ্গে বিচার করলে হবে। শ্লোকটি হচ্ছে—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

(কঠোপনিষদ্, ১।২।২৪)

এখানে প্রজ্ঞা মানে আলোচনা, বিচার। শুধু বিচারের দ্বারা হবে না। এগুলির সাধন করতে হবে।

প্রশ্ন : 'মা'-ই এইসব হয়েছেন, এই জগৎ সত্য—একথার মানে কী?

মহারাজ : 'হয়েছেন' মানে, কোন্ মতে হয়েছেন? পরিণামী মতে, না অপরিণামী মতে? পরিণামী মতে, তিনি ইচ্ছে করলে নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি বিভু হতে পারেন। আর অদ্বৈতবাদী মতে, বহু যা দেখছি তা তাঁর ওপর অধ্যস্ত। সুতরাং তাঁকেই দেখছি, কিন্তু 'তিনি' রূপে দেখছি না। অন্য রূপে দেখছি, বহু রূপে দেখছি। তাঁর ওপর বহুত্ব আরোপিত। এই দুরকম ভাষা আছে।

—ঠাকুর বলছেন বাজিকরই সত্য, বাজি মিথ্যা। আরো বলেছেন, সমুদ্রকে দূর থেকে দেখ নীল, কাছে গিয়ে দেখ রং নেই। আরোপিত যা বললেন, তাই কি এখানে ঠাকুর বলেছেন উদাহরণ দিয়ে?

মহারাজ : সমুদ্রের দৃষ্টান্তে দেখি, কতকগুলি condition-এর দ্বারা বস্তুর প্রকাশ ভিন্নরকম হয়। আলোকের বিকিরণ যাকে 'রামণ এফেক্ট' বলে—তার জন্য সমুদ্রের রঙের পরিবর্তন হয়। সেটা আরোপিত বলা চলবে না। সমুদ্র যে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তা নয়। তার condition-কে অপেক্ষা করে সমুদ্রের প্রকাশ হয়। ব্রহ্মকে জগৎ রূপে যখন দেখছি, তখন ব্যক্তি যে-condition-এ আছে তার দ্বারা তার কাছে জগতের প্রকাশ, অবভাস বা অপভাস হয়। আরেক মতে, ওসব কিছু নেই। জগৎ নেই, এক তিনি আছেন আর তাঁর ওপরে আরোপ করছেন। কে আরোপ করছেন? তিনি তাঁর থেকে ভিন্ন না অভিন্ন? তাঁর থেকে যদি ভিন্ন হন তবে তিনি তাঁর ওপরে আরোপ করবেন কী করে? অভিন্ন যদি হন তবে আরোপ আর কী করে হবে?

বাজিকরই সত্য। রামানুজের মতে, তিনিই সব হয়েছেন। ঠাকুরের মতে, বিজ্ঞানী দেখে—তিনিই সব হয়েছেন। আর অদ্বৈতবাদী দেখে—তাঁতে জগৎ-দৃষ্টি করে। জগৎ-দৃষ্টি কোথায় হচ্ছে—না তাঁতে। যেমন সর্প-দৃষ্টি কোথায় হচ্ছে? না—রজ্জুতে। মরীচিকার দৃষ্টি হচ্ছে কোথায়? মরুতে। সেইরকম।

—ঠাকুর দুরকমই মেনেছেন। আমাদের কাছে দুটো বিরোধী কী করে সত্য হয়?

মহারাজ : বিরোধী নয়। দ্রষ্টার অপেক্ষায় বিরোধী—আপাতদৃষ্টিতে।

—তা হলেও আমরা একসঙ্গে তো একটাই view point দেখতে পারি। একসঙ্গে তো দুটি view point দেখতে পারি না। সেটাই সমস্যা।

মহারাজ : বাজিকরই সত্য। জগৎটা সত্য হয়, যদি সেটি ব্রহ্ম হয়। "যদিদং জগৎ ব্রহ্মৈব।" ব্রহ্ম অপরিণামী, জগৎ পরিণামী কেমন করে হবে? এর উত্তরে বলছেন—জগৎটা তাঁর ওপরে আরোপিত। আরোপের দ্বারা যাঁর ওপর আরোপিত—তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। তাই আরোপের অধিষ্ঠান তিনি হতে পারেন, কিন্তু তাতে তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না।

—ঠাকুর দুটিকেই সত্য বলেছেন। সমস্যা—আমরা কোন্‌টিকে অনুসরণ করব?

মহারাজ : যেটা তোমার কাছে অনুকূল হবে, সেটা অনুসরণ করবে।

—সিদ্ধান্তরূপে কোন্‌টি নেব?

মহারাজ : তুমি যদি অদ্বৈতবাদী হও তবে সিদ্ধান্তরূপে 'অদ্বৈত'কে মানবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলতেন, শক্তিরই অবতার। শক্তির অবতার বলতে আমরা কী বুঝি?

মহারাজ : ভগবান শক্তিরূপ। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় শক্তির দ্বারা হয়। যখন তিনি ভগবান তখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করছেন। তাঁরই অবতার হয়। যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁর অবতার হয় না। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যিনি করছেন, সেই ক্ষমতা বা ক্ষমতাবানকেই শক্তি বা ঈশ্বর বলা হয়। তাঁর অবতার হয়।

—বৈষ্ণবদের ভাব, অবতার বিষ্ণুর থেকে হয়। অবতাররা কার থেকে আসেন?

মহারাজ : যত অবতার বিষ্ণুর থেকে হয়েছেন। কেন? কেননা বিষ্ণু হচ্ছেন রক্ষাকর্তা, ঈশ্বরের স্থিতিরূপ। স্থিতির জন্যই অবতাররা আসেন, তাই সবাই বিষ্ণুর অবতার।

—মহারাজ, শুধু স্থিতির জন্য নয়, ধ্বংস করার জন্যও তো আসেন।

মহারাজ : স্থিতি করতে হলে তো ওরকম করতে হবে। তিনিই—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৭৬)

সৃষ্টির সময়ে তিনি সৃষ্টিকারণ হয়ে আসেন। তিনি জগন্ময়—সৃষ্টিতেও আছেন, স্থিতিতেও আছেন, জগতের লয়েও আছেন। মা যে কখনো দু-চার ঘা চড়-চাপড় দেন, তা তো স্থিতির জন্য।

—ঠাকুর বলেছেন, সাকারও সত্য, নিরাকারও সত্য। একথাটা আমরা বুঝতে পারি না।

মহারাজ : ঠাকুর বলতেন, ভগবানের ইতি করতে নেই। তিনি এই হতে পারেন আর ঐ হতে পারেন না—এরকম ভাবতে নেই। তিনি সবই হতে পারেন। কাজেই তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, আবার সাকার-নিরাকারের পারেও বটে।

—সাকার-নিরাকারের পারেও আবার কী হতে পারে?

মহারাজ : যাঁকে সাকারও বলা যায় না, নিরাকারও বলা যায় না।

—এমন বস্তুকে কি বুদ্ধিতে বোঝা যায়?

মহারাজ : বুদ্ধিতে বোঝা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান—এসবের দ্বারা বোঝা যায় না।

—তিনি সাকার আবার নিরাকার, সেটা কি একই ক্ষণে?

মহারাজ : একই ক্ষণে বৈকি। তিনি কী ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছেন? যখন তাঁকে জলরূপে দেখছি, তখন তাঁকে বরফরূপেও দেখছি।

—ঠাকুরের বহুরূপীর গল্পে আছে, একটা গিরগিটি এক এক সময়ে রং বদলাচ্ছে।

মহারাজ : সে তো আমরা দেখছি বলে। আমাদের দিক দিয়ে দেখলে যখন লাল দেখছি তখন নীল দেখছি না, যখন নীল দেখছি তখন হলুদ দেখছি না। কিন্তু যেখানেই লাল, সেখানেই নীল, সেখানেই হলুদ—সবই সূক্ষ্মরূপে সেখানে আছে।

—তাহলে একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি কি একইসঙ্গে সাকার এবং নিরাকার?

মহারাজ : তাঁর কথা হচ্ছে, ব্যক্তির কথা হচ্ছে না। ঠাকুর বলছেন তাঁর কথা—ঈশ্বরের কথা। কেউ তাঁকে সাকার দেখছে, কেউ নিরাকার দেখছে।

—তাহলে যে দেখছে, সে একইসঙ্গে উভয়রূপে দেখতে পারে কিনা?

মহারাজ : একজনের কাছে হচ্ছে না, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে হচ্ছে। একই মুহূর্তে একই সময়ে সৃষ্টি হচ্ছে, স্থিতি হচ্ছে, লয়ও হচ্ছে। এটা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হচ্ছে না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা দেখছে তাঁকে।

—একজনের ক্ষেত্রে তো হচ্ছে না?

মহারাজ : একজনের কাছে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় একসঙ্গে কী করে হবে? তা তো হতে পারে না।

॥ ১১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী রামকৃষ্ণ সংঘের আদর্শ বলতে গিয়ে বলেছেন : "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" শাস্ত্রে কি এধরনের কোন কথা আছে, যা থেকে তিনি এটি নিয়েছেন?

মহারাজ : স্বামীজীর কথাই তো শাস্ত্র।

—সেটা তো আমরা স্বীকার করি মহারাজ, তবুও স্বামীজী অনেক কথাই বলেছেন যেগুলো শাস্ত্রে রয়েছে। এর সদৃশ কোন বাক্য পাওয়া যায় কি?

মহারাজ : শাস্ত্র তাকে ঠিক বলা যায় না। "বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ" (বসন্ত ঋতু যেমন লোকের সুখ প্রদান করে থাকে)—আচার্য শঙ্কর বলেছেন।

—স্বামীজী আত্মমুক্তির সঙ্গে জগদ্ধিত—এই দ্বিতীয় জিনিসটি যোগ করলেন সন্ন্যাসীর আদর্শের সঙ্গে।

মহারাজ : সঙ্গে একথা বলো না। এ হল সহানুষ্ঠান। কারো গুরুত্ব কম নয়, কারো বেশি নয়।

—স্বামীজীর আগে সন্ন্যাসীদের জীবন ও তাঁদের আদর্শের কথার মধ্যে দেখা যায়—শুধু আত্মমুক্তিই হল লক্ষ্য। তাহলে, তিনি এই জগৎ-হিত যোগ করলেন কেন?

মহারাজ : স্বামীজী লক্ষ করেছেন, শুধু আত্মমুক্তি-আত্মমুক্তি বলে সন্ন্যাসীরা স্বার্থপর, অলস এবং নির্দয় হয়ে পড়ছে। তাতে না হচ্ছে আত্মমুক্তি, না হচ্ছে কারো উপকার। স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা থেকে আসে। স্বার্থপরতাই মালিন্য; চিত্তশুদ্ধি আত্মজ্ঞানের পূর্বশর্ত। চিত্তশুদ্ধ হওয়া মানে স্বার্থপরতা চলে যাওয়া। জগদ্ধিতটা প্রথমদিকে ঠাকুরের সন্তানদের ভিতরেও অনেকে গ্রহণ করেননি। স্বামীজী সেটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তিনি জোর দেওয়ার পর গুরুভাইরা সেটা গ্রহণ করেছেন। কথামৃত পড়লে জগদ্ধিতটা যেন গৌণ মনে হয় কখনো কখনো। ঠাকুর বলেছেন : জগৎ কী এতটুকু গা যে তার উপকার করবে? ঠাকুরের এসব কথার অর্থ প্রসঙ্গ অনুযায়ী বুঝতে হবে।

—তাহলে মহারাজ, স্বামীজী চিত্তশুদ্ধির জন্য জগদ্ধিতের ব্যবস্থা বা সুপারিশ করেছেন?

মহারাজ : চিত্তশুদ্ধির জন্য শুধু নয়, আত্মমুক্তির যেমন গুরুত্ব, ঠিক একই গুরুত্ব জগদ্ধিতেরও।

—তাহলে মহারাজ, আপনি বলছেন—চিত্তশুদ্ধি হলেই আত্মমুক্তি হয়ে গেল। দুটোই সমান বা একই জিনিস।

মহারাজ : চিত্তশুদ্ধি আর জগদ্ধিত। জগদ্ধিত দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কথাটা ঠিক নয়। আদর্শ—আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিত। মনে রাখতে হবে দুটোই আদর্শ।

—মুক্তি যখন উদ্দেশ্য তখন জগদ্ধিতটা কি উপায় নয়? উপায়—মানে যাকে সাধন বলছি আমরা।

মহারাজ : মুক্তি উদ্দেশ্য শুধু, কে বলল তোমাকে?

—জীবের উদ্দেশ্য কী? পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অভিন্নতা বা ঐক্যানুভব বা মুক্তি—এই তো?

মহারাজ : ঠাকুর স্বামীজীকে বকুনি দেননি? মুক্তিই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এই বকুনির অর্থ কী? ঠাকুর স্বামীজীকে বলেননি যে, নির্বিকল্প সমাধির থেকে আরো উঁচু অবস্থা আছে? সে উঁচু অবস্থাটা কী? না—সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করে তার সেবা করা।

—আমরা যে বলছি, কর্মযোগ বা জগদ্ধিত আমাদের সাধন—

মহারাজ : লক্ষ্য। আত্মমুক্তিও লক্ষ্য, জগদ্ধিতও লক্ষ্য।

—দুটো এক হল কী করে? দুটোই সমান বললেন, দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। দুটোই যদি লক্ষ্য হয় তবে দুটো পৃথক নয়?

মহারাজ : দুটো তো এক নয়ই। দুটি আলাদা—দুটি পৃথক। কেউ জগতের হিত করার চেষ্টা করছে, আত্মমোক্ষের দিকে নজর দিচ্ছে না। অন্য কেউ আত্মমোক্ষ দেখছে, জগদ্ধিতের চেষ্টা করছে না। দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে—স্বামীজীর কথা এই। শব্দদুটির শেষে 'চ' শব্দটির অর্থ 'এবং'—অর্থাৎ দুটোকেই নিতে হবে। আত্মমুক্তির চেষ্টা কর এবং জগতের হিতও সেইসঙ্গে কর।

—দ্বিতীয়টার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকভাব নাও থাকতে পারে। জাগতিক উপায়ে অনেকে জগদ্ধিত করার চেষ্টা করছে।

মহারাজ : হ্যাঁ, সেজন্যই স্বামীজী জগদ্ধিতের সঙ্গে আত্মমুক্তি বলছেন। দুটোতেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

—যখন জগদ্ধিতের জন্য আমরা কাজ করছি, তখন কি মুক্তির কথা মনে থাকবে না? মুক্তির কথা মনে রেখে—

মহারাজ : এবার তার উলটোটা তোমাকে বলছি। যখন মুক্তির চেষ্টা করছ, তখন জগদ্ধিত কি মনে থাকবে না?

—অনেক সময় থাকে না। স্বার্থপরতা এসে যায়, এটা লক্ষ করা যায়। শুধুই নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

মহারাজ : তেমনি সমানভাবে জগদ্ধিতের সময় আত্মমুক্তির কথা মনে থাকে না।

—তাই। কিন্তু দুটো যদি পৃথক হয়—

মহারাজ : দুটো পৃথক মানে, দুটোকে একসঙ্গে করতে হবে। পৃথক মানে, একটা করলেই হয়—তা নয়। দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

—অর্থাৎ, দুটোই লক্ষ্য। একটা লক্ষ্য, অন্যটা উপায়—এরকম নয়। স্বামীজী সেটাই বলেছেন।

মহারাজ : একটা মুখ্য, অন্যটা গৌণ—তাও নয়। কথামৃতকার যেভাবে দেখিয়েছেন, তাতে মনে হয় কেবল আত্মমুক্তিটাই লক্ষ্য। মুশকিল হচ্ছে, স্বামীজীর কথায় গুরুত্ব দেব, না কথামৃতের ওপর জোর দেব?

—সে-সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। স্বামীজীর কথাই স্বীকার করে নিয়েছে সবাই।

মহারাজ : তাহলে? সিদ্ধান্ত হলে কী হবে, এখনো আমাদের অনেকের মনে—

—দ্বিতীয়টা অর্থাৎ জগদ্ধিতটা অনেকের কাছে গৌণ। চিত্তশুদ্ধির উপায় বা সাধন—এগুলোই আমরা বুঝে থাকি। আবার, জগদ্ধিতটা যেন by-product। আমরা ভগবানলাভের চেষ্টা করলে, মুক্তিলাভের চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে জগদ্ধিতও হবে—এরকম একটা মত আছে।

মহারাজ : তা তো আছেই।

—সেটা স্বামীজীর অভিপ্রেত নয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, স্বামীজীর অভিপ্রেত। তিনি বলেছেন, একটা গুহার মধ্যে বসে যদি সৎ চিন্তা কর, সেই চিন্তা গুহার দেয়াল ভেদ করে জগতে ছড়াবে।

—কিন্তু আমাদের আদর্শ হিসাবে যখন motto ঠিক করলেন, তখন শুধু সেটাকে—

মহারাজ : গোড়া থেকেই আমরা যদি মনে করি, একটা করলেই হয়, তাহলে ভুল করব।

—আবার বিপরীতদিকে, উলটোটাও স্বামীজী বলেছেন, যেমন বিরজানন্দজীকে বলছেন : "তুই যদি নিজের মুক্তি চাস তো জাহান্নামে যাবি।"

মহারাজ : তার কারণ কী? তার কারণ হচ্ছে, মানুষের ঐদিকেই ঝোঁক বেশি। যদিও মুক্তি মানে চোখ বুজে বসে থাকা নয়।

—কিন্তু মহারাজ, যখন জগদ্ধিতের জন্য আমরা কাজ করছি, সেটাকে যদি আমাদের সাধন হিসাবে গ্রহণ না করি, তাহলে কীভাবে—কী দৃষ্টিতে কাজ করব?

মহারাজ : সাধন হিসাবে গ্রহণ না করলে তার উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—তাহলে উদ্দেশ্য তো আবার মুক্তিই এসে যাচ্ছে।

মহারাজ : সে তো বললাম। মুক্তি সম্বন্ধে যদি সচেতনতা না থাকে তাহলে মুক্তি আসবে না।

—একটা আধ্যাত্মিকভাব নিয়ে যখনি আমরা কাজ করছি তখনি তো মুক্তির প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে।

মহারাজ : মুক্তি আসবে। তবে, কেবল আমাদের মুক্তিই যথেষ্ট নয়, জগতের কল্যাণ—এসম্বন্ধেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। স্বামীজী এই কথাই বলেছেন।

—মহারাজ, এরকম যদি বলি—আমার মুক্তি ও অন্যদের মুক্তির চেষ্টা। তাহলে কি একটাই উদ্দেশ্য হয় না?

মহারাজ : তা নয়।

—জগতের হিতটা যদি অন্যের মুক্তির কারণ হয় তাহলে তো উদ্দেশ্য একটাই।

মহারাজ : মুক্তি আর ক্ষুধার্তকে অন্নদান এক? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জেনেও জগতের উপকার করার চেষ্টা করব, কারণ যার জন্য করছি তার প্রয়োজন রয়েছে। সেই চেষ্টায় জ্ঞান বা মুক্তি-ভাবনা ব্যাহত হয় না। ঠাকুর তো বলেছেন : "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" ঠাকুরের কথার ভেতর থেকে সব সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। স্বামীজী যা বলেছেন, তা ঠাকুরের কথার বিপরীত নয়।

জ্ঞান-কর্মের বিরোধ বিষয়ে আলোচনা

॥ ১২ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি বলেছিলেন—যদি তুমি সেবাবুদ্ধি করতে পার, তাহলে দেহবুদ্ধি কমে যায়।

মহারাজ : দেখ, বিচারের সঙ্গো ব্যাবহারিক জগতের—কর্মের বিরোধ তখনি হয় যখন মানুষ গভীর ধ্যানের ভিতর থাকে। যখন ধ্যানে পৌঁছায়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় বন্ধ করে ধ্যানে মনঃসংযোগ করতে হয়। সেসময় কর্মবিরোধ হয়। তখন কর্ম দিয়ে কিছু হয় না। ইন্দ্রিয়ের কর্ম আছে। কিন্তু মানুষ সাধারণত ধ্যানের সাথে যে কর্মের কিছুটা তফাৎ রয়েছে বলে, সে অনেক দূরে। ঠাকুর যখন সমাধিমগ্ন, তখন কি তিনি কাজ করতে পারতেন? কথাই বলতে পারতেন না। কাজেই সে-অবস্থায় কাজ হয় না—সাংসারিক কাজও হয় না, নিঃস্বার্থ কাজও হয় না। সে-অবস্থার সঙ্গো কর্মের বিরোধ আছে। কিন্তু তার আগে অবধি কোন বিরোধ নেই। যতদিন পর্যন্ত না সাধক সেই অবস্থায় আসতে পারছে, ততদিন বিরোধ নেই। কারণ, বিচারের সঙ্গো বিচার্য বিষয়ের বিরোধ যদি না থাকে, তাহলে জনসেবায় বিরোধ কোথায়? তারপরে বিরোধ কোন্‌খানে? বলা হয়—যে-কর্ম মানুষকে সঙ্কুচিত করে, তার সঙ্গো বিরোধ আছে, অর্থাৎ স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্মের সঙ্গো বিরোধ আছে, কিন্তু নিঃস্বার্থ কর্ম—তার সাথে কোন বিরোধ নেই। স্বামীজীও একথা বলছেন, শঙ্করও এসম্পর্কে স্পষ্ট। শঙ্কর পরিষ্কার করে বলেছেন—যে-কর্ম সকাম, সেই কর্মের সঙ্গো বিরোধ। তারপর সকাম কর্ম করতে করতে যদি তার মনে নিষ্কাম ভাব এসে যায়, তখন আর বিরোধ রইল না।

—অর্থাৎ, আগের যে-কর্ম সেটি এখন নিষ্কামভাবে করে যাচ্ছে।

মহারাজ : ধরা যাক, একজন যজ্ঞ আরম্ভ করল। যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছে। সকামভাবে আহুতি দিচ্ছে। করতে করতে তার ভেতরের সকাম ভাব চলে গেল। কিন্তু যেহেতু সে আরম্ভ করেছিল, বিহিত কর্মটি তাই শেষ করল। সে-কর্মটা কীরকম? নিষ্কাম কর্ম। যখনি তার কামনা চলে গেল, তখনি সেটা নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মের সঙ্গো জ্ঞানের বিরোধ নেই।

কারণ, নিষ্কাম কর্ম তোমাকে সঙ্কুচিত করছে না। দেহের সঙ্গে তোমাকে আবদ্ধ করছে না। এইজন্য নিষ্কাম কর্মের সাথে জ্ঞানের বিরোধ নেই। শঙ্করও, যেখানে বিরোধ আছে বলছেন, সেটি হল সকাম কর্মের আওতায়।

আর নিদিধ্যাসনের সঙ্গে স্বভাবতই কর্মের বিরোধ হয়। নিদিধ্যাসন হল মননের পরে—বিচারের পরে যে-সিদ্ধান্ত হল, তাতে ডুবে যাওয়া। সেসময়ে আর কর্ম হয় না। যেখানে বিক্ষেপ হচ্ছে সেখানে শ্রেয় বস্তু আমরা দেখছি না। সুতরাং বিরোধ সেখানে হবে না। ঐ যে—'বিক্ষেপ হোতা হ্যায়', তার মানে বিরোধ যেটা হচ্ছে সেটা একটা অছিলা মাত্র। ঐ বিরোধের ঢঙ করে আমরা—আমাদের যা উচিত ছিল, অর্থাৎ মানবিক হওয়া, সেটা থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। এই হল সিদ্ধান্ত। বিরোধ কোন্‌খানে? যেখানে আমি সমাধিস্থ হই। যেখানে আমি সব ব্যবহার করছি, সেখানে বিরোধ নেই।

—শঙ্করের মতে, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ হবে।

মহারাজ : জ্ঞান-নিষ্ঠা যদি লাভ হয়—তখন জ্ঞানেতে স্থিতি হয়।

—তারপরে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন।

মহারাজ : অন্তরঙ্গ সাধন হল ব্রহ্মাকারা বৃত্তি। বিচারমার্গীরা সেই সব বৃত্তি মানে।

—না, সেটাকে বলছে নিদিধ্যাসন।

মহারাজ : নিদিধ্যাসন মানে ধ্যান। ধ্যান মানে তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে ধ্যান।

—সেই অবস্থায় শ্রবণ-মননের অবকাশ নেই?

মহারাজ : শ্রবণ-মননের পরে নিদিধ্যাসন। শ্রবণ-মনন করে নিদিধ্যাসন।

—না, যদি মনে করুন—জ্ঞান-নিষ্ঠা আসা পর্যন্ত কর্ম করে গেল। নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে সাধারণভাবে যেমন মনে হয় জ্ঞানের যে অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—তা কি করতে হবে?

মহারাজ : নিষ্ঠা মানে 'নিতরাং স্থিতি'। নিষ্ঠা মানে দৃঢ়তা নয়। নিষ্ঠা মানে তাতে স্থিতি। জ্ঞানের স্থিতি যখন হয়, তখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজ্ঞা

প্রতিষ্ঠা যখন হচ্ছে, তখন ধ্যানের অবস্থা। তখন তার কর্মের সাথে বিরোধ আছে। আর তার আগে পর্যন্ত বিরোধ নেই। এই আমার বক্তব্য। কাজেই স্বামীজীর কাছে কর্ম আর ধ্যান—এ-দুটো বিরুদ্ধ বস্তু নয়। তবে কর্ম যদি ঠিকমত করতে থাকি তাহলে সে-কর্ম তার সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার বাধা নয়। কর্মের সাথে যদি সে বিচার রাখে—লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকে, তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকে না।

—শঙ্কর তো চিত্তশুদ্ধির কথা বলেছেন—

মহারাজ : শঙ্কর চিত্তশুদ্ধতাকেই এনেছেন। স্বামীজী বলছেন, ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয়ের কোন দরকার নেই আলাদাভাবে। চিত্ত শুদ্ধ হলে আর ব্রহ্মাকারা বৃত্তির দরকার কোথায়? চিত্তশুদ্ধ মানে—চিত্ত যা আমাদের জ্ঞানকে আবৃত করে রেখেছে, সেই আবরণটা শুদ্ধ হলে তো হয়ে গেল। আত্মা স্বপ্রকাশ—স্বতই প্রকাশিত।

—চিত্ত শুদ্ধ হলেই হল?—তার মানে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির দরকার নেই?

মহারাজ : আর বৃত্তি কী? বৃত্তি দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রকাশ করতে পারছি? ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশ।

—সেই চিত্ত কি রয়ে যাচ্ছে না? চিত্ত তো নাশ করতে হবে।

মহারাজ : চিত্ত রয়ে গেল মানে কী? শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা—এক। ঠাকুরের কথা। পরিষ্কার কথা। যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেল তখন আবরণটা চলে গেল। তখন নাশ করার কিছু রইল না। বাধা সৃষ্টির কিছু রইল না।

—আর জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর যে বারবার বলেছেন—সেটি সম্ভব নয়।

মহারাজ : সেখানে কর্ম মানে তো সকাম।

—আর নিষ্কামের ক্ষেত্রে বিরোধ নেই?

মহারাজ : কিচ্ছু বিরোধ নেই। নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানের সহকারী। বিরোধ কোন্‌খানে হয়? সকাম কর্মাবস্থায় নিদিধ্যাসনের সাথে বিরোধ বলা হচ্ছে। তুমি যদি ভাব, এই সময়টায় আমাকে অমুক করতে হবে, তমুক

করতে হবে—তাহলে তোমার জ্ঞানেতে নিষ্ঠা থাকবে না। ঐচ্ছিকভাবে চলতে হবে। আরেকটা কথা, জ্ঞানাবস্থায় সকাম কেন, নিষ্কাম কর্মেরও কোন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সেদিক থেকে শঙ্কর বলছেন, জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা তো কর্মে পরিণত বেদান্তের পথ ধরে চলার চেষ্টা করি। সাধন-ভজন অল্প-স্বল্প করি, আর কাজকর্ম করি। বাকি সময়টা ঐভাব অবলম্বন করে চলি। বাইরের তুলনায় আমরা ভাল হতে পারি সংঘ হিসাবে দেখলে। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিজীবনে ঠিক যেরকম ফললাভ করার কথা, যে-পর্যায়ে যেমন যেমন সাফল্য অর্থাৎ তৃপ্তি পাওয়ার কথা তেমন তো পাচ্ছি না।

মহারাজ : কী করতে হবে? আমরা আনুষ্ঠানিক করছি। আন্তরিকভাবে করতে হবে। আমরা হয়তো লোক-দেখানো করছি না, কিন্তু আন্তরিক করতে হবে। খাচ্ছি খাব—"হরিষে লাগি রহরে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই"—মূলত এই করছি। এইজন্য হচ্ছে না। দু-এক পা এগলে কিছু বোঝা যায় না। সূর্যের দিকে যদি আমরা হাঁটতে আরম্ভ করি, এক পা হাঁটলে তো কাছেই যাচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছি কি যে, কাছেই যাচ্ছি?

॥ ১৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, এই সংঘের মধ্যে থেকে যা আমরা করি সে তো গতানুগতিকই লাগে।

মহারাজ : সংঘ ছাড়া আমাদের উপায় নেই বলে সংঘে থাকি। সংঘ আমাদের অনুকূল হবে বলে থাকি। প্রতিকূল হবে বলে থাকি না।

—কিন্তু থাকাটা তো গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ : গতানুগতিক হচ্ছে ঠিকই, যে ধ্যান করছে সেও গতানুগতিক, যে জপ করছে সেও গতানুগতিক। গতানুগতিক ছাড়া পথ কী? যতক্ষণ পর্যন্ত মনে তীব্র বৈরাগ্য না আসে ততক্ষণই গতানুগতিক। তীব্র বৈরাগ্য

যখন আসে তখন আমরা এগিয়ে যাই। তা না হলে ঐ 'বনত বনত বনি যাই'।

—আমাদের মধ্যে এমনই একটা বিচার আছে সেটা বলছিলাম। এই সংঘ আরম্ভ করেন ঠাকুর, মা, স্বামীজী আর ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ। কাজেই এর একটা ধারা আছে এই যুগে। আমি, মনে করুন, খুব চেষ্টা করি বা না করি, এই ধারায় আমরা এসে পড়েছি। কাজেই আমাকে এটা টেনে নিয়ে যাবে। এই একটা মত বলছি। এই বিষয়ে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রে থাকতে আমরা বিচার করছিলাম। একটা হচ্ছে—যেহেতু এখানে একটা ধারা বা স্রোত আছে, কাজেই আমি চেষ্টা করি বা না করি সেটা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। আর একটা—ধর্মজীবন, যা ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাপেক্ষ। এই সংঘের মধ্যে সকলের সঙ্গে আছি বলেই উন্নতি হবে, তা নয়। আমি যদি এর মধ্যে থেকে চেষ্টা করি তাহলে ব্যক্তিগত উন্নতি হতে পারে। কাজেই সংঘের মধ্যে থাকলেও ব্যক্তিগত চেষ্টার ওপর ব্যক্তিগত উন্নতি নির্ভর করছে।

মহারাজ : বিচার করে দেখতে হবে। এই সংঘ আমাদের, তাকে কিছু সাহায্য করছি। যদিও আমরা খাচ্ছিদাচ্ছি, পড়ে আছি, আরাম করছি বা দুটো ফুল ফেলছি বা একটা কাজ করছি—তাতে তো শুধু হবে না।

—না, ওরা যে প্রশ্ন করছিল, সামগ্রিকভাবে সংঘটা যদি আরেকটু অনুকূল হতো, সাধন-ভজনের সহায়ক হতো—কিন্তু আমার তো মনে হয়, সংঘ সবসময় আমার মনোমত হবে না। তবে যতটুকু আনুকূল্য আছে তার মধ্যেই আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে।

মহারাজ : হ্যাঁ, যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করতে হবে।

—মহারাজ, আপনি একবার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে, মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন : "আমি চাইলে এক্ষুনি আমগাছটাকেও মুক্ত করে দিতে পারি।"

মহারাজ : এভাবটা ওঁর। ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন। ও নিয়ে বিচার চলবে না।

—আবার উনিই বলেছেন : "এই সংঘে ঠিক কুকুরের মতো পড়ে থাকতে হবে। কুকুরের মতো।"

মহারাজ : কুকুরের মতো সংঘে পড়ে থাকা মানে, এতে বিশ্বাস হারিও না। এই কথা বলেছেন। পড়ে থাক না চুপ করে।

—না, এই যে মহারাজ বলেছেন, এই ধারাটা যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাবে।

মহারাজ : এতে বিশ্বাস হারিও না। সংঘ মানে ঠাকুর। ঠাকুর আমাদের সংঘ। তাঁকে আমরা আপনার করে নেব, কিন্তু কাজকর্মের মধ্যে সাধারণত তাঁর থেকে দূরে থাকি। কার্যত খালি দুবেলা ভগবানের নাম করলাম, বসে বসে খেলাম, থাকলাম—স্বামীজী তা তো বলেননি। একবার স্বামীজী বলছেন : "তাঁকে ডাকরে নিরন্তর।" স্বামীজীকে ঠাকুর বলছেন : "ওকথা বলিস না।" বলছেন : "এই বল—ডাকরে দিনে দুবার।" তা সংঘ মানে কী—সবটাই সংঘ। তার ভিতরে ত্যাগ সবারই আছে। কারো তীব্র, কারো মাঝামাঝি। অনন্তপ্রকার ভেদ। কিন্তু সংঘ সকলকেই ভ্রাতৃভাবে একত্র করে রেখেছে। ভাল থাকবে, তীব্র থাকবে, মন্দ, মধ্যম, উত্তম—সব থাকবে। সংঘ সকলকেই সাহায্য করবে। সংঘ যূপকাষ্ঠ—আমাদের সব অহং সংঘের বেদিমূলে সমর্পণ করতে হবে। যখন তুমি ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে, সংঘের প্রয়োজন তোমার হবে না। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সংঘ তোমার অনুকূলে, অর্থাৎ তোমাকে সাহায্য করবে। এই সংঘ সবটা অনুকূল—তা তো নয়; বরং যতটা আনুকূল্য ব্যবহার করা যায় ততটাই ভাল। আমরা বলি যে, আমরা অনুকূল জায়গায় বসে ধ্যান করব। সেরকম জায়গায় হাজারো লোক বসে থাকে, কিন্তু তাদের ধ্যান হয় না। সে-ধ্যানের অনুকূলে সংঘের সাহায্য নিয়ে যে আন্তরিক চেষ্টা করছি, তাতেই উন্নতি হবে। এই সংঘে এসেছি বলে সব হয়ে যাবে, অথচ এসেও হচ্ছে না—একথা বলো না। আমাদের সময় একজন বৈরাগ্যবান সাধু ছিলেন। পরে তাঁর পতন হয়েছিল। কিন্তু তিনি কী বলছেন? তিনি সংঘের দোষ দিচ্ছেন না। বলছেন : "এত অনুকূলতা

পেয়েও হল না আমার। কী দুর্ভাগ্য!" বলতেন : "মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ-সংশ্রয়ঃ—মনুষ্যত্ব হল, মহাপুরুষসংশ্রয় হল; কিন্তু মুমুক্ষুত্ব হল না। ওটা কাজে লাগাতে পারলাম না। ওটার যোগ্য ব্যবহার করতে পারলাম না।" এই তিনটিকে দরকার। মুমুক্ষুত্ব শুধু হলে হবে না। মুমুক্ষুত্ব হওয়ার পথে মূলধন থাকা চাই। মুমুক্ষার পক্ষে মনুষ্যজীবন হল বড় মূলধন। আবার শুধু মহাপুরুষসংশ্রয় হলেই হবে না। মুমুক্ষুত্ব না এলে হবে না।

—মনুষ্যত্ব ছাড়া কি মুমুক্ষা হতে পারে?

মহারাজ : হয় কিনা আমরা জানি না। হতে পারে। দেবতাদেরও হয়। কিন্তু দেবতারা ভোগপ্রবণ বলে—বেশি ভোগের মধ্যে থাকে বলে তাঁদের মুমুক্ষুত্ব হয় ক্বচিৎ।

—এটা কঠোপনিষদে আছে না? ছায়ার মতো—'ছায়াতপয়োরিব...'

মহারাজ : হ্যাঁ আছে। সেখানে আছে—

"যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥"

(কঠোপনিষদ্, ২।৩।৫)

এই বলেছেন। কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন যে-লোকেই সে থাকুক, সে আর সেই লোকের ভেতরে সীমিত থাকে না। ফলটা সব এক। এ পরিষ্কার করে লেখা আছে, আলোচনা আছে। ফলটা সব এক। ব্রহ্মজ্ঞানে যেই স্থিত হোক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে তাঁর একই দর্শন হবে। একথা উপনিষদে বলেছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী চেয়েছেন আমাদের জীবনে চার যোগের সমন্বয় হবে। এখানে এই চার যোগের প্রত্যেক যোগের মাত্রা কত?

মহারাজ : মাত্রা কিছু নেই।

—মাত্রা কিছু নেই, কিন্তু একটা পরিমাণ তো আমরা হিসাব করি—কতটা ধ্যান করব, কতটা কর্ম করব।

মহারাজ : না, তা হয় না। তাহলে ধ্যানও হবে না, কর্মও হবে না।

—কী করে, মহারাজ?

মহারাজ : একি তুমি কবিরাজি ওষুধ পেয়েছ, মাত্রা হিসাব করবে? মাত্রা নেই।

—একটা তো সময়ের কথা ভাবা হয়, সারাটা দিনের মধ্যে কত ঘণ্টা ধ্যান করছি, কত ঘণ্টা পড়ছি।

মহারাজ : এরকম করে হয় না।

—রুটিন থাকবে না একটা?

মহারাজ : না, রুটিন কিসের জন্য? রুটিন হচ্ছে, যাতে করা বন্ধ না হয়। করার জন্য আর রুটিনের প্রয়োজন নেই। করে যাও।

—কোন্‌টা কতটা করব? কর্ম এবং উপাসনা?

মহারাজ : কথায় বলে, যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? যে ভক্তি করে, সে কি জ্ঞানবিচার করে না? যে জ্ঞানবিচার করে, সে কর্ম করে না?

—অর্থাৎ মহারাজ, একটা অনুশীলন করার সময় অন্যগুলো উপস্থিত আছে। যখন একটা আমরা করছি, সেটার মধ্যেই কি অন্যগুলোও আছে?

মহারাজ : আরে, কর্ম যেটা করছ, তার সঙ্গে জ্ঞানও করছ, ভক্তিও করছ, যোগও করছ। সবগুলো একসঙ্গেই করছ। চোখে দেখছ, কানে শুনছ, কথা বলছ—একসঙ্গে করছ না?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : সেইরকম।

—একটা যোগের মধ্যে বাকি অন্য তিনটে যোগও অন্তর্ভুক্ত?

মহারাজ : হ্যাঁ, অন্তর্ভুক্ত হবে।

—কিন্তু আমরা কর্ম করি—কর্মের শেষে আমরা আবার উপাসনা করার জন্য বসি বা রুটিনের মধ্যে সময় রাখি। এই যে আলাদা—

মহারাজ : এই তো হচ্ছে আমাদের অপূর্ণতা। অপূর্ণতা এইখানে। কর্ম করি যখন, যোগ করি না। যোগ করি যখন, ভক্তি করি না। ভক্তি করি যখন, জ্ঞান করি না। আমাদের অপূর্ণতা একেই বলে।

—মহারাজ, আমরা সাধারণ মানুষের কথা বলছি যে, সে তো অন্তত একটা plan করে বা হিসাব করে একেক বেলা এক ঘণ্টা কী দেড় ঘণ্টা জপ করবে।

মহারাজ : তা করবে। কিন্তু কেন করছে মনে রাখবে। প্রত্যেক প্রচেষ্টা মুক্তির বা উদ্দেশ্যের জন্য করতে হবে। তার ভিতর আবার এতটা এর জন্য, এতটা ওর জন্য—তা নয়। যখন জ্ঞান করবে, তখন ভক্তিও করবে। যখন ভক্তি করবে, তখন কর্মও করবে। যখন কর্ম করবে, তখন যোগও করবে। সমকালে, একতরফা নয়। মানে সমন্বয়—বুঝলে তো?

—হ্যাঁ। একইসঙ্গে সব, অন্যগুলোও উপস্থিত থাকবে।

মহারাজ : সমন্বয়, একসঙ্গে যোগ করে সব। যুগপৎ। সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত আছে প্রত্যেকের মধ্যে।

প্রশ্ন : মহারাজ, বিবেকচূড়ামণিতে শঙ্করাচার্য প্রমাদের কথা খুব বলেছেন —যাতে প্রমাদ না আসে সাধকের জীবনে। সেটা কী করে হয় আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনে?

মহারাজ : উদ্দেশ্য ভুলবে না। যা করবে উদ্দেশ্যকে মনে রেখে করবে। চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি বা ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি। তা, উদ্দেশ্য মনে রেখে সব করা—এই হল অপ্রমাদের মানে।

—এই অপ্রমাদের আলাদা অন্য কোন সাধনা আছে?

মহারাজ : অপ্রমাদের আবার সাধনা কী? এটাই তো সাধনা।

—প্রমাদকে রোধ করাই সাধনা, ঐ চেষ্টা করা।

মহারাজ : চেষ্টা করা নয়। উদ্দেশ্যকে সবসময় মনে জাগিয়ে রাখা।

প্রশ্ন : তোতাপুরীর নির্বিকল্প সমাধি হল। ব্রহ্মজ্ঞান হল। তারপরে আবার একটা লোককে মারতে যাচ্ছেন। রেগে গেছেন। এরকম কেন হয়?

মহারাজ : ঠাকুর বলছেন, সবই মহামায়ার 'অণ্ডারে'।

—কিন্তু উনি (তোতাপুরী) তো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন?

মহারাজ : তাহলে, কী হবে! দেহধারী যখন, তখন মহামায়ার অধীনে।

—অধীনটা কী?
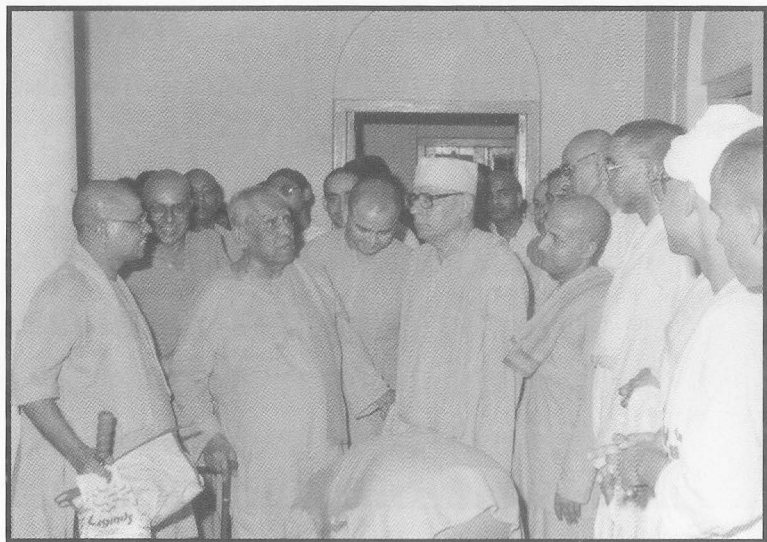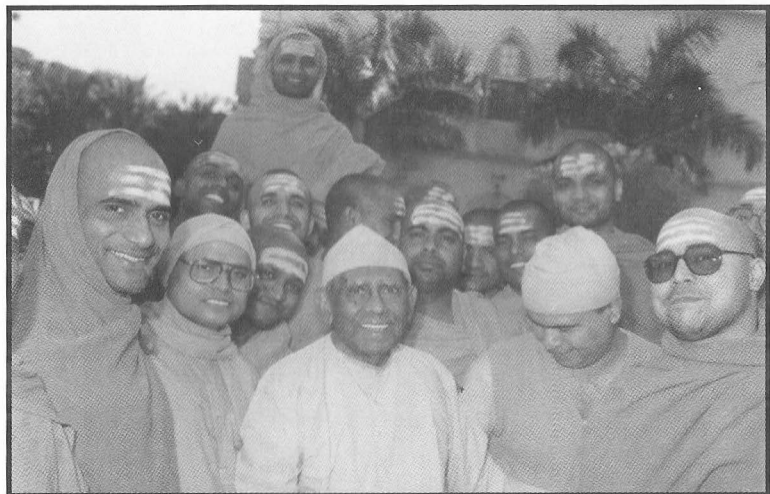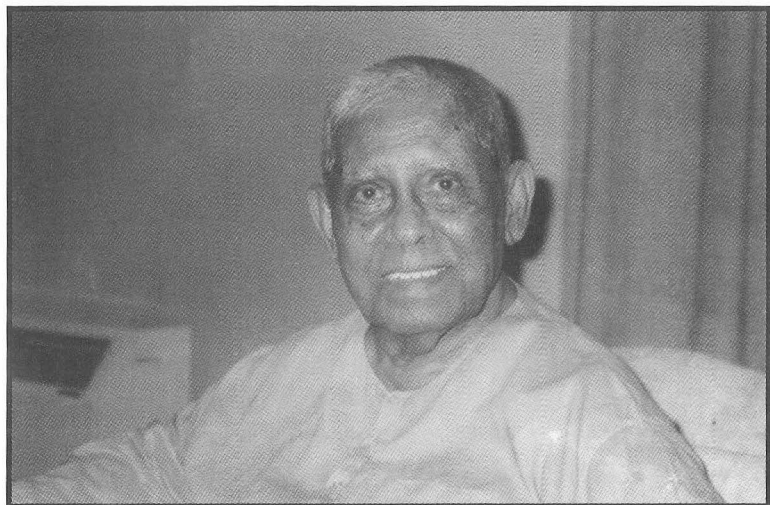
মহারাজ : অধীন মানে, মহামায়ার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

—ঠাকুর বলেছেন, জগতের দুঃখভোগ এর মধ্য দিয়ে হয়ে গেল। ঠাকুরের এই কথাটার তাৎপর্য কী মহারাজ? এদিকে শ্রীমাও জীবনে কত কষ্ট পেয়েছেন। স্বামীজী বা ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানরাও কত কষ্ট-যন্ত্রণা পেয়েছেন। এখনও জগতের লোকের যন্ত্রণা কম দেখছি না তো!

মহারাজ : ঠাকুর যা বললেন, তাঁর কথার তাৎপর্য ঠাকুরই জানেন। তবে একটা কথা আছে, খ্রিস্টানরা বলে—'vicarious atonement'—পরের দুঃখ যিশু গ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিলেন ক্রুশে। এখন এই যে প্রাণ দেওয়া, তার দ্বারা জগতের দুঃখের—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। জগতের পাপ কি নিঃশেষে দূর হল? জগৎটাকে গীতায় বলা হয়েছে : "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (গীতা, ৯।৩৩) এই জগৎটা অনিত্য এবং দুঃখময়। এখানে এসে আমার ভজনা কর। এরকম একটা জীবন দেখিয়ে গেলেন ঠাকুর। এইটাই দেখ—তিনি কতটা দুঃখ ভোগ করলেন। তাঁর নিজের তো অপাপবিদ্ধ শরীর। তাহলে এত কষ্ট হল কেন? তাই বলছেন : যারা আসে তাদের দুঃখকষ্ট নিতে হয়। এই শরীরের ওপর দিয়ে ভোগ হয়।

—অর্থাৎ জগতের দুঃখভোগ নাশ হয়ে যাবে, এটা এর তাৎপর্য নয়।

মহারাজ : ঠিক, তাহলে জগৎটা আর জগৎ থাকত না।

॥ ১৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরের একটা কথায় পাই—যার শেষজন্ম তাকে এখানেই আসতে হবে। এটা কি একটা গোঁড়ামিপূর্ণ কথা নয়?

মহারাজ : হ্যাঁ। 'এখান' বলতে যদি ঠাকুর—কেবল তাঁর কথাই মনে কর, তাহলে গোঁড়ামি হবে। কিন্তু যদি আদর্শের কথা মনে কর, তাহলে গোঁড়ামি নয়।

—এখানে 'শেষজন্ম' বলতে তো জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি। এইটাই তো অর্থ করেছেন।

মহারাজ : শেষজন্ম মানে আর জন্ম হবে না।

—মুক্তিটা তো শুধু এখনকার কথা নয়, আগেও অনেকের মুক্তি হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি।

মহারাজ : আগের কথা বলছেন না তো। এইখানে আসতে হবে, তার মানে বর্তমানের কথা বলছেন, ভবিষ্যতের কথা বলছেন।

—তা, আমাদের কাছে মনে হয়, তিনি কি একটা নতুন শর্ত আরোপ করলেন?

মহারাজ : নতুন শর্ত তো নয়। আদর্শটা কতকটা নতুন। কারণ, অবতারেরা যখন আসেন তখন পুরনোকে যেমন রক্ষা করেন তেমনি আবার নতুন আদর্শও একটা দিয়ে যান।

—আগেও তো মানুষ মুক্তি পেত। এখন আবার মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা অন্য জিনিস, নতুন জিনিস গ্রহণ করতে হবে কেন?

মহারাজ : আগে যে মুক্তির পথ দেখানো হয়েছে, সেটা খুব কঠিন পথ ছিল। নতুন অবতার এসে সেটা সোজা করে দিয়েছেন।

—আচ্ছা, এখানে মুক্তির পথ কঠিন হয়নি, বরং সহজ হয়েছে।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—এখানে আসতেই হবে, এই যে জোর করে কথাটা বলা, এটা কি একটা শর্ত হয়ে যাচ্ছে না?

মহারাজ : আসতেই হবে মানে, এই ভাবটা তাকে নিতে হবে।

—এই ভাব ছাড়া মুক্তি হবে না?

মহারাজ : কঠিন কথা।

—আপনি বললেন যে, তাঁর কাছে আসা ধরলে গোঁড়ামি হবে, আদর্শের কথা ধরলে গোঁড়ামি নয়। তাঁর কাছে আসা আর আদর্শের কাছে আসার তফাত কী?

মহারাজ : তিনি মানে কে?

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

মহারাজ : শ্রীরামকৃষ্ণদেব—তাঁর দেহত্যাগ হয়ে গেছে। তাহলে? কাজেই যে-ভাব তিনি দিয়ে গেলেন, সেই ভাবকে গ্রহণ করতে হবে।

—হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর কাছে আসা ধরলে গোঁড়ামি হবে বললেন।

মহারাজ : গোঁড়ামি আমরা বলছি বটে, কিন্তু গীতায় যেমন বলছেন : "স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।" (৪।৩) তেমন তিনি বললেন, সনাতন ধর্ম যা সর্বদা আছে তা থাকবে। একথাও তো বলেছেন ঠাকুর। গোঁড়ামি হলে তো আর একথা বলতে পারতেন না।

—তাহলে ভগবানই তো এযুগে তাঁর ভাব বা আদর্শ বললেন। নতুন হল কী করে?

মহারাজ : নতুন মানে, নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে তাতে।

—আদর্শ হিসাবে নতুনত্ব কিছু থাকবে না?

মহারাজ : হ্যাঁ, সেই আদর্শটির ভিতরে নতুনত্ব আছে।

—সেটি কী মহারাজ? ঠাকুরের জীবনে বা ঠাকুরের আদর্শে, নতুন ভাব কী—একটু বলুন।

মহারাজ : নতুনত্ব হচ্ছে, যাগযজ্ঞাদি এখন আর করতে হবে না। ভগবানের নাম করলেই হবে। এ নতুন আদর্শ। যাগযজ্ঞ করতে হবে না—একথা কেউ বলেছে? ঠাকুর বলেছেন।

—চৈতন্যদেবও তো নামের ওপর জোর দিয়েছেন।

মহারাজ : চৈতন্যদেব দিয়েছেন, তা ঠিক। কিন্তু চৈতন্যদেবের আদর্শের পরিণতি আমরা তো দেখতে পাচ্ছি। আদর্শ যখন ম্লান হয়ে যায়, তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে অবতারের আবির্ভাব হয়। এজন্যই অবতারের আদর্শ একদিকে সনাতন, অন্যদিকে তেমন নবীন।

—সেজন্য ঠাকুর যেখানে বলছেন, কলিতে কর্ম করা কঠিন, সেটা কি এই বৈদিক কর্ম, যাগযজ্ঞাদি?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—কিন্তু কর্মযোগের তো আবার প্রবর্তন হয়ে গেল।

মহারাজ : কর্ম যখন বলছেন, যে-পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন, সেটাই ধরতে হবে। তিনি কি খাওয়া-পরাও নিষিদ্ধ করে দিলেন? সেও তো কর্ম।

—বৈদিক ক্রিয়াকলাপের হাত থেকে সাধককে মুক্ত করলেন, এইটা সহজ করে দিয়ে গেলেন।

মহারাজ : আরে, যাগযজ্ঞাদি করে মুক্তি হয় না। ঘোড়ার ডিম—ও স্বর্গের লোভ যাদের আছে তারা করুক। সন্ন্যাসীরা যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করল। যাগযজ্ঞ যদি অত আবশ্যক হতো, তাহলে তাদের পরিত্যাগ করতে বলতেন না।

—যাগযজ্ঞাদি তো গৃহস্থরাও ত্যাগ করেছে। তারা কি বিরক্ত হয়ে ত্যাগ করেছে?

মহারাজ : বিরক্ত মানে মুখটা খিঁচিয়ে বিরক্ত নয়, বিরক্ত মানে অনুরাগশূন্য।

—যাহোক, আমরা দেখলাম, ঠাকুরের এই নবীন আদর্শ গ্রহণ করতে হবে, অন্তত যারা মুক্তি চায়। তা, একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, আগেকার পথগুলো অনুসরণ করলে কি মুক্তি হবে না?

মহারাজ : ঠাকুর কি সে-পথগুলো নিষেধ করেছেন?

—না, তা বলছি না। কিন্তু এইখানে আসতেই হবে—এইরকম জোর করে বলছেন কিনা—

মহারাজ : মানে, এইসব পথ সেই একই ভগবানের দিকে যাওয়ার পথ। এই হল ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য।

—এই উদারতা গ্রহণ করতে হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তার মানে তো 'এখানে' বলতে যেকোন পথকেই বোঝাবে।

মহারাজ : তা তো ঠাকুর বারবার বলেছেন। ঠাকুরের সমন্বয়ের ভাব। একটাকে দৃঢ়ভাবে ধর। কিন্তু অন্যগুলো সম্বন্ধে কটাক্ষ করো না। এও বলেছেন। শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। কারো সমালোচনা করো না। কারণ, তুমি তাঁদের মত-পথের কিছু জান না। নিজের মত-পথে দৃঢ় নিষ্ঠা রাখা এবং একইসঙ্গে অপর মত-পথে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়াই ঠাকুরের এরকম বলার অভিপ্রায়।

প্রশ্ন : মহারাজ, বলা হয়, তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসার আগে অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই, একদিন তিনি ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, ধর্মপ্রসঙ্গ হচ্ছে। তখন রাত্রিবেলা, ধুনি জ্বলছিল। একজন লোক সেখান থেকে একটু আগুন নিচ্ছিল তামাক খাবে বলে। তোতাপুরী তখন তাকে চিমটে দিয়ে মারতে গেছেন। সেই দেখে ঠাকুর হাসছেন। বলছেন : "এই তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়?" তো, এটা ঠাকুর কী বলতে চাইছেন, মহারাজ?

মহারাজ : বলছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি হয় তার ব্যবহারও তদনুরূপ হবে। সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি যে করে, সে কি ব্রহ্মকে মারতে ছুটবে? তবে একটা কথা এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরও ব্যবহার একরকম নয়। কারো ঐরকম ক্রোধী স্বভাব। সেটি যায়নি, আগে ছিল এখনো আছে। তার কারণ—ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যবহার যে-সংস্কারের জন্য হচ্ছে, তার পুনরাবৃত্তি চলছে।

—ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও এরকম ক্রোধবৃত্তি আসতে পারে?

মহারাজ : পারে, এবং তা নিন্দনীয়। আর ঋষিরা তো ভীষণ রাগী। কথায় কথায় শাপ দিয়ে দেয়। আবার যাকে শাপ দেয়, সে উলটে শাপ দেয়। এ যেন গোখরো সাপ সব। ছোবল মারবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

—তাহলে কি তোতাপুরীর জ্ঞানের অপূর্ণতা হল?

মহারাজ : অপূর্ণতা, জ্ঞানের অপূর্ণতা নয়। কিন্তু যা ব্যবহার করছে, তাতেও তার মিথ্যাত্ববোধ থেকে যাবে।

—ব্যবহারে মিথ্যাত্ববোধ থাকলে ঐরকম ব্যবহার করবেন কেন? মিথ্যাই যদি বোধ থাকত, ওরকম ক্রোধ করতেন?

মহারাজ : ওটা ক্রোধ নয়, ওটা ক্রোধাভাস।

—ক্রোধাভাস? চিমটে নিয়ে মারতে যাচ্ছেন! ওটা ক্রোধাভাস?

মহারাজ : তা মারবেন না?

—শরৎ মহারাজ উল্লেখ করেছেন যে, ঠাকুরের গুরুদেরও অপূর্ণতা ছিল, ঠাকুরের সংস্পর্শে তাঁদের পূর্ণতা লাভ হয়েছে। সেটি কিরকম?

মহারাজ : অপূর্ণতা মানে, তোতাপুরী শক্তিকে মানতেন না। আর সেই শক্তিকে মানলেন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে।

—সে তো এক অলৌকিক ঘটনা হল।

মহারাজ : অলৌকিক নয়। অলৌকিক ঘটনা মানে তো মিথ্যা নয়।

—গঙ্গায় জল নেই বলে তোতাপুরী ডুবে মরতে পারলেন না। এতে তাঁর অবিদ্যাকে মানা বা মায়াকে মানা—এই জ্ঞানটা হল, এটা ঠিক বোঝা যায় না, মহারাজ।

মহারাজ : ডুবে মরতে পারলেন না, সেটা শিক্ষণীয় নয়। শিক্ষণীয় হচ্ছে যে, মায়ার প্রভাব। এটা শিক্ষণীয়।

—অলৌকিক ঘটনা বা লৌকিক ঘটনা সবই তো মায়ার প্রভাব।

মহারাজ : লৌকিক আর অলৌকিক আমরা যে ভাগ করি, তা আমাদের বুদ্ধির দৌড় অনুসারে। যেটা আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না, সেটাকে বলি অলৌকিক। তা তো কথা নয়। কথা হচ্ছে, তোতাপুরীর কী লাভ হল? লাভ হল এই যে, মায়ার অস্তিত্ব তিনি বুঝতে পারলেন, মায়ার প্রভাব বুঝতে পারলেন।

—তাঁর দর্শন হয়েছিল, বলা হয়েছে।

মহারাজ : দর্শন মানে দুটো চোখ দিয়ে দেখা?

—না, বলছেন যে, সর্বত্র তিনি সেই জগন্মাতাকে দর্শন করেছিলেন। সেই রাত্রির যে-প্রসঙ্গটা বলছেন, সেই সময় ঐরকম তাঁর দর্শনও হয়েছিল বলা আছে।

মহারাজ : তা হয়েছিল। এই 'দর্শন' কথাটা বড্ড গোলমেলে। ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয় না। ইষ্টদর্শন হয়—মানে কি চোখ দিয়ে দেখা? চোখ দিয়ে যদি দেখা হতো তাহলে সকলেই দেখত। চোখ দিয়ে তো নয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে তখন দর্শন হয়, সে-বুদ্ধি আমাদের সকলের নেই, সেই বুদ্ধির যখন উন্মেষ হয়, তখন দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে যায়।

—মহারাজ, শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত যে অদ্বৈতবাদ, তাতে মায়ার তত্ত্ব তো তিনি আগেই প্রতিষ্ঠা করেছেন, মায়ার কথা বলেছেন। তা সেই সম্প্রদায়ের হয়ে তোতাপুরী কি সেটা জানতেন না?

মহারাজ : আরে, মায়াকে মিথ্যা বলেছেন, প্রতিষ্ঠা কোথায়? মূল কেটে দেওয়া।

—মায়াকে মিথ্যা বলেই যে জানা, সেটা তো শঙ্করাচার্য বারবারই বলেছেন। সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হয়ে সেটা কি তোতাপুরী জানতেন না?

মহারাজ : জানা ছিল, মায়ার যে এরকম প্রভাব, তা জানতেন না।

—মায়াটা মিথ্যা, সেটা তিনি জানতেন!

মহারাজ : এটুকু জানতেন।

—মায়ার প্রভাব উনি স্বীকার করতেন না। আর মহারাজ, এই যে শক্তি মানতেন না, এর মানে কি ঈশ্বরের সগুণ, সাকার রূপ হতে পারে, সেটা তিনি স্বীকার করতেন না?

মহারাজ : সাকার বলো না, বল সগুণ। কথা হচ্ছে, গুণ না মানলে তার ব্যবহার কী করে হচ্ছে? ব্যবহার যখন হচ্ছে, তখন গুণের আরোপ ছাড়া ব্যবহার হয় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় কী, এটা মিথ্যা—এই বোধ থাকে। মিথ্যাত্ব জ্ঞান হয়ে যায়। ব্যবহার হলেও ব্যবহারটা যে মিথ্যা, সেটা বোধ থাকে। আর ব্যবহারের প্রভাবটা কিরকম, যেমন—রামচন্দ্র অবতার, সীতাকে হারিয়ে কেঁদে অস্থির হলেন। ঠাকুর অবতার, তিনি অক্ষয়ের মৃত্যুতে প্রাণের ভেতরে গামছা নিংড়াচ্ছে—এরকম বোধ করলেন। ব্যবহার মায়ার প্রভাব অনুসারে হয়। আমরা যখন বিচার করি, কেবল একটা দৃষ্টি দিয়ে দেখে তত্ত্বের বিচার করি। আরো যে বহু রকম আছে, সেটা আমরা খেয়াল করি না। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"—বলছেন। তিনি আলোচনা করলেন—'বহু হব'। বহু তিনি হবেন মানে—তিনি বহু হতে পারেন। শুধু তাই নয়, তিনি অজ্ঞান হতে পারেন, ক্রোধী হতে পারেন—সব হতে পারেন। প্রশ্ন ওঠে, যদি হতেই পারেন, তাহলে সাধারণ মানুষ থেকে তাঁর পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এইখানে যে, এসব যে মিথ্যা, তাঁর এই বোধ যায় না। এ-বোধটা জাগ্রতই থাকে। দেহ ধরে এলে তার দণ্ড সকলকেই ভোগ করতে হয়। জ্ঞানী—সে জ্ঞানপূর্বক ভোগ করে। আর মূর্খ কাঁদতে কাঁদতে ভোগ করে। জ্ঞানী

জেনেশুনে প্রারব্ধ ভোগ করে আর অজ্ঞানী কষ্টপূর্বক ভোগ করে। একটা দোঁহা আছে—

"দেহঘরকা দণ্ড সবকৌইকো হোয়।
জ্ঞানী ভোগে জ্ঞানসে মূরখ ভোগতে রোয়॥"

প্রশ্ন : মহারাজ, লীলাপ্রসঙ্গে আছে, স্বামীজী হরমোহনকে 'হাতি-নারায়ণ, মাহুত-নারায়ণ' গল্পটি সাত দিন ধরে বুঝিয়েছিলেন। স্বামীজীর বক্তব্য কী ছিল?

মহারাজ : স্বামীজী সাতদিন ধরে ঐ গল্পটার মর্ম বুঝিয়েছেন। আমার কি তা বোঝানোর সাধ্য আছে?

—সাতদিন না হলেও একদিন তো হতে পারে।

মহারাজ : মাহুত-নারায়ণ একটি লোককে বলছিল, 'সরে যাও, সরে যাও।' লোকটি সরে গেল না, কারণ সে ভাবল—হাতিও তো নারায়ণ। হাতি নারায়ণ হতে পারে, মাহুতও তো নারায়ণ। তার কথা শুনবে না কেন? অর্থাৎ সর্বত্র নারায়ণ দর্শন করলে সকলের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার হবে—এমন কথা নয়। ঠাকুর আরেকটা উপমা দিয়েছেন। কোন জলে হাত-পা ধোয়া যায়, কোন জলে নাওয়া যায়। কোন জল আবার খাওয়া যায়। এতরকম জলের ভেদ আছে। সেরকম সব নারায়ণ হলেও সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করা চলে না।

—মানে, এক এক নারায়ণের সঙ্গে এক এক রকম ব্যবহার করতে হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—মহারাজ, তাহলে ভেদবুদ্ধি আর নারায়ণবুদ্ধি দুটো একসাথেই থাকবে?

মহারাজ : তা কেন হবে না? তুমি যদি লাল জামা পর বা সবুজ জামা পর বা হলদে জামা পর—তুমি কি বদলে যাবে? তুমি তো তুমিই রইলে। ব্যবহারে ভেদ রইল, কিন্তু স্বরূপত এক রইলে। ভাগবতে একটি শ্লোক আছে—

"ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ৰহ্মণি নো বিরুধ্যতে
ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ॥" (১০।৩।১৯)

বলছেন—হে বিভু, বহু রূপধারী তোমার থেকে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হচ্ছে, কিন্তু তুমি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। তাহলে এইগুলো হচ্ছে কেন তোমার দ্বারা? উত্তরে বলছে—তোমার দ্বারা হচ্ছে না, গুণের দ্বারা হচ্ছে। কিন্তু গুণ তোমাকে আশ্রয় করে রয়েছে বলে গুণের ক্রিয়া তোমাতে আরোপিত হচ্ছে। ব্রহ্ম আর ঈশ্বর এইজন্য ভিন্ন হচ্ছেন না। ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য—এটা ব্রহ্মের ওপরেই আরোপিত।

॥ ১৫ ॥

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন : "সকল ধর্মই সত্য। যত মত তত পথ।" কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলো fundamental rules আছে।

মহারাজ : Fundamental! যারা fundamentalist, তারা বলে fundamental।

—মহারাজ, বলতে চাইছি, বৌদ্ধধর্ম আর হিন্দুধর্মের মধ্যে জন্মান্তরবাদ আছে। কিন্তু ইসলাম আর খ্রিস্টানদের মতে জন্মান্তর নেই।

মহারাজ : আচ্ছা, বৌদ্ধধর্ম আর হিন্দুধর্ম ধর। বৌদ্ধধর্ম বলে—নির্বাণ। হিন্দুধর্ম বলে—মুক্তি বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি। এর তফাতটা কোথায় হল? সকলেই বললে—বাসনাশূন্য হতে হবে। মিল আছে না?

—না মহারাজ। ঐ যে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে জন্মান্তরবাদ নেই।

মহারাজ : জন্মান্তরবাদ নেই, কিন্তু বাসনাশূন্য হতে সেখানেও বলেছে। খোঁজ যদি তো ভেদ পাবে। আবার খোঁজ যদি, তার ভিতরে মিলও পাবে।

—সেমিটিক ধর্ম জন্মান্তর মানে না।

মহারাজ : সকলেরই ধর্ম মানতে হলে মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব মানতে হয়। মৃত্যুর পরে যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে তার কোন ধর্ম নেই। মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব সব ধর্মেই মানে। বৌদ্ধধর্মেও মানে। হিন্দুধর্মেও মানে, ইসলামেও মানে। ইসলাম তো নতুন কিছু নয়। সেমিটিক ধর্ম। ইহুদিদের যে-ধর্ম, খ্রিস্টানদেরও সেই ধর্ম, মুসলমানদেরও সেই ধর্ম। সব সেমিটিক।

—কেউ বলে জন্মান্তর আছে, কেউ বলে জন্মান্তর নেই। এর সামঞ্জস্যটা কোথায়?

মহারাজ : আচ্ছা, জন্মান্তর না থাকলে কাদের মতে জন্মান্তর নেই?

—মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের মতে।

মহারাজ : বৌদ্ধদের মতে আছে। সেমিটিক ধর্মে জন্মান্তর নেই, কিন্তু অস্তিত্ব আছে। দেহের পরে জীবের অস্তিত্ব আছে। তা না হলে কে স্বর্গে যাবে, কে নরকে যাবে? জীবের যদি অস্তিত্ব থাকে তাহলে জীব দেহ নয়। দেহ তো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তা দেহাতিরিক্ত কিছু—সেই হল জীব। সকলেরই এক মত সেখানে। হল কিনা? মিলিয়ে দেখ।

প্রশ্ন : মহারাজ, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান আর ভগবান লাভ কি একই?

মহারাজ : আত্মজ্ঞান মানে নিজের স্বরূপের জ্ঞান; ব্রহ্মজ্ঞান মানে (ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ) জগতের আদি কারণ সর্বব্যাপী ব্রহ্মের জ্ঞান—"যেন জাতানি জীবন্তি... তৎ ৰহ্ম"। আর ভগবানলাভ মানে, ভগ—অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যবান হয়ে যিনি জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তার জ্ঞান। এই হল তিনটি কথার অর্থ।

প্রশ্ন : মহারাজ, কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, ভক্তি পাকলে ভাব, ভাব পাকলে মহাভাব বা প্রেম হয়, মহাভাব হলে বস্তুলাভ হয়। তবে জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। অর্থাৎ জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না, আবার মহাভাব না হলে বস্তুলাভ হয় না। তাহলে জীবের অবস্থাটা কী?

মহারাজ : মহাভাব জীবের হয় না মানে—নিম্নাধিকারীর হয় না। অবতারদের হয়। তাঁদের মহাভাব হলেও জগতে থাকতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের, ঠাকুরের

মহাভাব হয়েছিল। তাতেও তাঁরা জগতে ছিলেন। কিন্তু সাধারণ জীবের মহাভাব হলে আর ফেরে না। অবশ্য হয়ই না, তার আর ফেরা! ঐ ভাব পর্যন্ত হয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, আজ গুড ফ্রাইডে। গুড কেন বলে মহারাজ?

মহারাজ : গুড বলে এইজন্য যে, যিশুখ্রিস্ট লোক-কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন দিয়েছিলেন। নিজে ধরা দিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হলেন। ঘটনাটা এরকম—তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না, সৈনিকেরা পাহারা দিচ্ছে। মৃত্যু না হওয়ায় তাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তখন একজন এসে একটা কুড়ুল দিয়ে তাঁর পাঁজরায় আঘাত করল—তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে বলে।

—Mourning day (শোকদিবস)-ও বলে।

মহারাজ : Mourning কেন হবে? তিনি জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। কল্যাণের জন্য বলে এই ফ্রাইডে-কে 'গুড ফ্রাইডে' বলা হয়।

—সেসময় জেন্টাইলরা (Gentile) বর্বর ছিল।

মহারাজ : ঐসময় তারাই নাকি ছিল সভ্য! তারা ইহুদিদের মানুষ বলে গণ্য করত না। তারা ছিল রাজার জাত, ইহুদিরা ছিল পরাধীন জাতি। যেমন ইংরেজরা ভারতীয়দের মানুষ বলে গণ্য করত না।

প্রশ্ন : গীতার দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগ-যোগ অধ্যায়ে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

"তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥" (১৬।৩)

—এই 'নাতিমানিতা' কী?

মহারাজ : অতিমানিতা হল দম্ভ, আত্মম্ভরিতা। তার অভাব হল নাতিমানিতা।

—অতিমানিতা-র অতি থাকবে না, মানিতা থাকবে অর্থাৎ বেশি অহঙ্কার থাকবে না, অল্প থাকবে; তাই কি মহারাজ?

মহারাজ : দম্ভ থাকবে না। তর্কের সময় ভাবি—আমি যা বলছি সেটাই ঠিক, অন্যরা যা বলছে সবই ভুল।

—তাহলে কিরকম হবে মহারাজ?

মহারাজ : বিনয় থাকবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী যখন সংসারের অভাব অনটনে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন একদিন ঠাকুরকে এসে ধরলেন এবং বললেন যে, তাঁর মাকে বলতে একটা কোন ব্যবস্থা করে দিতে। তাতে ঠাকুর বললেন : "তুই মাকে তো মানিস না তাই তোর এত কষ্ট।" একথার মানে কী?

মহারাজ : মাকে মানলে মা কষ্ট দূর করে দিতেন।

—তা স্বামীজী কি ঈশ্বর মানতেন না? তিনি তো বলেছেন, কত ভগবানকে ডাকলুম।

মহারাজ : ভগবান আর মা কি এক? ভগবানকে 'মা' বলে মানলে, বিশ্বাস করলে, সাধকের কাছে ভগবানের মাতৃভাবের বিশেষ প্রকাশ হয়, তাঁর সন্তান-বাৎসল্য বৃদ্ধি পায়। মা ছেলের কষ্ট দেখতে পারেন না, কষ্ট দূর করে দেন। তেমনি স্বামীজী মাকে মানলে তাঁর কষ্ট মা দূর করে দিতেন।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, মানুষ হল মান-হুঁশ। এই কথার মানে কী?

মহারাজ : কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা। অর্থাৎ, মানুষ হয়ে জন্মে ভগবানলাভের চেষ্টা করাই কর্তব্য—এই সচেতনতা।

প্রশ্ন : শ্রীশ্রীমা এক জায়গায় বলেছেন—মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয়, ভক্তিই সব। এই কথার মানে কী?

মহারাজ : প্রসঙ্গ দেখে বুঝতে হবে। অন্য এক জায়গায় (তন্ত্র সম্বন্ধে) মা বলেছেন, ওসব মানতে হয়।

—তাহলে ঐ কথার মানে কী?

মহারাজ : এখানে মন্ত্র মানে দীক্ষামন্ত্র নয়। আচার সংক্রান্ত মন্ত্র, অর্থাৎ যাগযজ্ঞের মন্ত্র। ঐ মন্ত্র দিয়ে আসল কিছু লাভ হবে না অর্থাৎ ভগবানে ভালবাসা আসবে না। ভগবানে ভালবাসা মানে ভক্তিই হল আসল—এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন : ঠাকুর মায়ের সম্বন্ধে বলেছেন : "ও সারদা, সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" কিন্তু মায়ের কথায় তো জ্ঞানের কথা পাই না; জপ, ভক্তি ইত্যাদির কথা পাই।

মহারাজ : জ্ঞান মানে কী বোঝ? উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য? মা তো ঐসব কিছুই জানতেন না। পড়তে পারতেন একটু-আধটু। জ্ঞান মানে হল—যার দ্বারা দিব্যতার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানতে পারা যায়। জ্ঞান হল সেই উপায়, যার দ্বারা আত্মোপলব্ধি হয়। মায়ের কথায় তো তা ভর্তি।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছেন : "নির্বিকল্প অবস্থার চেয়েও উচ্চ অবস্থা রয়েছে।" কী সেই অবস্থা?

মহারাজ : নিজে সমাধিলাভ করার পর সকলকে সেই সমাধিলাভে সাহায্য করা। অর্থাৎ, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করে তার সেবা করা।

প্রশ্ন : মহারাজ, তীর্থক্ষেত্রসমূহে একটা আধ্যাত্মিক প্রবাহ রয়েছে বলা হয়। এই আধ্যাত্মিক প্রবাহটা কী?

মহারাজ : আগে আধারটাকে উপযুক্ত কর, তাহলে জানতে পারবে। নিজে আধ্যাত্মিক না হলে আধ্যাত্মিক প্রবাহ বোঝা যায় না। স্থানমাহাত্ম্য আছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হল। আমরা যে 'এতৎ কর্ম শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলে কর্ম-সমর্পণ করি, তা কেন করি জান? করি এইজন্য যে, তা শতগুণ, সহস্রগুণে ফিরে পাব বলে। এটা ঠিক ধান-রোপণের মতো। একটা ধান রোপণ করলে হাজারটা ধান পাওয়া যায়। সেরকম ভগবানে কর্ম সমর্পণ করলে তা সহস্রগুণে ফিরে পাব। তা নাহলে আমি খেটেখুটে অর্জন করলাম, তা দিয়ে দেব?

—কোন্ কর্মটা ফিরে আসবে—খারাপটা, না ভালটা?

মহারাজ : তুমি যা দেবে তাই ফেরত পাবে। খারাপ দিলে খারাপ, ভাল দিলে ভাল।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী বলেছেন : "Education is the manifestation of the perfection already in man." আর "Religion is the manifestation of the divinity already in man." এই perfection এবং divinity-র অর্থ কী?

মহারাজ : Perfection বলতে ব্যাবহারিক জগতে চৌকস মানুষ বোঝায়, আর divinity আধ্যাত্মিক জগতে।

—দুটোতেই তো সমান মনোযোগ দরকার, তাই নয় কি?

মহারাজ : হ্যাঁ দরকার।

—তাহলে জাগতিক বিষয়ে নিবিষ্ট মনের লোক আধ্যাত্মিক জগতেও উন্নত হতে পারে। অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ে একাগ্র মন আধ্যাত্মিক বিষয়েও একাগ্র হতে পারে।

মহারাজ : না। জাগতিক বিষয়ে একাগ্র মনের মানুষ আধ্যাত্মিক নাও হতে পারে। যেমন, একজন বড় ডাক্তার আধ্যাত্মিক নাও হতে পারে।

—কেন হয় না মহারাজ?

মহারাজ : হয় না তার কারণ—জাগতিক বিষয়ে একাগ্রতার জন্য purity-র দরকার নেই, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে পবিত্রতার একান্ত দরকার।

—তাহলে ডাক্তারের মতো লোকের কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে একাগ্র হওয়া সম্ভব নয়?

মহারাজ : হ্যাঁ সম্ভব।

—কিভাবে?

মহারাজ : অভ্যাসের দ্বারা আর পবিত্রতার দ্বারা। জাগতিক বিষয়েও মন এমন একাগ্র হয়ে যায় যে, জগতের হুঁশ থাকে না। বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস সম্বন্ধে শুনেছি—তিনি এক জায়গায় বসে বিজ্ঞানের একটি বিষয়ে চিন্তা করছেন। এক ছাত্র তাঁর কাছে গেছে। কিন্তু তাঁর হুঁশ নেই—এমন তন্ময় হয়ে গেছেন। পরে হুঁশ হতে তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কখন এসেছে। তবে, বিজ্ঞানের বিষয়ে একাগ্র হলেও তিনি যে আধ্যাত্মিক হবেন—এমন কোন কথা নেই।

॥ ১৬ ॥

বেশ কিছু প্রশ্নাদি আলোচনার পর পূজনীয় মহারাজ চুপ করে আছেন। নিজে নিজেই বিদ্যাপতির দুটি ছত্র আবৃত্তি করলেন, যেখানে বিদ্যাপতি বলছেন, ভগবানকে ছাড়া তোর দিন কিরকমভাবে কাটবে? মহারাজ অত্যন্ত গম্ভীর, কিন্তু কাতর স্বরে বলতে শুরু করলেন : নিরঞ্জনের ভগবানলাভের জন্য ঠাকুর কী বিচলিত! বলছেন—হ্যাঁরে নিরঞ্জন, দিন যে যায়। তুই ভগবানলাভ করবি কবে? নিরঞ্জনের ভগবানলাভ হল না বলে তিনি কী চিন্তিত! আমাদের কি এরকম হচ্ছে? আমাদের জীবন শেষ হয়ে এল। তোমাদের জীবনও শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভগবান-লাভের জন্য কি এরকম ব্যাকুলতা হচ্ছে? ভগবান ছাড়া জীবনটা তো বেশ চলছে!

প্রশ্ন : মহারাজ, কেন হয় না?

মহারাজ : কেন হয় না, বলা যায় না। হচ্ছে না, বোঝা যায়। সব কিছু জেনে বুঝেও আমরা তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে পারি না। এটাই মায়া। আসল কথা, ভগবান ছাড়া কি আমাদের জীবনটা অসহ্য মনে হচ্ছে? তিনি ছাড়া জীবনটা কি চলছে না বলে বোধ হচ্ছে? হচ্ছে না। কারণ, তাঁকে না হলেও তো আমার জীবন চলে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, আনন্দ করা—এসব নিয়ে তো বেশ আছি। মহারাজ (রাজা মহারাজ) বলতেন, যা করার তিরিশের মধ্যে করে নে। পরে আর পারবি না। সত্যিই তো, যৌবনের তেজ, বল সব চলে যায়। পরে আর হয় না।

—কেন ব্যাকুলতা হয় না, বলুন আরেকটু।

মহারাজ : যেদিন ঘর ছেড়েছিলে, মনে করে দেখ তো, সেই বৈরাগ্য, সেই তেজ, সেই দৃঢ়তা কি এখন আছে? দিন দিন কমে যাচ্ছে। মনে পড়ে, যেদিন বাড়ি থেকে পালাচ্ছি, কী ব্যস্ততা, কী ব্যাকুলতা! কোমরে কাপড় আঁটবারও তর সইছে না। মনে হচ্ছে, সকলে জেগে যাচ্ছে। টের পেয়ে যাবে। কাপড় বাঁধতে গিয়ে তাড়াহুড়োতে বাঁধতে পারছি না। এরকম মনের অবস্থা। ভেবে দেখ সেই বৈরাগ্য কমে গেছে কিনা।

—হ্যাঁ মহারাজ, কমে গেছে। তাহলে কি আমাদের বৈরাগ্যটা মর্কট বৈরাগ্য ছিল?

মহারাজ : তা কেন? যখন ঘর ছেড়েছিলে, সকলে ভগবানের জন্যই তো ছেড়েছিলে। ঘর ছেড়ে যখন বেরলে, সেটা কি কপটতা ছিল? মোটেই নয়।

—তাহলে মহারাজ সে-বৈরাগ্য ধরে রাখতে পারলাম না কেন? কিভাবে সে-বৈরাগ্যকে ধরে রাখা যায়?

মহারাজ : সাধন-ভজনের দ্বারা বৈরাগ্যকে ধরে রাখতে হয়।

—সেটা কি ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া হয় না?

মহারাজ : ঈশ্বরের কৃপা ঈশ্বরের ব্যাপার, তিনি কৃপা করবেন কী করবেন না, সেটা তাঁর ব্যাপার। (দৃঢ়কণ্ঠে) আমরা কী করছি? আমরা তো সব করতে পারি। নিজের জন্য সব করার সময় আমরা পাই, শুধু তাঁকে পাওয়ার চেষ্টার সময় বলি—তাঁর কৃপা না হলে হবে না!

প্রশ্ন : স্বামীজী বলছেন—"Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this Divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, or worship, or psychic control, or philosophy—by one, or more, or all of these—and be free." আবার মঠের নিয়মাবলিতে বলেছেন, যার জীবনে চারটি যোগের সমন্বয় ঘটেনি, তার জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-মুষায় দ্রুত হয়নি। তাহলে প্রথমটি কি আমাদের জন্য নয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, সবই সকলের জন্য। যে যতটা পারবে। স্বামীজীর উদারতার পরিচয় এই যে, যে-ব্যক্তি একটি বা দুটি যোগকেও অবলম্বন করবে তাকেও তিনি উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু আদর্শ হিসাবে চারটি যোগের সুষম সমন্বয়ের কথা বলেছেন। আসল কথা ভগবানলাভ করা। তা সেটা একটা করে হোক, দুটো করে হোক বা সব কটা করে হোক—সেটা বড় কথা নয়। আমাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে হবে। তা যতগুলো উপায় আছে, তার সব কটা ব্যবহার করলে কি ভাল নয়? যখন সোনা গলায় দেখনি?

এক হাতে পাখার বাতাস করে, মুখে পাইপ দিয়ে ফুঁ দেয়, হাপরে বাতাস দেয়, হাতুড়ির আঘাত করে। আসল কথা, সে সোনা গলানোর জন্য ব্যাকুল। যতগুলো উপায় বা উপকরণ তার কাছে রয়েছে, সে সবগুলোই ব্যবহার করছে। আমাদের ভগবানলাভের জন্য যখন এরকম ব্যাকুলতা হবে তখন আর বাছাবাছি থাকবে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্য যতগুলো উপায় আছে সবগুলোই ব্যবহার করব। সবগুলোই করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সবগুলোই করি। ধর, যখন জপধ্যান করো তখন কী করো? বিচার করে প্রতিকূল চিন্তাগুলোকে দূর করার চেষ্টা করো; মনকে সংযত করে ইষ্টের পাদপদ্মে রাখার চেষ্টা করো। মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করো এবং মূর্তি ধ্যান করো। আর পুরো ব্যাপারটার জন্য খাটতেও হচ্ছে। তবে? একই সঙ্গে চারটিই করছি।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনার কাছেই শুনেছিলাম, মঠে থাকার গোড়ার দিকে একবার আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেটি কখন?

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজের সময় একবার আমি খুব অসুস্থ হই। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সকলেই জানত, আমি আর থাকছি না। গঙ্গেশানন্দজী তো মহাপুরুষ মহারাজকে গিয়ে বললেন—"মহারাজ, ও তো চলল।" মহাপুরুষ মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর মুখ। হাত জোড় করে ঠাকুরের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করে বললেন—"দেখ ঠাকুরের কি ইচ্ছে।" যাওয়া কিন্তু হল না। দেখ না এখনো আছি। (সকলের হাসি) অনেক কিছু দেখার বাকি ছিল কিনা। সেটা ১৯২৮ সাল। আর এটা ১৯৮৯। একষট্টি বছর কেটে গেছে। মনে হয়, এই তো সেদিন। তা আমায় কিন্তু হোমিওপ্যাথি বাঁচিয়েছিল। শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। বিছানার সাথে যেন মিশে গিয়েছিলাম। অনঙ্গ মহারাজ (স্বামী ওঙ্কারানন্দ) আমাকে পাঁজাকোলা করে এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় শুইয়ে দিতেন। তিনি খুব সেবা করেছেন। প্রিয় মহারাজ আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—"কিরে তোর কাকে দেখতে ইচ্ছে করে?" ওঁরা

তো ভেবেছিলেন, আমি চললাম। বললেন—"বাড়িতে খবর দেব?" আমি বললাম—না। যখন ভাল ছিলাম তখনই খবর দিইনি, আর এখন তো মরতে চলেছি। এখন খবর দেওয়ার দরকার নেই। আমি সেরে ওঠার পর অনঙ্গ মহারাজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন—"অসুখের সময় সকলের সেবা পেয়ে সেরে উঠলে সংঘের প্রতি দরদ, টান অনেক বেড়ে যায়।" সত্যিই তাই। খুব কৃতজ্ঞতাবোধ আসে।

—মহারাজ কী অসুখ হয়েছিল?

মহারাজ : রক্ত-আমাশয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর নির্জনবাসের কথা খুব বলেছেন। আমাদের বর্তমান জীবনধারায় নির্জনবাস কিভাবে সম্ভব?

মহারাজ : ঠাকুর নির্জনবাসের কথা বলেছেন ঠিকই, তবে সর্বদা নয়—মাঝে মাঝে। আসল কথা, নির্জনবাস ও তপস্যার জন্য মনকে আগে তৈরি করতে হয়। তাহলে নির্জনবাস বা তপস্যা ফলদায়ী হয়। একবার তপস্যার জন্য ছুটি পেলাম। মহাপুরুষ মহারাজকে জানাতেই খুব খুশি হলেন। বললেন—"যাওয়ার আগে যে-কদিন আছে খুব কষে জপধ্যান করো। তাহলে তপস্যায় গিয়ে ঠিক ঠিক সময়ের সদ্‌ব্যবহার করতে পারবে।" করেছিলামও তাই। তাঁরা (ঠাকুরের সন্তানরা) সর্বদা খুব উৎসাহ দিতেন। কতভাবেই না উৎসাহ দিতেন সাধন-ভজনের জন্য। কখনো 'না' করেননি।

প্রশ্ন : মহারাজ, যখন বাড়ি ছেড়ে এসেছিলাম তখন যে-পরিমাণ বৈরাগ্য ছিল, দেখছি দিন দিন সেটা কমে যাচ্ছে। কেন এরকম হয় এবং এর প্রতিকার কী?

মহারাজ : যখন ঘর ছেড়ে আমরা আসি তখন বৈরাগ্যের যে-পরিমাণ তীব্রতা, সেটা আস্তে আস্তে কমে যায়। সেরকম আর থাকে না। এটা সত্য। এটা দেখা যায়। প্রত্যেক সাধকেরই একই অভিজ্ঞতা। এর কারণ কী? এর কারণ, মনের এই স্বভাব। মনের এরকমই গতি। কখনো উঁচুতে, আবার কখনো নিচুতে। উত্থান-পতনই মনের স্বভাব। যখন

আমরা ঘর ছেড়ে আসি তখন নবানুরাগ। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই আকর্ষণ কমে যায়। একেবারে কমে যায় না। আবার হয়ত বেশ কিছুদিন পর সেটা বাড়তে দেখা যায়। সেইরকমই মনের স্বভাব। এটা জেনে ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে। ভয় বা হতাশার কিছু নেই। মন যে শুধু নিচের দিকে নামে, তা তো নয়; সেই মনই আবার ওপরে ওঠে। যখন মন নিচে নামে হয়ত বোঝা গেল না, কিন্তু যখন বোঝা গেল তখন আবার তুলতে হবে। আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। ঠাকুর যেমন কলমের মতো ঢালু রাস্তার উদাহরণ দিয়েছেন। কেল্লায় যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আমিও কেল্লায় গেছি, যদিও গাড়িতে করে। এত নিচে আমরা গেছি যে, যাওয়ার সময় বুঝতে পারিনি। নিচ থেকে গাছগুলো কত ওপরে দেখা যাচ্ছে। সেরকম মন যখন বুঝতে পারল সে নেমে গেছে, তখন তাকে আবার টেনে তুলতে হবে। এই তো সাধনা। তবে আমাদের হতাশার কিছু নেই। আমরা যেটুকু চেষ্টা করি না কেন, তা যতই সামান্য হোক না কেন—সেটা বৃথা যায় না। জমা থাকে। আদর্শের দিকে, উদ্দেশ্যের দিকে যদি একটা ছোট পা-ও ফেলে থাকি, ততটুকু দূরত্ব তো কমল। ততটুকু তো জমা হল। সাধন করতে করতে এক এক সময় মনে হবে, সব বিস্বাদ লাগছে, ভাল লাগছে না। সাধন-ভজনে যেন এতটুকুও এগচ্ছি না। Dry মনে হবে, যেন সব শুকনো লাগছে। এরকম যখন মনে হবে, জানতে হবে আমরা ঠিক পথেই নেমেছি, ঠিক পথেই এগচ্ছি। এগুলি ঠিক পথেরই দিঙ্নির্দেশ। মনের এরকম অবস্থা না আসা পর্যন্ত কি হা-হুতাশ করব? হতাশ হয়ে ছেড়ে দেব? না। ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, এগচ্ছি মনে হোক আর নাই হোক, সাধন-ভজন ছাড়লে চলবে না। ক্রমে সে-অবস্থা কেটে যাবে। সাধনে রুচি হবে।

আসলে ভগবানের অভাবে আমাদের জীবনটা কি অসহ্য বোধ হচ্ছে? ভগবানের অভাবে এজীবনটা যখন অসহ্য বোধ হবে, তখনি অরুণোদয় হল—ঠাকুর বলেছেন। তারপর তাঁকে লাভ করতে আর দেরি নেই। এরকম মনের ব্যাকুলতা না হওয়া পর্যন্ত আমরা যাই করি না

কেন, কোন কিছুই কিছু নয়। তা বলে চেষ্টা ছাড়ব না। যতক্ষণ না এরকম ব্যাকুলতা হচ্ছে, ততক্ষণ চেষ্টা করে যেতে হবে। আমাদের এতটুকু চেষ্টাও বৃথা যায় না, বৃথা যাবে না। সেটা নষ্ট হবে না। বরং জমা থাকবে। ভবিষ্যতে জীবনে যখন ঘাত-প্রতিঘাত আসবে, তখন এই সৎ চেষ্টাটুকু আমাদের বাঁচাবে। যত ছোট চেষ্টাই হোক না কেন, কোন সৎ চেষ্টাই ভুলতে নেই। সেটুকু স্মরণ করলেও সেসময়ে মনে বল আসে। নবানুরাগের বৈরাগ্য, চেষ্টা ইত্যাদি ভবিষ্যৎ জীবনে মনে করতে হয়। তখন মনে হয়, আহা কিরকমই না মনের অবস্থা ছিল! কত টান, কত বৈরাগ্য!

আমরা একজন সাধুকে দেখেছি। এঁর কথা আগে একদিন বলেছি। খুব জপ-ধ্যান, সাধন-ভজন করতেন বলে সুনাম ছিল। পরে মঠ ছেড়ে সংসারী হয়েছিলেন। তারপর যখন তিনি মঠে আসতেন, খুব অনুশোচনা করতেন। বলতেন—"ঠাকুরের সন্তানরা এত কৃপা করলেন, কিন্তু আমি তাঁদের কৃপা ধরবার অধিকারী নই। তাঁদের কৃপা ধরে রাখতে পারলাম না।" বলতেন আর অঝোরে দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ত। আহা, এই যে অনুশোচনা—এই অনুশোচনার আগুনে মনের ময়লা, মনের গ্লানি ধুয়ে যায়। কেউ বলতে পারে না—তার পতন হবে না; কারণ, সেটা প্রকৃতির ব্যাপার। পতনের ঊর্ধ্বে উঠেছে বলে কেউ দাবি করতে পারে না। ঠাকুর বলতেন, ভগবানের জন্য এতটুকু যে চোখের জল ফেলেছে, সেটা জমা আছে। সেটা নষ্ট হয় না। সেটা কখনো না কখনো ফল দেবে।

॥ ১৭ ॥

শাস্ত্রের কিছু বিষয় আলোচনা করার পর মহারাজ বললেন : "'ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌ করণে।' শেষ সময়ে এসব কিছুই কাজ দেয় না। ঠাকুর যেমন বলেছেন, পাখি ট্যাঁট্যাঁ করে।" খুব গম্ভীর স্বরে বললেন : "একটা একটা করে দিন চলে যাচ্ছে। সেদিনের জন্য তৈরি হও। এরকম

সুরক্ষিত স্থান আর কোথাও পাবে না। সারা দুনিয়া ঘুরে এলেও পাবে না।” এরপর দানের কথা উঠল।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা কী দান করতে পারি?

মহারাজ : [নিজের হাত দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে দেখিয়ে] এটা। আমরা এটা দান করতে পারি। আমরা হৃদয় দিতে পারি। হৃদয় দেওয়া মানে সহানুভূতি, fellow-feeling। কারণ, এটা আমাদের নিজেদের—একান্ত নিজস্ব।

কোন ব্রহ্মচারীর ‘পোস্টিং’ হচ্ছে না দেখে মহারাজ বলছেন : “বসে আছ, কোন কাজ নেই। একটু একটু ঠাকুরের কাজ করতে হয়। আমাদের সময় মঠে যাদের কাজ থাকত না, তারা সব সবজি কাটত। কাল থেকে তুমিও একটু কুটনো কুটবে।” পরদিন সকালে মহারাজ বললেন : “কৈ, তাকে তো দেখছি না!” ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল মহারাজ বললেন : “তাকে দেখলাম, কুটনো কুটছে।” মহারাজ বললেন : “বেশ, আমি ওকে পাঠিয়েছি। আমাদের সময়ে যার কাজ থাকত না, সে এসে একটু কুটনো কুটত। ঠাকুরের কাজ একটু করতে হয়।”

প্রশ্ন : মহারাজ, শাস্ত্রে গুরুসেবা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সংঘ এত বড় হয়ে গেছে যে, সকলের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে গুরুর সেবা করা অসম্ভব। এবং তা অবাস্তব। এক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয়?

মহারাজ : সংঘের সেবাই গুরুসেবা। সংঘ ঠাকুরের দেহ—স্বামীজী বলেছেন। অতএব সংঘের সেবাই ইষ্ট ও গুরুর সেবা।

শুয়ে থাকলে প্রণাম করা উচিত কিনা এবিষয়ে কথা হচ্ছে। মহারাজ বললেন : “শুয়ে থাকি, অনেকে জিজ্ঞাসা করে, প্রণাম করব? আমি বলি, করবে না কেন? আমার ওসব নেই। শুয়ে থাকলে প্রণাম করতে চায় না। কারণ, শবের মতো মনে হয়। আর সন্ন্যাসী তো মৃত। তাঁর দেহ তো শব। সন্ন্যাসী দেহকে শব মনে করবে। অর্থাৎ কেউ যেমন মৃতদেহে ‘আমি’ বুদ্ধি করে না, তেমন সন্ন্যাসী নিজের দেহকে শব মনে করবে। শ্রাদ্ধাদি করে সন্ন্যাসী তো বিদেহী। তার আবার দেহ কোথায়?

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরের বিভিন্ন ধরনের সাধনের সময় যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরিবর্তন হতো সেকথা উল্লেখ করে শরৎ মহারাজ লিখেছেন : "আমাদের মনই শরীর সৃষ্টি করে।"—এর মানে কী?

মহারাজ : সাধারণভাবে দেখা যায়, যার মন নরম, তার শরীরও নরম হয়। যার মন কর্কশ, তার শরীরও কর্কশ হয়। মনের প্রভাব শরীরের ওপর আছে। মন এবং শরীরের সম্বন্ধ পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। তাই যারা ভক্তি ভাবের সাধনা করে, তাদের খাওয়া-দাওয়াও এক বিশেষ প্রকারের করতে হয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, আজকাল ঠাকুরকে গেরুয়া কাপড় পরানো হয়। তিনি যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁর জীবৎকালে তিনি তো কখনো গেরুয়া পরতেন না শুনেছি পাছে তাঁর গর্ভধারিণীর মনে কষ্ট হয়—

মহারাজ : হ্যাঁ, ঠাকুর কখনো সাদা পরতেন, কখনো বা বাসন্তী পরতেন। বাসন্তী রঙের কাপড় পরেছেন জন্মদিনে। কখনো গেরুয়া পরেছেন শোনা যায় না। কারণ, তিনি তো একাধারে সন্ন্যাসী ও গৃহী।

॥ ১৮ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, যখন আশ্রমের কাজে খুব দায়িত্ব থাকে, তখন সেই চিন্তা পেয়ে বসে। সর্বক্ষণ যেন, সেই এক চিন্তা। এতে সাধন-ভজনে একটু অসুবিধা হয়। কী করব?

মহারাজ : ঠিকই বলছ, এমনটা হয়। তাহলে এব্যাপারে শোন আমার জীবনের একটি অভিজ্ঞতা। তখন আমি শিলঙে। আমি যতটা বেশি পারতাম সাধন-ভজন, ঠাকুরের চিন্তা, স্মরণ-মনন করতাম। একটি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। আমাকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে। আর সর্বক্ষণ সেই চিন্তা। এমনকি ধ্যান-জপ করতে বসলেও সেই এক চিন্তা। মহা মুশকিলে পড়লাম। ভাবলাম, এ কী হল? সাধন-ভজন, ঈশ্বরচিন্তার বদলে এ কী হচ্ছে? খুব দুশ্চিন্তা হল। কিন্তু দেখলাম, বাড়ি তৈরি হয়ে গেল, আর আমার মাথা থেকে সে-চিন্তাও দূর হয়ে গেল। আবার মনের পূর্ব অবস্থা ফিরে

এল। এরকমই হয়। কাজের মধ্যেও যদি যতটা সম্ভব তাঁর চিন্তা, প্রার্থনা করা যায়, তবে কাজ শেষ হয়ে গেলে মন আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পায়। সবসময় তো আর কাজ একরকম থাকে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, সাধন-ভজনে উৎসাহ কিভাবে বাড়ানো যায়? মাঝে মাঝে মনে হয় যেন একই রকম চলছে।

মহারাজ : উৎসাহ চেষ্টা করে করে বাড়ানো যায়। করতে করতে বাড়ে। একই রকম হয় মানে, যাকে আমরা বলি 'দিনগত পাপক্ষয়'। করতে হয় তাই করছি। এর কারণ—আন্তরিকতা আসছে না। ভিতরে ভগবানলাভের জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা, তাঁর জন্য মনের মধ্যে একটা দারুণ অভাববোধ না হওয়া পর্যন্ত সাধন-ভজন ঠিক হয় না।

প্রশ্ন : এই অভাববোধ কি চেষ্টা করে তৈরি করা যায়?

মহারাজ : দেখ, এই করলে হয়, ঐ করলে হয়—এরকম ভগবানলাভের ক্ষেত্রে বলা যায় না। তবে কিরকম ব্যাকুলতা, কিরকম তীব্র অভাববোধ হলে ভগবানলাভ হয়—সে-অবস্থা আমরা ঠাকুরের এবং অন্যান্য সাধকদের জীবনে দেখতে পাই। কারো যদি এরকম হয়, তবে তার ভগবানলাভ হবে। নিরঞ্জনের ভগবানলাভ কবে হবে, সেকথা ভেবে ঠাকুর অস্থির। বলছেন : "হ্যাঁরে, নিরঞ্জন, তুই ভগবানলাভ করবি কবে? দিন যে যায়।" দেখ, নিরঞ্জনের জন্য তাঁর কী মাথাব্যথা! রাজা মহারাজ তো আরো মারাত্মক কথা বলেছেন : "যা করার, ত্রিশের মধ্যেই করে নে।" কারণ, যৌবনের সেই বেগ, সেই ব্যাকুলতা বয়স হয়ে গেলে থাকে না। ঝিমিয়ে যায়। আর সম্ভব হয় না। অনেকের তিরিশ তো পেরিয়েই গেছে। কিন্তু কী করবে? শঙ্করাচার্য বলছেন :

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্-দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥"

(বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক-৩)

এই তিনটি দুর্লভ—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব আর মহাপুরুষ-সংশ্রয়। মানুষজন্ম তো হল। আগে কুকুর-বেড়ালের মতো কতবার জন্মেছি, কতবার মরেছি।

মহাপুরুষ-সংশ্রয়ও হল। কিন্তু যদি মুমুক্ষুত্ব না আসে, যদি এই জন্ম-মরণের পারে যাওয়ার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা না আসে, তবে কিছুই হল না। ভগবানের জন্য জীবনটা কি অসহ্য বোধ হচ্ছে? মনের মধ্যে একটা তীব্র অভাববোধ—যেন গামছা নিংড়াবার মতো কষ্ট হচ্ছে? তবে, ঠাকুর বলছেন, ব্যাকুলতা হল, অরুণোদয় হল, সূর্য উঠতে আর দেরি নেই। (সকলে নিস্তব্ধ)

একটুক্ষণ থেমে মহারাজ আবার শুরু করলেন। বলছেন, মাঝে মাঝে নিজেকে খতিয়ে দেখতে হয়, কী করছি? মহাপুরুষদের সঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন, কিছু সদাচরণ ঠিক করে নিয়ে সেগুলি পালন করা, নিজের জীবনে অনুশীলন করার চেষ্টা করতে হয়।

প্রশ্ন : হরি মহারাজ এক জায়গায় বলছেন, যে জগতের সবকিছুকেই তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে, সে-ই বীর। আমাদের জগদতীত কিছুই তো ধারণা হচ্ছে না। জগদতীত কিছুর ধারণা না হলে কী করে জগতের সব জিনিসকে তুচ্ছ করা সম্ভব?

মহারাজ : জগৎ কি বাইরে? জগৎ এই দেহটাই। এই দেহটার প্রতি টান, দেহটার প্রতি আকর্ষণ কি কমছে? কমছে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী তো বলেছেন কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে। কাজের প্রতি আসক্তি যেমন প্রয়োজন, তেমনই একইসঙ্গে নিরাসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

মহারাজ : একইসঙ্গে আসক্ত হওয়া আবার নিরাসক্ত হওয়া কি সম্ভব? একই সাথে কি আলো আর অন্ধকারের অবস্থান সম্ভব?

—কিন্তু মহারাজ, স্বামীজী তো বলেছেন, কাজে আসক্তি বা আগ্রহ থাকা দরকার।

মহারাজ : আগ্রহ থাকা তো দরকার, নতুবা মঠ-মিশন চলবে কী করে?

—তাহলে মহারাজ, একইসঙ্গে আসক্ত ও নিরাসক্ত হওয়া—স্বামীজীর এরকম বলার তাৎপর্য কী?

মহারাজ : এটা হচ্ছে, যখন কাজ করছি তখন খুব আসক্ত হয়ে করছি, মন-প্রাণ ঢেলে একাগ্রতার সঙ্গে করছি। আবার যখনি দরকার হচ্ছে,

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছি। বিচ্ছিন্ন করতে একটুও অসুবিধা হবে না। অর্থাৎ এই কাজ করছি, আবার দরকার হল তো সে-কাজ ছেড়ে দিতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম। এরকম যখন অনাসক্ত হওয়া সম্ভব হবে, তখন কি সেটা আসক্ত হয়ে করা হচ্ছিল? কাজে আসক্ত হলে বুঝলে—ডুবলে, ডুবলে। আমাদের তো বলে দিয়েছে—সব কাজ ঠাকুরের জেনে করবে। কিন্তু শেষে 'আমি' মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একবার এই 'আমি' মাথাচাড়া দিলে—গেলে, সব গেল।

—'আমি'র এই মাথাচাড়া দেওয়াটা কিভাবে বন্ধ করা যায়?

মহারাজ : বিচার করে যাবে। কাজ না করে যায় না।

—বিচার কি কাজ করার সময় করব, না পরে?

মহারাজ : কাজের মধ্যে পারলে ভাল, নতুবা আগে পরে ভাবতে হয়, বিচার করতে হয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন—যারা আন্তরিক ধ্যানজপ করছে তাদের এখানে আসতেই হবে। কেন এমন বললেন?

মহারাজ : কারণ, এবার মানুষকে তাঁর ভাব নিতে হবে। এবার তাঁর ভাবটাই যুগভাব, যুগধর্ম। 'তাঁর কাছে' মানে, তাঁর উদার ভাব মানুষকে নিতে হবে—সে যেখানেই থাকুক।

প্রশ্ন : মহারাজ, দিন দিন দেখা যাচ্ছে সার্বজনীন ত্যাগ-বৈরাগ্য কমে যাচ্ছে।

মহারাজ : ওকথাটি বলো না। সার্বজনীন হিসেবে ত্যাগ-বৈরাগ্যের পরিমাপ হয় না। বল, কারো কারো কমে গেছে বা যাচ্ছে। যেরকম কারো কারো কমে যাচ্ছে, সেরকম আবার কারো কারো বাড়ছে। আমাদের মধ্যে বেশি ত্যাগ-বৈরাগ্যবান সাধু যেমন আছেন, তেমনই কম বৈরাগ্যবান সাধুও আছেন। সার্বজনীনভাবে ত্যাগ-বৈরাগ্য কম বা বেশি—এরকম কোন কথা হয় না। একবার শাশ্বতানন্দ মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে এরকম একটা প্রশ্ন করেছিলেন : "মহারাজ, আমরা সকলে আদর্শের দিকে এগচ্ছি বলে তো সবসময় মনে হয় না।"

মহাপুরুষ মহারাজ বললেন : "সকলের কথা বলো না। অন্যের কী হচ্ছে না হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারি না। নিজের কী হচ্ছে বুঝতে পারি। আমি নিজে এগচ্ছি কী পেছচ্ছি, নিজে বুঝতে পারি।" এটা খুব মূল্যবান কথা। মহাপুরুষ মহারাজ আরো বললেন : "আমাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য এত উঁচু যে, চট করে আমরা বুঝতে পারব না, আমরা উদ্দেশ্যের দিকে কতটা এগলাম। আর আমরা এগচ্ছি কিনা সেটি বুঝতে হলে যে-অবস্থা থেকে আমরা এগচ্ছিলাম সে-অবস্থায় ফিরে গিয়ে বিচার করতে হবে।" একথাটি অত্যন্ত মূল্যবান, সত্যিই মনে রাখার।

প্রশ্ন : মহারাজ, অনেক সমস্যার সমাধানে আপনি বিচারের কথা বলেন, কিন্তু বিচার যে সবসময় টিকছে না। যেটা ভাবি করব, সেটা অনেকসময় করতে পারি না। যেটা ভাবি করব না, সেটা করে ফেলি। কী করা যায়?

মহারাজ : যদি করেই ফেল, তবে খুব ভাবতে হবে। 'আর করব না'—এটা আন্তরিকভাবে বলতে হবে।

—ভাবি, কিন্তু আবার করে ফেলি।

মহারাজ : তার মানে, সেটাই স্বভাব হয়ে গেছে। মা যখন ছেলেকে বকে বা মারে তখন ছেলে বলে—মা আর করব না। কিন্তু ছেড়ে দিলেই আবার করে। তাই না? (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর এযুগে মাতৃভাবের বিকাশের জন্য শ্রীশ্রীমাকে রেখে গেছেন। মাতৃভাবের বিশিষ্টতা কী?

মহারাজ : মাতৃভাবের আবেদন সর্বজনীন। জগতের সকলেই আমরা মাকে চাই, মা ছাড়া আমাদের চলে না।

—সে তো সর্বযুগেই প্রযোজ্য। এযুগের বিশেষত্ব কী?

মহারাজ : এযুগে আমরা সকলেই নাবালক। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, মা বলেছেন—জানো তো বাবা, ঠাকুরের জগতের সকলের ওপর মাতৃভাব ছিল। ঠাকুর কি সকলকে সন্তানভাবে দেখেছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, অনেকেই ঠাকুরকে মা-রূপে দেখতেন। যেমন, রাজা মহারাজ। যখন তাঁর ২০/২২ বছর বয়স, তখন ঠাকুরের কোলে

বসতেন। স্তন্যপান করতেন, জান তো। মহাপুরুষ মহারাজও ঠাকুরকে মা-ভাবে দেখতেন। ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুরের পায়ে মাথা না রেখে ঠাকুরের কোলে মাথা রাখতেন। মায়ের কোল।

—মহারাজ, আর কে কে ঠাকুরকে মা-রূপে দেখতেন?

মহারাজ : সব কি আর আমরা জানি? সব কি জানা যায়?

প্রশ্ন : মহারাজ, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে চিঠি লিখেছিলেন : আনন্দে রাত্রে ঘুম হয় না। একথা শুনে ঠাকুর বলছেন : আহা, আহা, দেখি চিঠিখানা। চিঠিখানা হাতে নিয়ে দুমড়াচ্ছেন, বলছেন : অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না, এচিঠি খুব ভাল। ঠাকুর খবরের কাগজ ছুঁতে পারতেন না—এটা বুঝি, কিন্তু চিঠি ছুঁতে পারতেন না কেন?

মহারাজ : চিঠিতে কত কামনা-বাসনার কথা লেখা থাকে। আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন আমার ছেলের চাকরিটা হয়, মেয়ের বিয়েটা ভাল হয়—এমন আরো কত কী!

প্রশ্ন : মহারাজ, পূর্বজন্ম বা পরজন্মের সাথে আধ্যাত্মিক জীবনের কী সম্পর্ক?

মহারাজ : পূর্বজন্ম বা পরজন্ম মানে কার? যে বর্তমান জন্মে রয়েছে—তার। অর্থাৎ এখন যে আছে, তার পূর্বজন্ম এবং পরজন্ম। বর্তমান জন্মের সাথে পূর্বজন্ম বা পরজন্ম সম্পর্কিত। বলা হয়, অনেক সঞ্চিত কর্মের মধ্যে কতকগুলিকে যেন টেনে বের করা হয়; সেগুলোর দ্বারা এজন্মটা নির্ধারিত হয়েছে। আবার এজন্মে মৃত্যুর আগে যে-চিন্তা করবে সে-অনুযায়ী পরজন্ম নির্ধারিত হবে। মৃত্যুর সময় মানুষের চিন্তাশক্তি রহিত হয়ে যায়। তখন সারাজীবন যেভাবে আমরা অভ্যাস করেছি, সেইভাবেই মন সেই চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। মৃত্যুর সময় ভগবানের চিন্তা যাতে আসে, তাই গীতায় ভগবান বলছেন : "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।" সর্বদাই তাঁর চিন্তা করতে করতে অভ্যাস দৃঢ় হলে মৃত্যুকালে তাঁর স্মরণ সম্ভব। আর যে বললাম, কতকগুলো কর্মকে টেনে বের করা—এটা কি ইচ্ছামত? না, সেটাও আমাদের পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী। ভাল কর্ম

করলে ভাল, খারাপ করলে খারাপ—এরকমই ফল হয় এবং সে-অনুযায়ী পরজন্ম হয়।

—মহারাজ, তাহলে যে ভাল সে ভালই হবে, যে খারাপ সে খারাপই হবে? তাহলে খারাপের ভালর দিকে পরিবর্তনের সুযোগ কোথায়?

মহারাজ : খারাপ মানে কি শুধু খারাপ?

—না, দুটোই থাকে। কমবেশি দুটোই থাকে।

মহারাজ : হ্যাঁ।

॥ ১৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, একবার এক ভক্ত ঠাকুরকে বলছেন, আমার ভাবটাব কিছু হচ্ছে না, কিছু করে দিন। উত্তরে ঠাকুর বলছেন : ও কিরে? ভাবটাব অতি ছোট জিনিস। ঠিক ঠিক ত্যাগ-বৈরাগ্য অনেক বড় জিনিস। দেখ না নরেনের ভাবটাব হয় না, ওর কিরকম ত্যাগ-বৈরাগ্য! মহারাজ, ভাব হওয়া কি আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক নয়?

মহারাজ : না, ভাব আধ্যাত্মিক উন্নতির মাপকাঠি নয়। কথায় কথায় ভাব হলেই হল? এর চেয়ে ত্যাগ-বৈরাগ্য কি ভাল মাপকাঠি নয়?

—মহারাজ, ভাব কি ত্যাগ-বৈরাগ্য ছাড়া হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, হয়। বলছি শোন। উদাহরণ দিচ্ছি। স্বামীজী নিজের চোখে দেখেছেন, লোকেরা আয়নার সামনে বসে ঠাকুরের ভাব অনুকরণ করছে। একবার চৈতন্যদেবের এক ভক্তের ভাব হয়েছিল। মাটিতে লোটাচ্ছে। এদিকে চৈতন্যদেবেরও ভাব হয়েছে। অন্য ভক্তেরা চৈতন্যদেবকে সেবা করতে ছুটছে। ওদিকে ঐ যে-ভক্তটির ভাব হয়েছে, সে বলছে : প্রভুর ভাব হয়েছে, সকলে তাঁকে সেবা করতে ছুটছে। আমারও ভাব হয়েছে। কিন্তু আমাকে তো কেউ সেবা করতে আসছে না! বরং আমাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে সকলে প্রভুর কাছে ছুটছে! তাহলে দেখ।

—মহারাজ, ও তো অনুকরণ বা লোক-দেখানো ভাব। কিন্তু ঠাকুরের একজন ভক্তসন্তান যখন ভাব চাইছেন, তিনি তো তখন ত্যাগ-বৈরাগ্যহীন ভাব চাইছেন না!

মহারাজ : তা ঠিক। তবে কেবল ভাব হলেই হল না। তার সাথে সাথে জীবনটার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। সেটাই মাপকাঠি।

প্রশ্ন : মহারাজ, ধ্যানজপ করতে বসলে ঘুম এসে যায়। এটা কী?

মহারাজ : ধ্যানজপ করতে বসে যে ঘুম এসে যায়—এটা তমোগুণের প্রভাবে হয়। দুটো কারণে এটা ঘটে। প্রথমত, শারীরিক ক্লান্তি আর দ্বিতীয়ত, ধ্যান ও জপে আগ্রহ না পাওয়া।

—মহারাজ, কী উপায়ে এ দুটো দূর করা যায়?

মহারাজ : প্রথমত, শারীরিক ক্লান্তি বা tired হলে উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেওয়া দরকার। শরীরের যতটুকু বিশ্রাম বা ঘুম দরকার সেটুকু নিতে হবে। ঘুম থেকে একটু দেরিতে উঠে যদি ভাল ধ্যানজপ হয় অর্থাৎ শরীরের ক্লান্তি না থাকে তবে সেটা করাই ভাল। সেরকম রুটিন যদিও সংঘবন্ধ জীবনে সম্ভব নয়। এখানে সকলকে একই রকম রুটিন অনুসরণ করতে হয়। তবু এব্যাপার-গুলো এক এক জনের শরীর ও মনের গঠনের ওপর নির্ভর করে। যার পক্ষে যেরকম ভাল বোধ হয়, সেটাই করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, আগ্রহ না লাগা। আগ্রহ না লাগলে মন ঘুমিয়ে পড়ে। ধ্যানজপে আগ্রহ না লাগার কারণ—উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। আর তার মানে, স্বাদ পাই না। তাই মন ঘুমিয়ে পড়ে। চোখ-মুখে ভাল করে জল দিয়ে বসে সজাগ থাকার চেষ্টা করতে হয়। আর ধ্যানজপ করতে হলে আসনে বসেই নোঙর টানার মতো মালা জপতে নেই। স্বামীজী যেমন বলেছেন—প্রথমে বসে একটু চুপ করে মনটাকে লক্ষ করতে হয়, কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি। এভাবে কিছুক্ষণ করার পর মন একটু শান্ত হলে ধ্যানজপ শুরু করতে হয়। এরকম হঠাৎ একদিনে হয় না। এর জন্য মনের প্রস্তুতি চাই।

—কিভাবে মনকে প্রস্তুত করা যেতে পারে?

মহারাজ : যখন বসলেই ঘুম পাচ্ছে মনে হচ্ছে, তার মানে মন এখনো ধ্যানের জন্য তৈরি হয়নি। তার ক্ষেত্রে কাজকর্ম প্রশস্ত। কাজকর্ম করে যখন

এই তমোভাব চলে গেছে মনে হবে, মন পরিষ্কার মনে হবে, তখন ধ্যানজপ করা ভাল। আর সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সাধুসঙ্গ, একটু একটু অভ্যাস—এগুলিই উপায়। এগুলি করতে করতে একটু আগ্রহ এলে স্বাদ লাগবে। স্বাদ না লাগলে শুধু যান্ত্রিকই মনে হবে। আর স্বাদ পেয়ে গেলে তো হয়েই গেল। এগুলো থেকে এই বোঝা যায় যে, এ-পথ আমরা যতটা সোজা মনে করেছিলাম, ততটা সোজা নয়। যখন 'কথামৃত' পড়তাম আর ধ্যানজপ করতাম, মনে হতো আরেকটু পরেই সমাধিটা লেগে যাবে! কে জানত, ব্যাপারগুলো এত কঠিন! তবে এতে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। এথেকে আমাদের এই শিক্ষা নিতে হবে যে, চট করে কিছু হওয়ার আশা না করে অধীর আগ্রহে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জানতে হবে, এর জন্য দরকার অসীম ধৈর্য। আজ না হোক, কাল না হোক, একদিন আমার সাফল্যলাভ হবে। কোন চেষ্টাই বৃথা যায় না। আমি ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাব—এরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞা চাই। আমার নিজের জীবনের কত কথাই মনে আসছে। মনকে কত শাসন করেছি। এরকম যখন ঘুম আসত—দাঁড়িয়ে পড়তাম, হাঁটতে শুরু করতাম, হাঁটতে হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কতভাবেই না মনকে খাটিয়েছি! তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক সময়ই আমার জীবনের যেসব কথা স্মৃতিতে শিথিল হয়ে গেছে, সেগুলি আবার মনে পড়ছে। বল বল, তাড়াতাড়ি বল। সময় চলে যাচ্ছে। এই এক্ষুনি এসে বলবে, ওঠ ওঠ। তবু কেন বলছি জান? [মহারাজ খুব গম্ভীরভাবে বলতে শুরু করলেন] গোনা দিন শেষ হয়ে গেল। সময় চলে যাচ্ছে। দেখ জীবনটা—তার সব শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। কাল কী হবে জানি না। পর মুহূর্তে কী হবে জানি না।

> "আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
> প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
> লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
> তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥"

(শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র-১৩)

যেদিনটা চলে গেছে, ফিরে আসবে না। জীবনে একটা ব্যস্ততা আন, ব্যস্ত হও। প্রতিটি মুহূর্ত ব্যবহার কর। একটি মুহূর্তও যেন বৃথা বেরিয়ে না যায়। মৃত্যু কেশাগ্র ধরে রয়েছে, এখন কি বলবে—দাঁড়াও, আমি চুলটা ভাল করে বেঁধে নিই? যেদিন ঘর ছেড়ে এসেছিলে— মনে কর সেদিনের ব্যাকুলতা। আমার মনে আছে, পরা কাপড়টা ছেড়ে অন্য একটা ছোট কাপড় পরছি। রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে পালাব। ব্যস্ততায় হাত-পা কাঁপছে। মনে ভয়, দেরিতে পাছে সবাই টের পেয়ে যায়! তাহলে সংসার ছাড়ার planটা ভেস্তে যাবে। যেদিন ঘর ছেড়ে এসেছিলে—সেদিনের ব্যস্ততা, সেদিনের ব্যাকুলতার কথা মাঝেমধ্যে ভাববে। একলা একলা বসে মাঝেমধ্যে এরকম ভাববে। ঠাকুরের জীবনটা দেখ না—নিরঞ্জনের ভগবানলাভের জন্য তাঁর কী ব্যস্ততা! ওঃ কী চিন্তা—দিন যে চলে যায়, তুই কবে ভগবানলাভ করবি? বুদ্ধ বলেছেন, জগতের সর্বত্র আগুন জ্বলছে—এরকম মনে হওয়া চাই। বান আসবে শুনে ঠাকুর গঙ্গার পাড়ে গেছেন। ছেলেদের ডাকছেন : ওরে রাখাল, আয় আয় বান দেখবি আয়। তাঁরা আসার আগে বান চলে গেল। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন : দূর ছোঁড়া! তোর কাপড় পরার জন্য বান বসে থাকবে? এই দেখ না, আমি বগলে কাপড় নিয়েই ছুটে এসেছি। দেখ, কিরকম ব্যস্ততা! সুযোগটা চলে না যায়। বুঝলে? জীবনে একটা ব্যস্ততা আনার দরকার। ব্যস্ততা আসছে না।

—মহারাজ, মনটা বেশ কিছুদিন একটা ভাল ভাব নিয়ে থাকে। আবার হঠাৎ একটা বিরুদ্ধ ভাব এসে সেটাকে নষ্ট করে দেয়। তখন কী করা কর্তব্য?

মহারাজ : সে-পূর্বভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা কর্তব্য। এ তো সোজা উত্তর।

—সেই চেষ্টা করি, আবার হয়ত ফেরে, কিন্তু আবার সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কতদিন এরকম করতে হবে?

মহারাজ : যতদিন না পূর্বভাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছ।

—নাকি, এরকমই শুধু চলবে?

মহারাজ : তা কেন, চেষ্টা করতে করতে অভ্যাস দৃঢ় হয়। ভাব স্থায়ী হতে থাকে।

—এরকম হতে হতে মনে যে বড় হতাশা আসে! কী করা উচিত?

মহারাজ : না, হতাশা আসতে দেবে না। বারবার চেষ্টা করার নামই সাধনা। এটাই আমাদের ধ্যান। 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' এছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি যখন মঠে এসেছেন তখন বাবুরাম মহারাজকে দেখেছেন?

মহারাজ : Join করার আগে যখন ভক্ত হিসাবে মঠে আসতাম তখন খুব আবছা মনে পড়ে, বাবুরাম মহারাজকে দেখেছি। কিন্তু স্পষ্ট মনে নেই। তবে বাবুরাম মহারাজের ভাণ্ডারার দিন এসেছিলাম—সেটা খুব পরিষ্কার মনে আছে। ওঁর দেহ যায় ১৯১৮ সালে।

—মহারাজ, রাজা মহারাজের কাছে আসতেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, আসতাম।

—কথাবার্তা কিছু হতো?

মহারাজ : তখন কি আর প্রশ্ন করার মতো অত বুদ্ধি ছিল? (সকলের হাসি)

—মহারাজকে খুব ভয় করত?

মহারাজ : তা করত। সেটা সম্ভ্রমের। বিরাট পুরুষ, ঠাকুরের সন্তান। তাই যেতাম। উনি তো বলরাম-মন্দিরে থাকতেন। একদিন গিয়ে দেখি, দোতলায় সামনের বারান্দায় হাঁটছেন। মহারাজের বিরাট চেহারা। ছোট্ট বারান্দা। মনে হচ্ছে, বারান্দার প্রস্থে মহারাজের কুলোচ্ছে না। প্রণাম করলাম, প্রণাম করতেই বললেন : আজ শরীরটা ভাল নেই। শুনে চলে এলাম। কথাবার্তা হল না। মাঝের হলঘরে বসতেন। অনেক ছেলেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করত। মাঝেমধ্যে খুব কথা, ফষ্টিনষ্টি হতো।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনাদের ছেলেবেলায় তো 'কথামৃত' বেরোয়নি তখনো। ঠাকুরের কথা কী করে জানলেন?

মহারাজ : না, 'কথামৃত' বেরিয়েছে। 'কথামৃত' পড়েই ঠাকুরের কথা জেনেছি। আর আমাদের স্কুলের একজন মাস্টার মহাশয়ের কাছ থেকে জেনেছি। সেসব গল্প তো অনেক বলেছি।

—না না মহারাজ, বলুন। আমরা শুনিনি।

(মহারাজ গল্প বলার ভঙ্গিমায় বলতে শুরু করলেন)

মহারাজ : তখন স্কুলে পড়ি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুল। বিকালে একটু বেড়াতে বেরতাম। সাধারণত আমি গঙ্গার ধারে বেড়াতাম। একদিন দেখি, একটু দূরে কতকগুলি young ছেলে জমায়েত হয়ে কী যেন করছে। Curiosity হল। কাছে গেলাম। দেখলাম, আমাদের স্কুলের একজন মাস্টার মহাশয় ও কতকগুলি ছেলে। ওরা ভজনগান করে, রামনাম করে। আমার তো বেশ লাগল। আমিও ধীরে ধীরে ওদের সাথে জুটে গেলাম। ওরাও দেখল, বেশ গোবেচারা একটা ছেলে পাওয়া গেছে! (সকলের হাসি) কাছেই একটা শিবমন্দির ছিল। আস্তে আস্তে জমায়েতটা শিবমন্দিরেই হতে শুরু করল। ঐ যে মাস্টার মহাশয়ের কথা বললাম—তিনি যদিও আমাদের ক্লাস নিতেন না, তবুও আমাকে চিনতেন। শিবমন্দিরে সন্ধ্যায় আরতি হতো। তারপর ছেলেরা দেখতাম জপ ধ্যান করত। আমাদের বাড়িতে নিয়ম ছিল, সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরতে হবে। সন্ধ্যা উতরে ঘরে ঢুকলে বকুনি খেতে হবে। প্রথম প্রথম সন্ধের আরতি দেখে চলে আসতাম। কিছুদিন পর মনে হল, এরা সব সন্ধের পর জপধ্যান করে, আমিই বা কম কিসে? শুরু করলাম। ধ্যান করতাম। ধ্যান মানে আর কী? চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকতাম। (সকলের হাসি) কদিন পর আমাকে মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন : তুমি মন্দিরটা পুঁছতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারব—বলে তখন থেকেই মন্দির মোছার কাজটা শুরু করলাম। কদিন পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন : সন্ধের আরতিটা তুমি করতে পারবে না? আরতি করার সুযোগ পাওয়া

আমার কাছে হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। তখন থেকেই আমি আরতি করতাম।

এপর্যন্ত তো বাড়িতে দিনে অন্তত দুবার খেতে যেতাম। বাড়ির সঙ্গে ঐ সম্পর্ক। দেখতাম কয়েকজন ওখানে রাতে থাকে। ভাবলাম, দুবার বাড়ি যাই—খেতে আর রাতে শুতে। রাতের শোয়াটাই বা এখানে হোক না কেন। রাতেও থাকতে শুরু করলাম। রাতে কী দেখলাম শোন। তোমাদের বলছি, শুনে রাখ। সাধারণত কলকাতার ছেলেদের সম্পর্কে সকলের অন্যরকম ধারণা। কিন্তু দেখতাম, গঙ্গার ধারে বেশ কিছু young ছেলে সারারাত ধ্যানজপ করে। সকাল হলে বাড়ি যায়। আশ্চর্য হলাম। এ এক অন্য কলকাতা। দিনের পর দিন আমি তাদের সারারাত ধরে ধ্যানজপ করতে দেখেছি। যাহোক, এর মধ্যে শিবমন্দির থেকে আমাদের আস্তানা উঠে একটা ভাড়াটে বাড়িতে এসেছে। জমায়েত আস্তে আস্তে বাড়ছিল বলে একটা বাড়ি ভাড়া করা হল এবং আশ্রম ওখানেই উঠে এল। বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম, বোঝাতাম—আমি তোমাদেরও আছি, সম্পূর্ণ আশ্রমের হয়ে যাইনি। বাড়িতে খুব একটা কিছু বলতে সাহস করত না। পাছে যেটুকু সম্পর্ক আছে—সেটুকুও বন্ধ করে দিই। আর পড়াশোনার সময়ও তখন কম পেতাম। কিন্তু স্কুল থেকে কোন খারাপ কিছু, মানে পড়াশোনায় অবহেলা করছি—এসব শুনতে পেত না। তাই আমায় কিছু বলতেও পারত না। করতাম কী, খুব ভোরে উঠে স্কুলের পড়া তৈরি করে ফেলতাম। বাড়ির ওরা আশ্চর্য হতো। ভাবত, সর্বদাই আশ্রমে থাকে, পড়ে কখন? যাই হোক, ঐ আশ্রমে বেশ কিছু সাধু যাতায়াত করতেন।

—মহারাজ, তাঁরা কি আমাদের মঠের সাধু?

মহারাজ : তা নয় তো কী? তবে কি ভাবছ, তাঁরা গঙ্গাসাগরের সাধু? (সকলের হাসি)

—মহারাজ, কারা আসতেন?

মহারাজ : অনেকে আসতেন। তাঁদের মধ্যে নির্বেদানন্দজী, তাঁর সহযোগী ভরত মহারাজ (সন্তোষানন্দজী)। জ্ঞান মহারাজ তো থাকতেন। পরে

শরৎ মহারাজও গেছেন। অনেকে আসতেন। এদিকে আমার খুব ইচ্ছা—ব্রহ্মচর্য নেব। বললাম একদিন শরৎ মহারাজকে। বললেন : যা না, মহাপুরুষ মহারাজকে বল না। বললাম : মহাপুরুষ মহারাজকে আমার ভয় করে। উনি সংকোচটা বুঝলেন। জ্ঞান মহারাজকে ডেকে বলে দিলেন আমাকে নিয়ে মঠে মহারাজের কাছে ব্রহ্মচর্য চাইতে। জ্ঞান মহারাজ চাইতেন না, সবাই মঠে যোগ দিয়ে সাধু হোক। তাঁর ভাব ছিল—ত্যাগের ভাব নিয়ে থাকা, জনহিতকর কাজ করা ইত্যাদি। সে তাঁর একটা ভাব। নিজে সেরকম ছিলেন কিনা। স্বামীজী তাঁকে সেভাবেই থাকতে বলেছিলেন। সন্ন্যাস দেননি। যদিও গেরুয়া কাপড় পরতেন। যাই হোক, শরৎ মহারাজের আদেশ। জ্ঞান মহারাজ আমাকে নিয়ে এলেন মঠে। মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন আমার কথা—শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তো সদাশিব। এরপর শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন শুনে বললেন : বেশ তো, ব্রহ্মচর্য দেব। কিন্তু পড়াশোনা ছাড়তে পারবে না। মঠে এখন যোগ দেওয়া হবে না। পড়া শেষ করে তারপর। ভাবলাম, বেশ তাই হবে। কারণ, ব্রহ্মচর্য নিতে হলে পড়তে হবে। আর পড়া ছাড়লে ব্রহ্মচর্য হবে না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য হোক। পড়াশোনা করব। ব্রহ্মচর্য দিলেন মহাপুরুষ মহারাজ। তখন কলেজে পড়ি। কলেজে যেতাম। ক্রমে পরীক্ষা এল। পরীক্ষাটা দিলাম। শেষ পরীক্ষার পর হল থেকে বেরিয়ে সোজা বেলুড় মঠে। সেই পাকাপাকি আসা বেলুড় মঠে। আজও এলাম, কালও এলাম। বেশ, এই তো শুনলে সংক্ষেপে, একটা outline হল আর কী।

॥ ২০ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনার জীবনের তপস্যার কথা কিছু বলুন।

মহারাজ : দেখ, তথাকথিত তপস্যা বলতে যা বোঝায় সেরকম তপস্যা আমি বিশেষ কিছু করিনি। তপস্যা বলতে দুরকম বোঝায়—এক, কৃচ্ছ্রসাধন করা যাকে বলে 'austerity', আর দ্বিতীয় হল ভগবানে মন রাখার

চেষ্টা করা। প্রথম অর্থে যে-তপস্যা সেরকম নিজে ইচ্ছে করে কিন্তু করিনি। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেরকম ছিলাম, সেখানে যা পাওয়া যেত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। সেখানে তার চেয়ে আর ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। তাই কষ্ট করতে হয়েছে। একে austerity বলতে পার। কিন্তু austerity করব বলে ওরকম করেছি তা নয়। যেমন, উত্তরকাশীতে থাকার সময় সেখানে ঐরকমই ব্যবস্থা। যেই থাকতে চাক না কেন, ওভাবেই থাকতে হবে। তবে অহেতুক শরীরকে কষ্ট দিইনি, কেননা শরীরকে রক্ষা করতে হবে। মাটিতে শুতে হতো। নিচে কিছু খড় বিছিয়ে নিতাম, যাতে ঠান্ডা বেশি না লাগে। ভিক্ষা যথেষ্টই মিলত, অন্তত একবেলা পেট পুরেই খেতাম। আমাদের চেয়ে বেশি কষ্ট করছে—এরকম সাধুও দেখেছি। ভিক্ষা পর্যন্ত পেত না। তবে এসবকে কখনোই কষ্টদায়ক বলে মনে হয়নি। কারণ, আমরা নিজেরা স্বেচ্ছায় এজীবনকে বরণ করে নিয়েছি।

—মহারাজ, বর্তমান প্রাচুর্যের যুগে কিভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের (তপস্যার) মনোভাব বজায় রাখা যায়?

মহারাজ : কী বলছ, প্রাচুর্য! কোথায় প্রাচুর্য? প্রাচুর্য দেখতে চাও তো পাশ্চাত্যে দেখ। কী প্রাচুর্য! সে-তুলনায় আমাদের কোথায় প্রাচুর্য? অবশ্য আমাদের উত্তরকাশীর দিনগুলোর তুলনায় বলা যেতে পারে। কিন্তু দেশের তখন ঐরকমই অবস্থা ছিল। বর্তমানে উন্নতি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাধুদের জীবনেও কিছু সচ্ছলতা এসেছে। তখন ইচ্ছে করলেও তার চেয়ে ভাল থাকা সম্ভব ছিল না। দেশের সর্বত্র দারিদ্র আর কষ্ট একই রকম ছিল। মানুষ যখন খেতে পায় না, তাকে বলে 'starvation'; আমরা যখন খেতে পাইনি, তাকে starvation বলিনি—বলেছি 'fasting'। Starvation আর fasting-এর পার্থক্য বুঝেছ? সাধুর starvation হচ্ছে fasting। একটি অনিচ্ছাকৃত, আর অপরটি স্বেচ্ছাকৃত। অন্যের দৃষ্টিতে austerity মনে হতে পারে, কিন্তু সাধুর কেন privation থাকবে? তার কোন privation থাকবে না। কথাগুলো

বড্ড কড়া হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি। আমি তখন উত্তরকাশীতে। আমাদের পরিচিত একজন ভক্ত আমি ওখানে আছি জেনে তিনটে টাকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিন টাকা তো দূরের কথা, এক পয়সাও খরচ হতো না। পত্রোত্তরে তাঁকে জানালাম : "I don't need money, please do not send."

—মহারাজ, একটা তো বললেন কৃচ্ছ্রসাধনের দিক। তপস্যার আরেকটা দিক যেটা আপনি শুরুতে বলেছেন যে, ভগবানের দিকে এগনোর চেষ্টা, তাঁর স্মরণ-মনন, তাঁকে লাভের চেষ্টা করা—আপনার জীবনের এদিকটির কথা একটু বলুন।

মহারাজ : আমার কথা কি বলব? আমাদের আদর্শ হিসেবে বলতে পারি।

—সেভাবেই বলুন।

মহারাজ : ঐ তো বললাম, সাধুদের কষ্টস্বীকার, কৃচ্ছ্রসাধন হল voluntary—সেখানে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। কেউ জোর করছে বলে করছি, তা নয়। এদিক থেকে তপস্যার অর্থ হচ্ছে, কিছুদিনের জন্য সমস্তরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে নিভৃতে একান্তে ভগবানের চিন্তা করা। সাধারণভাবে আশ্রমে থেকে এরকম করাকে তপস্যা বলে না। তপস্যা মানে exclusively ভগবানের জন্য সময় দেওয়া। একলা থেকে তাঁর ধ্যান-ভজন করা। তাঁর জন্য কাঁদা। Realization is not possible without shedding tears.

—কিন্তু মহারাজ, যে জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানপথে সাধন করছে, সেও কি কাঁদবে?

মহারাজ : Shedding tears হচ্ছে symbolic। এর মানে শুধু চোখের জল নয়, এর মানে হচ্ছে suffering pain and misery। জ্ঞানীকেও suffer করতে হয়, pain তারও তীব্র। অর্থাৎ জ্ঞানীই বল আর ভক্তই বল, suffering ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। Struggle মানেই suffering, struggle কখনো pleasurable হয় না।

—মহারাজ, ব্যাকুলতা বোঝাতে গিয়ে ঠাকুর শিষ্যকে জলের নিচে চুবিয়ে ধরার গল্প বলছেন। সেখানে গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন : "জলের

ভিতর তুমি কিরকম অনুভব করছিলে?" শিষ্য বলল : "আমি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করছিলাম।"তাহলে কি মহারাজ, ব্যাকুলতা মানে এরকম কষ্ট? ভগবানলাভের জন্য আমাদের সকলকেই এরকম কষ্ট ভোগ করতে হবে?

মহারাজ : ব্যাকুলতা মানেই তীব্র কষ্ট। ব্যাকুলতা আনন্দদায়ক নয়। যে-দেহ আমাদের এত প্রিয়, যার জন্য সংসার, যা এত আকর্ষণীয়—তাকে তুচ্ছ করা, দেহবোধ ছিন্ন করা কী কম কষ্টের!

—মহারাজ, জগৎকে তুচ্ছ করছি বলে কষ্ট, নাকি জগৎকে তুচ্ছ করতে পারছি না বলে কষ্ট?

মহারাজ : জগৎকে তুচ্ছ করতে পারছি না, ভগবানকে লাভ করতে পারছি না—এই যে অভাববোধ, এথেকেই কষ্ট। দেখ না, ঠাকুর যে এত আনন্দময়—তিনিও দেখিয়েছেন কিরকম আর্তি চাই ভগবানের জন্য। তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছেন। মাটিতে পড়ে মুখ ঘষড়ে কাঁদছেন।

—হ্যাঁ মহারাজ, ঠাকুরকে যখন আমরা আনন্দময় দেখছি, সেটা ঠাকুরের সাধনের অবস্থায় নয়। সাধনের অবস্থায় তিনি খুব যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। আর্তনাদ করেছেন। একটুও মজা করেননি। অত্যন্ত serious।

মহারাজ : ঠিক তাই। (একটু থেমে বলছেন) ভেবো না, দুপাতা 'বেদান্তসার' পড়ে জ্ঞান হয়ে যাবে। ভেবো না সংসার ছেড়ে এসেছ বলে বিরাট কিছু করে ফেলেছ। এটা কিছুই না। ভাল খাওয়া-পরার ইচ্ছে, সেটা স্থূল ভোগ; এছাড়া কত সূক্ষ্ম বাসনা রয়েছে। এই যেমন—কেউ মানল না আমাকে অর্থাৎ মান-সম্মানের বাসনা—এটাও ভোগবাসনা। প্রশংসা করলে মনে আনন্দ হয়, কেন হয়? কারণ, ভোগের বাসনা ভিতরে রয়েছে। জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা আসছে কি? জগৎ যে অতি তুচ্ছ, সেটা মনে হচ্ছে কি? তা তো নয়। বরং খাওয়ার পাতে বড় বড় রসগোল্লা পেলে কখনোই মনে হয় না জগৎটা তুচ্ছ, জগৎটা ত্যাজ্য। (একটু চুপ করে আবার বলছেন) কী জান—এরকম তীব্র ব্যাকুলতা বহুজনের ক্ষেত্রে সারাজীবনেও আসে না। তা বলে আমি বলছি না যে, আমাদের মধ্যে আন্তরিক কেউ

নেই। নিষ্ঠা আছে, কিন্তু ব্যাকুলতা নেই। আর এই আকুলতা না এলে হবে না। বৈরাগ্য না এলে—হ-বে-না। এটা নিশ্চিত। তবে আমাদের উপায় কী? আমাদের সেই তীব্র ব্যাকুলতা নেই বলে কি বসে থাকব? বড় ব্যবসা করার মতো মূলধন নেই বলে কি বসে থাকব? যেটুকু পুঁজি রয়েছে, তাই নিয়ে শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে নিয়মনিষ্ঠা সহকারে তাঁর দিকে এগনোর চেষ্টা করতে হবে। তাতে তীব্রতা আসবে, ব্যাকুলতা আসবে। এছাড়া আর কী উপায় আছে? অনেকে বলে তাঁর কৃপার কথা। আমি বলি, কৃপা তো তাঁর ব্যাপার। তিনি করবেন কী করবেন না, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমি কী করছি? আমার জন্য আমি কিছু করব না? তিনি করছেন না, তার হিসেব নিচ্ছি। কিন্তু আমি কী করছি তার হিসাব কি করেছি? আমায় অনেকে বলে, ঠাকুর করালে বা আপনি (গুরু) করালে করব। যেন নিজের কর্তৃত্ব একেবারেই চলে গেছে!

—মহারাজ, কিভাবে জপধ্যানে আন্তরিকতা আসে?

মহারাজ : আন্তরিক হলে আন্তরিকতা আসে। আমরা সাধুরা যে ধ্যান-জপ করার চেষ্টা করছি—আমরা যে আন্তরিকতাহীনভাবে করছি, তা নয়। চেষ্টা আন্তরিকতাহীন হতো তখন, যখন কোন মতলব বা ফন্দি—যেমন কিছু লাভ করা বা মানযশ প্রতিষ্ঠা, বড় সাধু বলে মান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নিয়ে জপধ্যান করতাম। কিন্তু সাধুদের (দু-একজন থাকতে পারে সেরকম—তাদের কথা বাদ দিয়ে বলছি) জপধ্যান আন্তরিকতাহীন হচ্ছে তো বলা যাবে না। কিন্তু সেটা হচ্ছে মন্দগতিতে। এটা আলস্য, ধীরগতির জন্য এরকম হচ্ছে। সচেতনতা থাকছে না। জপ-ধ্যানের সাথে মনকে যুক্ত করতে পারছি না। বেশির ভাগ সময়ে মন জড়তাগ্রস্ত থাকে, ঘুমিয়ে পড়ে। এসমস্যা অধিকাংশেরই। কেন এরকম হয়? কারণ—ব্যাকুলতার অভাব, আকাঙ্ক্ষার অভাব। একটা অভাববোধ, ছটফটানি আসছে কোথায়? এই ছটফটানি এলে আর কি ঘুমিয়ে থাকা যায়? ঠাকুর যেমন বলছেন—চোর যদি জানতে পারে, পাশের ঘরে সোনা লুকানো আছে, তবে কি সে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে?

নাকি, সে চেষ্টা করবে কিভাবে দেওয়াল কেটে ঐ সোনা পাওয়া যায়? এখন কথা হল, আমাদের সেরকম ব্যাকুলতা নেই বলে কি বসে থাকব? না চেষ্টা করব? যে-মূলধন নেই তা নিয়ে চিন্তা করে হা-হুতাশ করে কী লাভ? যেটুকু মূলধন আছে, তা নিয়েই চেষ্টা করে যাব। উপায় এই—চেষ্টা করতে করতে ব্যাকুলতা আসবে। কিরকম চেষ্টা? সর্বান্তকরণে চেষ্টা। এইভাবেই ব্যাকুলতা আসবে। অধিকাংশ সময় জপধ্যানে বসে কত সময় অজান্তে চলে যায়। সময়ের অপব্যয় কত!

—মহারাজ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করার চেষ্টা রাখলে কি সময়ের সদ্ব্যবহার হয় না?

মহারাজ : অনেকভাবেই হয়। আসল কথা aware থাকা, সজাগ থাকা। সজাগ থাকার চেষ্টা করলে অনেকভাবেই হতে পারে। দুঘণ্টা আসনে বসলেও কিছু হবে না, সজাগ থাকতে হবে। আমরা বলি—সময় পাই না! অথচ কত সময় আমাদের অজ্ঞাতসারে—অজান্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা সচেতন, সতর্ক না থাকার দরুন কত সময় আমাদের আঙুল গলে চলে যাচ্ছে! আমরা কি আমাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করছি? সময়ের অপব্যয় কত হচ্ছে, তার হিসেব রাখছি? মনকে কি এক চিন্তায় নিয়োজিত করছি?

—মহারাজ, কিসের চিন্তায় মনকে নিয়োজিত রাখব?

মহারাজ : এক চিন্তায়—মানে, আমরা আমাদের জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করেছি। আমাদের সবটুকু সময়, সকল চেষ্টা কি সেই উদ্দেশ্যের দিকে এগনোর জন্য নিয়োজিত করছি? ভেবে দেখ। প্রত্যেকে নিজের জীবনের অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখ। কত সময় বৃথা চলে গেছে। কত সময় নষ্ট করেছি। শুধু করেছি না, এখনো করছি। ভেবে দেখ, জীবনের একটা উদ্দেশ্য স্থির করতেই জীবনের কতগুলি বছর চলে গেছে! এমন উদ্দেশ্য স্থির করার পরেও কি ঠিকমত সেই উদ্দেশ্যের দিকে এগতে চেষ্টা করছি? যে-চেষ্টা করছি, সেটা যেন এদিক-ওদিক চলে যাওয়ার মতো। সোজা পথে যেতে পারছি না। তাতে ১ মাইল পথ ১০ মাইলের

সময়ে অতিক্রম করতে হচ্ছে এবং তাতে মনের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো এজন্য এখানে আসিনি। তাঁকে পাচ্ছি না বলে, তাঁর দিকে এগতে পারছি না বলে কি মনের মধ্যে ক্ষোভ হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে?

তারপর, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও সময় অনেক নষ্ট হয়। যেমন আমার কথা বলছি—ছেলেবেলা থেকেই সাধু হব, ইচ্ছে। কিন্তু সাধু হওয়া কাকে বলে, ঠিক জানি না। তাই কখনো বড় বড় চুল রাখছি, কখনো বা মুণ্ডন করছি। যেমন আমরা ঠাকুরের ধ্যান করি। ঠাকুর সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা। তা থাকবেই। কারণ, তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। যতই আমাদের পরিবর্তন হতে থাকে ততই আমাদের আদর্শ আরো স্পষ্টতর হতে থাকে। আদর্শ evolve করে। মানে, যেমন দূর থেকে একটা বাড়ি দেখছি অস্পষ্টভাবে, যেন একটা রূপরেখা। যতই বাড়ির কাছে এগচ্ছি, ততই বাড়িটা আমাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে।

—মহারাজ, বলা হয় যতই আমরা আদর্শের দিকে এগতে থাকি, আদর্শ ততই দূরে সরে যায়। এরই নাম কি evolve করা?

মহারাজ : না, evolve করা মানে স্পষ্ট হওয়া। ঐ যে বাড়ির দৃষ্টান্ত দিলাম। evolve করা মানে দূরত্ব বাড়া নয়, দূরত্ব কমে আসা।

॥ ২১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, জপ করার সময় শব্দ না করে বা ঠোঁট, জিব না নাড়িয়ে করতে বলা হয় কেন?

মহারাজ : মনঃসংযমের জন্য। মন যত সংযত হতে থাকবে তত বাইরে ঠোঁট নাড়া বা শব্দ করা বন্ধ হয়ে যাবে। মন একাগ্র হলে এরকম হয়। আর আমরা একাগ্রতার জন্য বিপরীতভাবে শব্দ না করে জপ করি।

—মহারাজ, মালায় জপের আগে কর-এ জপ করে নিতে হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, আমি ঐরকমই বলি। কর-এ জপই শ্রেষ্ঠ। যত বাইরের অবলম্বন নেবে ততই মন ছড়িয়ে পড়বে।

—মহারাজ, অনেক সময় বেশি জপ করার ইচ্ছায় খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কী করব?

মহারাজ : খুব তাড়াতাড়ি করবে না। যেমন বলেছিলাম তেমন গতিতেই করার চেষ্টা করবে। সংখ্যাটাই তো আসল নয়। আসল কথা, ঠাকুরের প্রতি কতটা মন রেখে জপ করলাম সেটা। মনে রাখবে, তোমরা সবাই ঠাকুরের।

প্রশ্ন : মহারাজ, মনই গুরু—একথার তাৎপর্য কী?

মহারাজ : মনই গুরু নয়, শেষে মনই গুরু হয়। অর্থাৎ মন শুদ্ধ হতে হতে শেষে শুদ্ধ মনে যা ওঠে তাই গুরুবাক্য।

—মন শুদ্ধ হয়েছে কী করে বুঝব?

মহারাজ : যে-চিন্তা ও ভাবনাগুলোকে অশুদ্ধ বলে তোমার ধারণা আছে, সেগুলো যখন মনে আর একদম উঠবে না, তখনি বুঝবে মন শুদ্ধ হয়েছে।

—মহারাজ, বাক্‌সংযম কাকে বলে?

মহারাজ : প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা। তখন আমি উত্তরকাশীতে আছি। ঠিক করলাম, অপ্রয়োজনে কথা বলব না। দেখলাম দিন যায়, দিন আসে, আমার কথা বলার প্রয়োজনই হয় না। সত্যিই যদি আমরা সচেতন থাকি, লক্ষ করব, আমাদের কথা বলার প্রয়োজন খুব কমই হয়।

—মহারাজ, ওখানে আপনি একলা ছিলেন বুঝি! (সকলের হাসি)

মহারাজ : তা কেন, অন্য সাধুরাও ছিল।

—ভিক্ষা করতে গিয়ে 'ওঁ নমো নারায়ণ হরি', বলতে হতো না?

মহারাজ : না, তাও বলতে হতো না। ভিক্ষার লাইনে দাঁড়াতাম, ঝুলি পাততাম, ভিক্ষা দিয়ে দিত। গঙ্গার ধারে বসে খেয়ে চলে আসতাম।

—মহারাজ, অন্যান্য সাধুরা কথা বলত না?

মহারাজ : বলত, কিন্তু কেউ কারো সাথে অপ্রয়োজনে বলত না। আর কেউ বেশি বলতে গেলেও ওদিককার সাধুরা বেশি মেশামেশি করত না।

ফলে কথা বলার দরকার খুব কম হতো। আমি মৌন থাকব—এরকম তো প্রতিজ্ঞা করিনি। অপ্রয়োজনে কথা না বলাই বাক্‌সংযম। বাক্ হল সূক্ষ্ম চিন্তার স্থূল বা বাহ্য রূপ। বাক্ সংযম বা রোধ করা সম্ভব। কিন্তু চিন্তাকে রুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন। সর্বদাই চিন্তার স্রোত চলছে। মনকে চিন্তাশূন্য করা দুরূহ। আর আশ্চর্য কী—আমরা সেই চিন্তার স্রোতে ভেসে চলি। অনেকক্ষণ পর যখন সচেতন হই, বলি কী সব মাথামুণ্ডু ভাবছিলাম! অর্থাৎ সতর্ক ছিলাম না। মন আমাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল, আমিও সেইদিকেই যাচ্ছিলাম। মনকে ধীরে ধীরে লক্ষ করলে, মনকে পরখ করলে মনের স্রোত আমাদের টেনে নিতে পারে না। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে। মন আমাদের ওপর আধিপত্য করতে পারে না। আমরা মনের ওপর আধিপত্য করতে পারি। মনের আরেকটা দিক নিয়ে আমি খুব ভাবি। সেটা হল, একই মন দুভাগে বিভক্ত। একটি দ্রষ্টা, অপরটি দৃশ্য। Subject মন আর object মন। Subject মন যখন object মনকে পরখ করে, তখন মনের সঙ্গে আমাদের আর ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বামীজী বলছেন, আসনে বসেই ধ্যান শুরু করবে না। মনকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ কর, মন কী করছে লক্ষ কর। দেখবে ধীরে ধীরে তার ছোটা বন্ধ হয়ে আসবে। মন একাগ্র হবে। তারপর ধ্যান করতে হবে। এরকম করতে করতে হয়ত টিফিনের ঘণ্টা পড়ে যাবে। (সকলের হাসি) তাই বলছিলাম, মনকে চিন্তাশূন্য করা অত্যন্ত কঠিন।

একটি শ্লোকে বলছে—

"আসুপ্তে আমৃতে কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া
দদ্যাৎ নাবসরং কিঞ্চিদপি কামাদীনাং মনাগপি।"

অর্থাৎ, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছি, যতক্ষণ এই দেহ থাকছে ততক্ষণ সর্বদাই মনকে বেদান্ত-চিন্তার দ্বারা পূর্ণ করে রাখতে হবে। কেন? যাতে কামাদি রিপু মনে অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়। পড়, পড়, উপনিষদ্ পড়।

হরি মহারাজ যেন একেবারে খাপখোলা তলোয়ার। শেষের দিকে দেখেছি, তখনো খুব সচেতন। সর্বদা সতর্ক। যেমন ছবিতে বসে আছেন, সেরকম বসতেন, একেবারে সোজা। কখনো কোনকিছুতে ঠেস দিয়ে বসতেন না। সাধারণত কথা খুব কম বলতেন। কিন্তু ধর্মপ্রসঙ্গ খুব করতেন। অনর্গল প্রসঙ্গ হতো। তারপর খুব চিন্তা করতেন। উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোকের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করতেন। বিচার, শাস্ত্রপাঠ, ধ্যানভজন যাই কর না কেন, যেভাবেই হোক, নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। বিরল দু-একজন অসাধারণ অধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রপাঠ দরকার নাও হতে পারে, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণের পক্ষে শাস্ত্রপাঠ, বিচার অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর সত্যরক্ষা সম্বন্ধে বহুবার বলেছেন। কিভাবে তা করা যায়?

মহারাজ : সত্যরক্ষার জন্য যে কতদূর মূল্য দিতে হয় তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তাই সত্যরক্ষা করবই—এরকম প্রতিজ্ঞা করবে না। মনকে বলবে, যতদূর পারি সত্যরক্ষার চেষ্টা করব। এইভাবে সত্যরক্ষা করতে করতে দেখবে, সত্যের জন্য কতদূর ত্যাগের প্রয়োজন।

প্রশ্ন : মহারাজ, যখন বাড়িতে ছিলাম, তখন মনে হতো বাড়িঘর, চাকরি-বাকরি, আত্মীয়-স্বজন—এসব পথের বাধা। এসব তো ছেড়ে এসেছি। এখন কেন সেরকম ব্যাকুলতা হচ্ছে না?

মহারাজ : হুঁ, ব্যাকুলতা গাছের ফল কিনা, ধপাস করে পড়বে! ব্যাকুলতা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় হয়। আর সর্বোপরি তাঁর কৃপা। ঠাকুর বলেছেন, ব্যাকুলতা হলেই অরুণোদয়, ঈশ্বরদর্শনের আর দেরি নেই। ব্যাকুলতা হলে তো হয়েই গেল।

—মহারাজ, মনে খুব জোর আসছে না কেন? খুব ব্যাকুলতা হচ্ছে না কেন?

মহারাজ (খুব স্নেহের স্বরে) **:** কথাটি বারবার চিন্তা করবে, ব্যাকুলতা আসছে না কেন? আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করার সময়ও এটা

বলবে—'ব্যাকুলতা হচ্ছে না কেন? ঠাকুর, আমায় ব্যাকুলতা দাও।' জপ, ধ্যান, প্রার্থনা আরো বেশি করে কর।

—সংঘবদ্ধ জীবনে চলার সহজপাঠ বা রহস্যটা কী?

মহারাজ : খুব কাজ করবে। শুধু নির্ধারিত কাজ তা নয়। দরকার হয় তো নিজে থেকে কাজ চেয়ে করবে। তাহলে কারো কিছু বলার থাকবে না। মনে-প্রাণে কারো প্রতি বিরূপ মনোভাব যেন না থাকে। যদি সত্যিই কারো প্রতি এতটুকু বিরূপ মনোভাব না থাকে, তাহলে কাউকে কিছু কটুকথা ব্যবহার করলেও সে কিছু মনে করবে না। প্রকৃতপক্ষে কোন কটু শব্দমাত্র আমাদের কষ্ট দেয় না। কটু শব্দের সাথে ব্যবহারকারীর বিরূপ মনোভাবই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আঘাত দেয়। তাই দেখা যায়, যাকে সত্যিই আমরা খুব ভালবাসি, তাকে দুটো বকলেও বা আপাত কটু কথা বললেও কিছু মনে করে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, উদ্দেশ্যের দিকে এগচ্ছি কিনা, কী করে বুঝব?

মহারাজ : বোঝার মাপকাঠি তিনটি। প্রথমত, ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা দিন দিন বাড়বে। দ্বিতীয়ত, সংশয় ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে মনে হবে। তৃতীয়ত, উদ্দেশ্যলাভের পক্ষে যাকিছু প্রতিকূল তার প্রতি আকর্ষণ চলে যাবে।

—মহারাজ, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মহারাজ : এটা বোঝা খুব সহজ নয়। এটা বুঝতে মনকে তটস্থ করা প্রয়োজন। মন রঞ্জিত থাকলে এটা ধরা যায় না। মন খুব শান্ত তটস্থ হলে বোঝা যায়। তবু আমি এব্যাপারে যা বলে থাকি তা হচ্ছে, এর তিনটি লক্ষণ আছে। প্রথম, ভক্তি-বিশ্বাস দিন দিন বাড়বে। দ্বিতীয়, ঠাকুর ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকবে। তৃতীয়, উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে।

—ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা বাড়ছে কিনা, এটা বোঝা তো শক্ত। আর এটা তো আমার প্রথম প্রশ্নেরই অন্তর্ভুক্ত।

মহারাজ : হ্যাঁ, ঠিকই। ভক্তি ভালবাসা বাড়ছে কিনা, এটা বোঝাও শক্ত। তবু এটা বোঝার জন্য দ্বিতীয়টা লক্ষ করা দরকার। বিষয়াদির প্রতি আকর্ষণ কমছে কিনা, এটা বোঝা যায়।

—হ্যাঁ, তা বোঝা যায়। মহারাজ, এই যে বললেন, উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্পর্কে ধারণা দিন দিন পরিষ্কার হবে। এটা কি আপনা-আপনি নিজের ভিতর থেকে হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ, নিজের ভেতর থেকে এটা হবে। আসল কথা, পথ খুব দীর্ঘ। আমরা একটু একটু করে এগই। কখনো একটু এগই, কখনো একটু পেছই। এরকম করে কতটা এগলাম, এটা বোঝা খুব শক্ত।

—আচ্ছা মহারাজ, চেষ্টা করলেই কি ব্যাকুলতা বাড়বে?

মহারাজ : তাছাড়া আর কী উপায় আছে বল! চেষ্টা ছাড়া আর কী উপায় হতে পারে?

—না, মাঝে মাঝে মনে হয়, কয়েকজন ভাগ্যবানের জীবনে শুধু ব্যাকুলতা বাড়ে। আমাদের জীবনে যেন তা বাড়বে না!

মহারাজ : আসলে কী জান, আমরা যদি বুঝতে পারি—একটু একটু করে এগচ্ছি, তাহলে ভরসা হয়, সাহস বাড়ে। ধর, যদি একটা সম্পূর্ণ খাড়া পাহাড়ে আমরা ওঠার চেষ্টা করি, তাহলে কিছুতেই এগতে পারব না। কিন্তু যদি একটু চড়াই একটু উতরাই পথে যাই, তবে একটু একটু করে এগচ্ছি বুঝতে পারব। সবচেয়ে বড় কথা, ভরসা রেখে সাধনপথে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাবটা জিইয়ে রাখা। আরেকটা কথা, সংঘজীবনে অন্য একজনকে আন্তরিক চেষ্টা করতে দেখে আমাদের উৎসাহ বাড়ে, সাহস আসে, মনে হয় আমিও চেষ্টা করলে পারব। সংঘজীবনে এটা একটা মস্ত লাভ।

প্রশ্ন : মহারাজ, একদিন বলেছিলেন, সংঘজীবনে বকুনি সহ্য করা একটি বড় গুণ। সেব্যাপারটা একটু বলুন।

মহারাজ : হ্যাঁ, বকা খেতে পারা একটা বড় গুণ। একবার এক সাধু এক ব্রহ্মচারী কী একটা ভুল করেছে বলে খুব বকছে। এত বকছে যে মনে

হচ্ছে, অত্যধিক হয়ে যাচ্ছে। আমার খুব খারাপ লাগছে। ভাবছি, এতটা ঠিক হচ্ছে না। ছেলেটার মাথা বিগড়ে যাবে। ছেলেটা খুব কষ্ট পাচ্ছে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। সাধুটি তো এত বকল, ব্রহ্মচারীটি একটিও উচ্চবাচ্য করল না। শেষে শুধু বলল : মহারাজ, ভুল হয়ে গেছে। এই সরল সহজভাবে দোষস্বীকার করায় আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল, সেকথা এখনো মনে আছে। কোনপ্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা না করে, তর্ক না করে, যুক্তি না দেখিয়ে ধীরস্থিরভাবে, সহজ সরলভাবে দোষস্বীকার করা একটা মস্ত গুণ। এবিষয়ে কালীকৃষ্ণ মহারাজের জীবনের একটা ঘটনা বলি। কে একটা কী দোষ করেছে। স্বামীজী ভেবেছেন, কালীকৃষ্ণ মহারাজ ওটা করেছেন। তাঁকে প্রচণ্ড বকলেন। কালীকৃষ্ণ মহারাজ টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলেন না। পরে কিভাবে স্বামীজী জেনেছেন, দোষটা কালীকৃষ্ণ মহারাজ করেননি। সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে ডেকে বলছেন : "আরে, তোকে যে অত বকলুম, কৈ তুই তো বললি না যে ওটা তুই করিসনি।" কালীকৃষ্ণ মহারাজ ধীরস্থিরভাবে বললেন : "কারো না কারো ওপর দিয়ে ঝড়টা তো যেত।"

॥ ২২ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আর কদিন পরেই তো আমাদের ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা হওয়ার কথা, এবিষয়ে আমাদের কিছু বলুন।

মহারাজ : তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, তোমরা এক গুরুত্বপূর্ণ ব্রত বা সঙ্কল্প গ্রহণ করতে চলেছ। ব্রতগুলো পালন করা খুব সহজ নয়। মনে ব্রতটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা থাকলে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ সার্থক হবে। নতুবা নিয়মমাফিক ব্রহ্মচর্য হবে। তাতে প্রাণ থাকবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে, তিনি যেন এই ব্রতগুলো পালনে সাহায্য করেন। সর্বদা শরণাগত, তাঁর ওপর নির্ভরশীল—এই ভাব বজায় রেখে প্রার্থনা করবে : হে প্রভু, তুমি আমার সহায় হও। তুমি আমাকে দিয়ে ব্রতগুলো পালন করিয়ে নাও।

প্রশ্ন : মহারাজ, এখন এলাহাবাদে পূর্ণকুম্ভ চলছে। আপনি কি কুম্ভে এবং তীর্থাদি পরিদর্শনে যেতেন?

মহারাজ : না, আমি তীর্থে যেতাম না। একবার কুম্ভে ছিলাম। তপস্যা থেকে ফিরছিলাম, কুম্ভ দেখার উদ্দেশ্যে যাইনি। ঐ একবার মাত্র। তীর্থস্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করত না, তবে তপস্যায় গেছি। এক জায়গায় বসে থাকা। আমার যাওয়ার ইচ্ছে হতো না, টাকার জোগাড়ও করতে হতো না। আমরা পাঁচ টাকার টিকিটে ট্রেনে কাশী ও নয় টাকায় হরিদ্বার গেছি। ঐ কটা টাকাও জোগাড় করা খুব কষ্টকর ছিল। একবার মাইসোর স্টাডি সার্কেল থেকে ফিরছিলাম, মাদ্রাজ হয়ে। সঙ্গের সাধুটির খুব ইচ্ছা দক্ষিণের তীর্থাদি কিছু দেখবে। আমাকেও সঙ্গে নিতে চায়। খুব পীড়াপীড়ি করলে আমি জানালাম, আমার কোন টাকা নেই। সেকথা শুনে মাদ্রাজ মঠের ক্যাশিয়ার স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ বললেন : "তুমি যাও। আমি অফিস থেকে টাকা দিচ্ছি।" আমি বললাম : "আমি কোনদিন মাদ্রাজ মঠে কাজ করিনি। ভবিষ্যতে এখানকার কর্মী হব বলেও মনে হয় না। এখান থেকে টাকা নেওয়াটা তাই ঠিক হবে না।" তখন সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বললেন : "আমার নিজের টাকা থেকে দিচ্ছি, তুমি যাও।" এরকম জোরাজুরি করাতে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল। কাছাকাছি দু-একটা তীর্থ ঘুরে খুব জ্বর এল। সঙ্গের সাধুটিকে বললাম : "অসুস্থ শরীরে তোমার সঙ্গে ঘুরে তোমায় বিরক্ত করব না। আমি মাদ্রাজ চললাম।" মাদ্রাজ এসে হাতে যা টাকা ছিল, ফেরত দিয়ে দিলাম। তারপর মঠে ফিরে আসি।

প্রশ্ন : মহারাজ, বৈরাগ্য কিভাবে বজায় থাকে বা বাড়ানো যায়?

মহারাজ : বিচারের দ্বারা।

—সেরকম জীবন না দেখলে কি হয়?

মহারাজ : কেন? এটা (হাত দিয়ে নিজের মাথা দেখিয়ে) কি নেই? যদি বিচার করা যায় কেন এসেছি, জীবনের উদ্দেশ্য কী—সেটি লাভ করার আগ্রহ যদি থাকে, তাহলে ওসব ঠিক থাকবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা তো গায়ত্রীমন্ত্র পেয়েছি, তা তো জপ করি, তার ধ্যান করতে হবে?

মহারাজ : গায়ত্রীর ধ্যান আছে, তবে সেসব জটিল ব্যাপার। তোমাদের করতে হবে না। যেমন বলেছি, ১২ বার জপ করবে। বলে, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা জপতে হয়। সকাল, দুপুর আর সন্ধে—এই তিনবেলা। তা তোমরা আশ্রমে দুপুরে কাজেকর্মে থাকবে। হয়ত তখন করার সময় বা সুযোগ পাবে না। তোমরা দুবেলাই করো। সকাল আর সন্ধ্যা। তবে দুপুরে সময়-সুযোগ পেলে করতে পার। সকাল-সন্ধেয় জপ শুরুর আগে, গুরুর ধ্যানের আগে ১২ বার গায়ত্রী জপে নেবে। যান্ত্রিক জপ যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবে। এটা যেভাবে প্রার্থনা করে, তেমনভাবে ভাববে ও করবে। 'সবিতুঃ' বলতে বোঝায় পরমেশ্বর। তিনি ব্রহ্ম না অন্তর্যামী—এসব ভাবার দরকার নেই। পরমেশ্বর অর্থাৎ যাঁর থেকে এই সৃষ্টি হয়েছে, তিনি যেমনই হোন তাঁকে ভাবতে অসুবিধা হলে ঠাকুরকেই ভাববে।

—মহারাজ, ১২ বার তো কমপক্ষে। বেশি করার ইচ্ছে হলে করব?

মহারাজ : ১২ বারই করো। প্রত্যেক বার জপ-ধ্যানের আগে ১২ বার। ওটাই সর্বনিম্ন, ওটাই সর্বোচ্চ। যদি বেশি করতে চাও, ইষ্টমন্ত্র বেশি করে করবে। আমি গায়ত্রীতে বেশি জোর দিই না। ইষ্টমন্ত্রেই বেশি জোর দিতে হয়।

—মহারাজ, সন্ন্যাসের পরেও কি গায়ত্রী জপ করা যায়?

মহারাজ : এরকম প্রশ্ন আমি আমার দীক্ষার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজকে করেছিলাম। দীক্ষার আগেই আমার উপনয়ন হয়েছিল। গায়ত্রী জপতাম। ভাবলাম এখন ইষ্টমন্ত্র পেয়েছি, এখন কি আর গায়ত্রী জপতে হবে? মহারাজ বললেন : "তোমার কি গায়ত্রীদর্শন হয়ে গেছে?" বললাম : না।—"তবে? জপবে।"

প্রশ্ন : মহারাজ, উপবীত ধারণ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ কিছু বলুন।

মহারাজ : উপবীত অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত। উপবীত ধারণ করার অর্থ হল যজ্ঞে অধিকার পাওয়া। খুব সাবধানে ও শ্রদ্ধার সাথে উপবীত ব্যবহার করবে।

দেখবে যেন নাভির নিচে না যায়। শৌচাদির সময় ডান কানে পেঁচিয়ে রাখবে। ডান কান হল তীর্থের স্থান। অনেকে গলায় পেঁচিয়ে রাখে, তা রাখতে পার। কিন্তু উপবীত খুলবে না বা কোমরে পেঁচাবে না। পরিষ্কার রাখবে। সাবান দিয়ে ধোবে। ধোওয়ার সময় গায়ে রেখে বা আঙুলের মাথায় রেখে ধোবে। একেবারে খুলে ধোবে না। আর যখন উপবীত ছিঁড়ে যাবে তখন ওটা পরিত্যাগ করে অপর একটি ধারণ করবে। পরিত্যাগের সময় দেহের নিচ থেকে ওটাকে বের করে—পারলে, গঙ্গায় বিসর্জন দেবে। পরিত্যাগের আগে অপর একটি উপবীত গ্রন্থি দিয়ে তৈরি করে রাখবে। গ্রন্থির অনেক নিয়ম আছে। উপবীত খুব সাবধানে ব্যবহার করবে। যথোপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে একে গ্রহণ করতে না দেখে মাঝে মঠ-কর্তৃপক্ষ উপবীত দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর আবার চালু হয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, গীতার কর্মযোগ এবং স্বামীজী-প্রবর্তিত কর্মযোগের মধ্যে পার্থক্য কী?

মহারাজ : অনেক পার্থক্য। গীতার কর্মযোগ মানে নিষ্কাম কর্ম। তাতে নঞর্থক ভাব রয়েছে। স্বামীজীর কর্মযোগও নিষ্কাম কর্ম। তবে শুধু অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা নয়, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার সাথে জীবের বা জগতের সেবা করাও উদ্দেশ্য। আবার শুধু জীব নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা। এটি স্বামীজীর সদর্থক ভাব। গীতায় কোথাও জীবকে সেবার কথা আছে? আবার এই সেবা সমাজ সংস্কারকদের মতো জগতের উপকার করা নয়। তাদেরটাও নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি। জগতে এইসকল অপূর্ণতা আছে, সেগুলো দূর করা স্বামীজীর উদ্দেশ্য। স্বামীজীর কর্মযোগে সেবার ভাবটি নতুন এবং সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা। অনাসক্তি অভ্যাস হচ্ছে, আবার জীবের সেবাও হচ্ছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, বিশিষ্টাদ্বৈত কাকে বলে?

মহারাজ : বিশিষ্ট অদ্বৈত। বিশিষ্ট মানে কী? মানে—যা অন্য কিছু থেকে একটিকে পৃথক করে। তেমনই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত শঙ্করের অদ্বৈত থেকে পৃথক—আলাদা অদ্বৈত। অদ্বৈত এখানে বিশিষ্ট। কিভাবে বিশিষ্ট?

"চিদ্ অচিদ্ বিশিষ্টয়োঽদ্বৈতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতঃ।" সেটাই 'চিদ্', সেটাই 'অচিদ্'—দুইই এক। এ দুটি আলাদা নয়। চিৎও সেই পরমেশ্বর, অচিৎও সেই পরমেশ্বর। চিদচিৎ সকলই সেই পরমেশ্বর। তবে চিৎ, অচিৎ তাঁর অংশ। এই জগৎ চিৎ-অচিৎ, তাঁর দেহ বা শরীর, তিনি শরীরী। সেইভাবে এক এবং অদ্বৈত। জগতে যত চেতন পদার্থ ও অচেতন পদার্থ আছে—সবই তাঁর অংশ বা শরীর। "জীব-জগৎ বিশিষ্টয়োঃ ব্রহ্ম"—এখানে ব্রহ্ম জীবজগৎবিশিষ্ট।

॥ ২৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, শ্রীমা বলেছেন নির্বাসনা; নির্বাসনা হলেই মুক্তি। এটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

মহারাজ : হ্যাঁ, আমিও ভক্তদের এইরকম বলি। খানিকক্ষণ চুপ করে হঠাৎ আমি বলি, অশান্তি দূর করার সহজ উপায় আছে। শুনেই যেন তারা হকচকিয়ে যায়! উৎকর্ণ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করে। আমি বলি, অশান্তি দূর করার সহজ উপায়—কিছু চেয়ো না, আশা করো না। এই উত্তর বা সহজ উপায় শুনে অনেকেই মুখ ব্যাজার করে। আসলে তাই, যত চাওয়া থেকেই অশান্তি।

—মহারাজ, বাসনার মূল কী?

মহারাজ : অপূর্ণতাবোধ— awareness of imperfection. যখনি আমি নিজেকে অপূর্ণ মনে করি, তখনি তা পূর্ণ করার ইচ্ছা করি। নিজেকে যদি মনে করি, আমি পূর্ণ, তাহলে কোন অভাববোধ থাকে না। আর পূর্ণ করার কথাও ওঠে না। আপ্তকামের বাসনা কোথায়?

—মহারাজ, সব বাসনাই কি পূর্ণ হয়?

মহারাজ : না।

—তবে উপায়?

মহারাজ : হা-হুতাশ করা, নতুবা অভাববোধ দূর করা।

—মহারাজ, এই অভাববোধ কিভাবে দূর হবে?

মহারাজ : উচ্চতর কিছু পেলে নিচেরটা আপনা থেকেই ত্যাগ হয়ে যায়। গুড় খেতে খেতে চিনি খেতে ইচ্ছে হয়। চিনি খেলে গুড় খেতে ইচ্ছে হয় না, সেইরকম। অতএব উচ্চ জিনিস যেটা সেটাই আকাঙ্ক্ষা করা ভাল।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন : "যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ; তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" ঠাকুর 'বেদান্তের দিক দিয়ে' কেন বললেন?

মহারাজ : বেদান্তের দিক থেকে সকলেই ব্রহ্ম। রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ—সকলেই সেই এক ব্রহ্ম। কিন্তু যে-ব্যক্তি রাম, যে-ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ—সেই ব্যক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। এখানে বেদান্তের তত্ত্ব যে সেই এক, সেদিক থেকে এক নয়। ব্যক্তি হিসেবে এক।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের (সাধু-ব্রহ্মচারীদের) ভক্তদের প্রতি কিরকম মনোভাব থাকা উচিত?

মহারাজ : মনোভাব থাকা উচিত এইরকম—তারাও ঠাকুরের ভক্ত, আমরাও ঠাকুরের ভক্ত। তারা ভগবান লাভের চেষ্টা করছে সংসারে থেকে, আর আমরা বাইরে থেকে।

একবার একজন ভক্ত কোন ব্রহ্মচারীকে চেয়ার এগিয়ে দিতে বলেছিলেন। এতে ব্রহ্মচারী খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়, কেননা সে ভেবেছিল, গৃহী হয়ে সেই ব্যক্তি তাকে চেয়ার আনতে আদেশ করছেন। একথা সে বাবুরাম মহারাজকে চিঠি লিখে জানায়। বাবুরাম মহারাজ উত্তরে লেখেন : "আমাদের ঠাকুর মান-যশের জন্য আসেন নাই। তোমরাও মান-যশের কাঙ্গাল হইও না।" মালী মনে করে ঠাকুরকে ফুল তুলে দেওয়ার যে-আদেশ যোগীন মহারাজ করেছিলেন—সে-ঘটনাও এইরকম।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্থিতপ্রজ্ঞ ও গুণাতীত কি একই?

মহারাজ : স্থিতপ্রজ্ঞ হলে গুণাতীত হয়, আবার গুণাতীত হলে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। দুটোর লক্ষণ একই। কিন্তু শব্দ দুটো তো এক নয়। স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ যাঁর প্রজ্ঞা স্থির। তাঁর প্রজ্ঞা আর বিচলিত হয় না। আর গুণাতীত মানে তিন গুণের অতীত।

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ-স্তদোচ্যতে॥" (গীতা, ২।৫৫)

স্থিতপ্রজ্ঞের অনেক লক্ষণ বলা হয়েছে। সিদ্ধের লক্ষণগুলি সাধকের সাধন করা উচিত। সাধন করতে করতে সাধক সেগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধ হয়। সাধন অবস্থায় সেগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না, কিন্তু সিদ্ধ অবস্থায় সে তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর বিচলিত হয় না।

প্রশ্ন : 'হিরণ্যগর্ভ' বিষয়ে কিছু বলুন।

মহারাজ : হিরণ্যগর্ভে পড়ে গেল, গল্পটা জান?

—না মহারাজ, জানি না। বলুন ব্যাপারটা।

মহারাজ : ঢাকায় তখন শুভানন্দজী আছেন। একদিন ওখানকার দুজন পণ্ডিত এসেছেন মহারাজের সাথে তর্ক করবেন বলে। মঠের দুজন সাধুর ইচ্ছা, মহারাজের যেন জিত হয়। যাই হোক, তর্ক শুরু হল। এদিকে দুজন সাধুর একটু কাজে বাইরে যাওয়ার দরকার, কিন্তু যেতে সাহস হচ্ছে না। তর্কে শেষপর্যন্ত কী হয় তা দেখার ইচ্ছে। আলোচনা চলতে চলতে হিরণ্যগর্ভের প্রসঙ্গ এল এবং ঐ দুই সাধুর একজন অপরজনকে বলছে : "চল, চল হিরণ্যগর্ভে পড়ে গেছে।" মানে, মহারাজ হিরণ্যগর্ভের আলোচনায় expert। এখন আর ওঁকে কেউ হারাতে পারবে না!

যাই হোক, গর্ভ মানে জঠর। জঠরস্থ সন্তান। হিরণ্য মানে প্রথম সৃষ্ট জীব। হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তির কথা আছে জান তো? এটা কোন post বা পদ নয়। শাস্ত্রে এ নিয়ে মজার প্রশ্ন আছে। হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তি কি seniority-তে হয়? না। কিভাবে হয়? অনেকে চেষ্টা করছে হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তির জন্য। এটা যদি একটা পদ হয়, তবে সকলে তো একটা পদে আসীন হতে পারবে না। তারপর, একজন হিরণ্যগর্ভের জীবৎকাল বহু কল্প। তাই একবার কেউ হিরণ্যগর্ভ-পদে বসলে অন্যদের আর শিগগিরই আশা নেই। আসল কথা—হিরণ্যগর্ভ কোন পদ নয়, একটা অবস্থা। তাতে যাঁরা উপযুক্ত আধার, তাঁরা সকলে একাত্ম হন। হিরণ্যগর্ভের

সঙ্গে একাত্ম যদি হয় তবে একসঙ্গে একাধিকের একাত্মতার কোন অসুবিধা নেই। আবার হিরণ্যগর্ভ হচ্ছে সমষ্টি জীব। সমষ্টি জীব মানে আঁটি বাঁধার মতো সমষ্টি নয়। একটা একটা করে আঁটি বেঁধে সমষ্টি নয়। সব মিলিয়ে একটি মাত্র।

প্রশ্ন : গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় ভগবানের জন্ম সম্পর্কে শঙ্করাচার্য বলছেন : "দেহবান্ ইব, জাত ইব।" জন্মকে স্বীকার করলে কী আপত্তি হয় মহারাজ?

মহারাজ : যিনি নিত্য, তিনি কী করে অনিত্য হবেন? এই আপত্তি।

—তাহলে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি?

মহারাজ : না।

—তবে তিনি যে লোকানুগ্রহ করেছেন! জন্ম হয়নি অথচ লোকানুগ্রহ করছেন—এ কী করে সম্ভব?

মহারাজ : অত খুঁত ধরলে কি চলে? (হাসি) 'চণ্ডী'তে আছে, মেধা ঋষি রাজা সুরথকে বলেছিলেন :

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তিৰ্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"

(চণ্ডী, ১।৬৪-৬৫)

তিনি নিত্যা ও জগন্মূর্তিস্বরূপা। তৎকর্তৃক এই সমস্ত ব্যাপ্ত। তা হলেও তাঁর বহুপ্রকার উৎপত্তি আমার কাছে শুনুন। দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, তখন তিনি নিত্যা হলেও উৎপন্না বলে অভিহিতা হন।

—মহারাজ, আমরাও তো প্রকৃতপক্ষে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব আত্মা। আমাদেরও তো জন্ম হয়েছে। আমাদের জন্মও কি এভাবে বুঝতে হবে?

মহারাজ : না, যে নিত্য-শুদ্ধ 'আমি'—তার জন্ম হয়নি। তার জন্ম হয় না। দেহাভিমানী যে-জীব, তার জন্ম হয়েছে।

—এই জীব তো আমরাই, যখন আমাদের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারব তখন বুঝব, আমরা নিত্য-শুদ্ধ। তাহলে এই জীবই প্রকৃতপক্ষে আত্মা।

মহারাজ : না, জীবত্ব ঘুচে গেলে যা থাকল তাই আত্মা। জীবই আত্মা নয়। জীব এবং নিত্য-শুদ্ধ আত্মা—এদুটি আমরা একসঙ্গে চিন্তা করি, কল্পনা করি। এটাই মায়া বা মিথ্যা।

প্রশ্ন : মহারাজ, 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'—এই ভাব আমরা আমাদের জীবনে কিভাবে অনুশীলন করতে পারি?

মহারাজ : ভাববে, ঠাকুর বলেছেন একথা।

—কিভাবে ভাবব? প্রক্রিয়াটা কী? বারবারই যে অভিমানটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

মহারাজ : এই অহংকে, অভিমানকে খর্ব করতে হবে। কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীর উপাখ্যান রয়েছে। অগ্নি (জাতবেদা), বায়ু (মাতরিশ্বা) এবং স্বয়ং ইন্দ্রের গর্ব হয়েছিল; ভেবেছিলেন তাঁরা নিজেদের শক্তিতেই শক্তিমান। কিন্তু ব্রহ্ম যখন তাঁদের শক্তির পরীক্ষা নিলেন, তখন তাঁরা একটা সামান্য খড়কুটোকেও দগ্ধ করতে বা স্থানচ্যুত করতে পারলেন না। তাঁরা বুঝতে পারলেন তাঁদের শক্তি কতটুকু। সেইরকমভাবে আমাদেরও বিচার করে বুঝতে হবে আমার নিজের ক্ষমতা বা শক্তি কতটুকু। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

—তাহলে, যখন যখন অহঙ্কার অভিমান আসে, তখন এরকম করে ভাবব?

মহারাজ : তাছাড়া আর কী? দেবতারা ভেবেছিলেন, আর তুমি ভাববে না?

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন, শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এবার ঠাকুরের নিরক্ষর হয়ে আসা। এর মানে কী?

মহারাজ : হ্যাঁ, ঠাকুর শাস্ত্র না পড়েই শাস্ত্রের মর্ম অনুভব করেছিলেন। তাতে শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার সত্যতা প্রমাণিত হল।

—কেন, শাস্ত্র পড়েও তো অনুভব করা যেত। শাস্ত্র পড়লে কি আর অনুভব করা যায় না?

মহারাজ : সেটা বুদ্ধির কসরত হতো, বৌদ্ধিক অনুভব হতো। আর শাস্ত্র না পড়ে সরাসরি অনুভব করায় সেটা প্রত্যক্ষ অনুভব হল—মানে, immediate। আর শাস্ত্র পড়ে করলে সেটা immediate হতো না। Mediate অর্থাৎ শাস্ত্রের সাহায্যে। একটা immediate, আরেকটা mediate। শাস্ত্রের সাহায্যে করলে আর সেটা immediate হয় না। বুঝেছ?

—হ্যাঁ, বুঝেছি মহারাজ।

প্রশ্ন : স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন, সন্ন্যাস না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কেন?

মহারাজ : দুটো কথা আছে। একটা বৈধী সন্ন্যাস, আরেকটি সন্ন্যাস অবস্থা। সন্ন্যাস অবস্থা না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। স্বামীজী এই সন্ন্যাস অবস্থার কথা বুঝিয়েছেন।

॥ ২৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, কথামৃতে আছে, বোধে বোধ হওয়া। এর মানে কী?

মহারাজ : মন যখন শুদ্ধ হতে হতে এমন হবে যে, ভগবান আর আমার মধ্যে কোন আবরণ থাকবে না, যেমন ঠাকুর বলেছেন—পরদা স্বচ্ছ হতে হতে এমন স্বচ্ছ হল যে, আর পদার্থ নেই, এখন যা আছে তাই। আর তখনি বুদ্ধি শুদ্ধ। সেই শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক—ঠাকুর বলেছেন। এই অবস্থায় শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মাকেই বোধে বোধ করে। ঠাকুর এভাবেই সহজ করে বিষয়টা বলেছেন। এটিই দার্শনিকরা হলে বলবেন, ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয়ে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ভিন্ন অন্য সকল বৃত্তির লয়। এসব কথায় কি বোঝা গেল? কিছুই বোঝা গেল না। এ শুধু কথার কথা, কথার বাগাড়ম্বর। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি কী? ব্রহ্মের কি আকার আছে, হাত-পা আছে যে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি?

—মহারাজ, ব্রহ্ম একটা ধারণা।

মহারাজ : হ্যাঁ, একটা ধারণা। আকার মানে, যা কোন জিনিসকে অন্য সমস্ত জিনিস থেকে পৃথক করে।

—তাহলে সেটা তো উপাধি হয়ে গেল।

মহারাজ : হ্যাঁ, অন্য সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে উপাধি, কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে তো উপাধি থাকবে না। কোন কিছুর দ্বারা ব্রহ্ম অবচ্ছিন্ন নয়। এটাই ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য। উপাধি বা অবচ্ছেদক না থাকাটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রের আলোচনায় এই 'অবচ্ছেদক', 'অবচ্ছিন্ন' কথাগুলো ব্যবহার করে করে মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এগুলো কেন ব্যবহার করে জান? অভ্যাস করার জন্য। অন্য সব উপাধিকে বাদ দিয়ে দিয়ে একেবারে নিরুপাধিক অবস্থা চিন্তনের অভ্যাস করার জন্য।

প্রশ্ন : মহারাজ, সেদিন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা হচ্ছিল। বলছিলেন যে, তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে কে কার সেবা করবে? সেখানে সেব্য-সেবক, জীব-শিব থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ না তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ সেব্য-সেবক, জীব-শিব রয়েছে। কিন্তু ঠাকুর, স্বামীজী যখন সেবা করছেন—যেমন ধরুন, ঠাকুর ছেলেদের খাওয়াচ্ছেন, কথা বলছেন; আবার বলছেন, আমি এদের সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখছি। এ কী করে সম্ভব হচ্ছে? সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখছেন মানে তখন তিনি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত আবার সেবাও করছেন—এ কী করে সম্ভব?

মহারাজ : ঠাকুরের কথা আলাদা। ঠাকুর এগুলো দেখাবেন বলে মা তাঁর ভেতর একটু লোককল্যাণের জন্য 'আমি' রেখে দিয়েছিলেন। সেই যে ঠাকুর একদিন মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞেস করছেন, বল তো আমার মধ্যে কতটা অহং আছে? মাস্টারমশায় সানুনয়ে বলছেন, আপনার মধ্যে অহং নেই বললেই চলে। তবে আপনি লোককল্যাণের জন্য একটু রেখে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তাঁকে শুধরে বলছেন, না—আমি রাখিনি, মা রেখেছেন। তবেই বোঝ। একথার মধ্যেই তোমার প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। মা জগৎকল্যাণ করবেন বলে তাঁর মধ্যে একটু অহং রেখেছেন, তিনি রাখেননি। আর সেই অহং শুদ্ধ। সেটুকু দিয়েই তিনি লোক-ব্যবহার করছেন, কথা বলছেন, সেবা করছেন। গোপীরা রাধাকে বলছে, তোর বড় অহঙ্কার। রাধা জোর করে বলছেন, এ অহং কার? এ অহং তাঁর—অর্থাৎ কৃষ্ণের।

প্রশ্ন : মহারাজ, অনেক সময় সাধক অনেক এগিয়েও যেন আর এগতে পারেন না। কোথাও যেন আটকে যান। কেন এমন হয়?

মহারাজ : এটি অহং।

—মহারাজ, সাধক যে-পথটুকু অতিক্রম করল, সেটুকু তো ঐ অহং-এর দ্বারা করল।

মহারাজ : সেটি শুদ্ধ অহং।

—মহারাজ, কিছু টের না পেলে, একটু না বুঝলে শুধু শুনে আর বিশ্বাস করে কি এগনো যায়!

মহারাজ : তাই তো, ঠিক বলেছ। কিন্তু কী করবে বল। আমাদের হাতে যা পুঁজি বা মূলধন আছে, তাই নিয়েই তো এগতে হবে। যা নেই তা ভেবে কী হবে!

—অর্থাৎ, কিছু দেখলেও কী বিশ্বাস হবে? ভাবব মাথার খেয়াল।

মহারাজ : তাই। সেখানেও সংশয় আসবে। মা দেবকীকে ভগবান কারাগারে তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখা দিলেন। দেবকী বলছেন, তুমি এই রূপ সংবরণ কর, নতুবা কংসের চরেরা দেখলে তোমায় মেরে ফেলবে। কৃষ্ণ তাঁর কাছে তনয়, শিশু। তিনি মা, তাই এই বাৎসল্য। আমি না হলে গোপালকে কে দেখবে? এই অহং, এই মমতা।

প্রশ্ন : মহারাজ, ভক্তের ভগবানকে নিয়ত স্মরণ-মনন এবং জ্ঞানীর নেতি নেতি কি এক?

মহারাজ : এক। কিন্তু একটি সদর্থক, আর অপরটি নঞর্থক। ভক্ত সদর্থক দৃষ্টিতে ভগবানের পাদপদ্মকে আশ্রয় করার চেষ্টা করছে। আর জ্ঞানী 'এটা নয়, এটা নয়' করে সবকিছুকে বাদ দিয়ে দিয়ে তত্ত্বকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা যে-কাজ করি, তার ফল ভগবানে সমর্পণ করি, এর বহিঃপ্রকাশ আমাদের জীবনে কিরকম হবে?

মহারাজ : কাজের ফল কিছু চাইব না। ব্যাস্।

—ঠিক ঠিক সমর্পণ করছি কিনা বুঝব কী করে?

মহারাজ : ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে করছি। তাঁর প্রীত্যর্থে যদি করি, নিজের স্বার্থ থাকবে না। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য করছি, আবার নিজের প্রীতিও খুঁজছি—এ হবে না। এটাই পরিমাপক। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন :

"কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স ৰূদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥"

(গীতা, ৪।১৮)

—মহারাজ, কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শনটা কী?

মহারাজ : এই যে দেখ না, হাত-পা গুটিয়ে, চোখ বুঝে আছি। (মহারাজ হাতদুটো কোলের ওপর রেখে চোখ বুজে দেখালেন) মনে করছি, কিছু করছি না। কিন্তু এটাও কর্ম। মনের মধ্যে কত সঙ্কল্প-বিকল্প আছে। আবার জ্ঞানী যখন কর্ম করেন, সেটা কর্ম নয়। কারণ, সে জানে যে, সে অকর্তা। কর্তৃত্ববুদ্ধি তার নেই। অতএব কর্ম তার নেই।

—মহারাজ, কর্ম থেকেই তো বন্ধন।

মহারাজ : হ্যাঁ। আর হাত-পা গুটিয়ে থাকলে বন্ধন নয়?

—হাত-পা গুটিয়ে থাকলে, কিছু না করলেও বন্ধন?

মহারাজ : আরো বেশি বন্ধন। বন্ধনের কারণ অহঙ্কার। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে যেমন অহঙ্কার হবে যে, আমি কিছু করি না, আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি। (হাসি)

একবার একজন সাধুর মনে হল, কাজকর্ম থেকেই অহঙ্কার আসে। অতএব, কাজকর্ম আর করব না। শুধুই জপ-ধ্যান করব। তিনি এই মর্মে চিঠিতে জানালেন পূজনীয় হরি মহারাজকে। হরি মহারাজ উত্তরে লিখলেন, হুঁ, কাজকর্ম না করলেই তুমি ভেবেছ তোমার অহঙ্কার চলে গেল!

—মহারাজ, গীতায় আছে—"আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।" এখানে 'কার্যং' বলতে কি কর্তব্য-কর্ম বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : পুরো শ্লোকটা বল।

—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥" (গীতা, ৩।১৭)

মহারাজ : হ্যাঁ, 'কার্যং' বলতে কর্তব্যকর্মকে—কার্যকে বোঝাচ্ছে। তার কোন কর্তব্য নেই। কর্তব্যকর্ম মানে বিধি-কর্ম। এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন না :

"ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥" (গীতা, ৩।২২)

তাঁর কোন কর্তব্য নেই। কতরকম বিধি আছে—'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ', 'সোমেন যজেত', 'স্বর্গকামো যজেত'—এরকম। এগুলো সব বিধি, সব লিঙ্ প্রত্যয়।

—মহারাজ, লিঙ্ প্রত্যয়ের সব বিধি কি সকাম কর্ম? এর সঙ্গে কি নিষ্কাম কর্মের কিছু সম্পর্ক আছে?

মহারাজ : না, এ সবই সকাম কর্মের বিধি। এটা করলে এটা পাবে, ওটা করলে ওটা পাবে ইত্যাদি। নিত্যকর্ম, সন্ধ্যা-বন্দনাদি সম্পর্কেও বলা হয়েছে, এগুলো করতে হবে। সরাসরি কী ফল হবে, তা বলা নেই। কিন্তু বলা হয়েছে, না করলে দোষ হবে—অকরণে প্রত্যবায় হবে। সুতরাং এগুলো করতে হবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। এর অর্থটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

মহারাজ : ভাষায় যতটা প্রকাশ করা যায়, বেদ-বেদান্ততে ততটাই লেখা আছে। কিন্তু অনুভূতি আরো গভীর। সব প্রকাশ করা যায় না, সম্ভব নয়।

—তা শুধু ঠাকুর কেন, একথা তো যেকোন সাধকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মহারাজ : তা প্রযোজ্য। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এটা মান কি না?

—নিশ্চয়ই।

মহারাজ : তবে? ঠাকুর তো বলেননি, এটা শুধু তাঁর। অন্যের এরকম অনুভূতি হবে না—একথা তো ঠাকুর কখনো বলেননি।

—মনে হতো, অন্যান্য অবতার বা সাধকদের চেয়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতা ও ব্যাপকতা বেশি। তাই একথাটা বলা হয়।

মহারাজ : না না, ওরকম অর্থ ঠাকুরের কথা থেকে তো পাই না। ঠাকুরের কথা ধরতে হবে। ওরকম কথা ঠাকুর বলবেন না।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা দীক্ষা নিয়েছি। গুরু সাধনপ্রণালী বলে দিয়েছেন। এটা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু এবং ভগবানলাভ হল চূড়ান্ত লক্ষ্য। এখন এর মাঝে আমাদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন বা অবস্থান্তর ঘটবে?

মহারাজ : পরিবর্তন এই ঘটবে—আমরা আদর্শানুরূপ হব। আদর্শের মতো হব। যেমন, ঠাকুর যদি আমাদের আদর্শ হন, আমাদের জীবনও ক্রমে তাঁর মতো হবে। অর্থাৎ আমরা তাঁর মতো পবিত্র, আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন হব।

প্রশ্ন : মহারাজ, সমাধি ছাড়া জ্ঞানলাভ সম্ভব?

মহারাজ : হ্যাঁ, সম্ভব। জ্ঞান তখনি হয় যখন অজ্ঞান নিরস্ত হয়। তা সমাধি হয়ে হোক, আর অন্যভাবে হোক। জ্ঞানের লক্ষণ হল, তা সংশয়-বিপর্যয়রহিত হবে। তবেই জ্ঞান হল। আর সমাধি, সে তো যোগের পথ।

—মহারাজ, অদ্বৈত বেদান্ত তো জ্ঞানের পথ?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তবে অদ্বৈত (বেদান্ত) সাধনার শেষে যে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হল?

মহারাজ : সেটা শুধু জ্ঞানের পথে হয়নি। যোগও তাতে রয়েছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজীকে অনুসরণ করে মহাপুরুষ মহারাজ এক জায়গায় বলেছেন, "ঠাকুর এবার তাঁর সাধনের দ্বারা ব্রহ্মকুণ্ডলিনী জাগিয়ে দিয়েছেন। এবার যে একটু করবে, তারই হবে।" ব্রহ্মকুণ্ডলিনী জাগানোটা কী মহারাজ?

মহারাজ : ব্রহ্মকুণ্ডলিনী বলে যে আলাদা কিছু আছে তা নয়; যেভাবে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হতে পারে—সে-পথ বা উপায় ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন।

এসব তন্ত্রের ধারণা। আসলে মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন : "স্বামীজী বলতেন—'জানিস, এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রতা হয়েছেন।'" প্রকৃতপক্ষে, ঠাকুরের সাধনায় জগতে এক মহাজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।

॥ ২৫ ॥

প্রশ্ন : শ্রীশ্রীমা এক জায়গায় প্রশ্ন করছেন—গুরু কে? আবার নিজেই উত্তর দিচ্ছেন—যিনি জীবের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান জানেন।

মহারাজ : আমরা কিন্তু সেই গুরু নই। কারণ, আমরা জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ জানি না। বলতেও পারব না। এসব কথা আমি দীক্ষার সময়ে স্পষ্ট করে বলে দিই।

—ভূত-ভবিষ্যৎ জানেন কিনা, এরকম জিজ্ঞাসাও করে?

মহারাজ : বাবা, জিজ্ঞাসা করার আগেই বলে দিই। (হাসি) আগে থেকেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখি। ওরকম গুরু আমরা নই। (হাসি) ঠাকুরের কথা দিয়েই বলি যে, মানুষ কখনো গুরু হতে পারে না। গুরু এক সেই সচ্চিদানন্দ। তাহলে মানুষ-গুরু কী? মানুষ-গুরু সেই সচ্চিদানন্দ গুরুর প্রতীক। প্রতীক বা প্রতিমা যেমন মাটি, ইট, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি, তা দেবতা নয়, ঠিক সেইরকম মানুষ-গুরু সচ্চিদানন্দ গুরুর প্রতীক। সেই সচ্চিদানন্দ গুরুই জীবকে কৃপা করেন। তাহলে মানুষ-গুরু কী করেন? যেহেতু সাধারণ মানুষ সর্বদা সচ্চিদানন্দ গুরুর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পায় না, তাই সচ্চিদানন্দ গুরুর নির্দেশ মানুষ-গুরুর মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছায়। মানুষ-গুরু মাধ্যম মাত্র। তাঁকে অবলম্বন করে বা আশ্রয় করে সচ্চিদানন্দ গুরু জীবকে নির্দেশ দেন ও কৃপা করেন। গুরুকে বলা হচ্ছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি। মানুষ-গুরু তো আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু নন, তা হতেও পারেন না। এগুলো সব সচ্চিদানন্দ গুরুকেই নির্দেশ করে। মানুষ কখনো গুরু হতে পারে না। কারণ, গুরু নিত্য। মরণশীল যে-গুরু, তিনি কিভাবে নিত্য হবেন? গুরুর ধ্যান করতে হয়। গুরুর মৃত্যুর পর কি গুরু

রয়েছেন যে, তাঁর ধ্যান করব? আর মৃত যিনি, তাঁর ধ্যান করে কী হবে? মানুষ-গুরু সচ্চিদানন্দ গুরুর প্রতীক মাত্র। তাঁর বিনাশ আছে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ গুরু নিত্য।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন, এখানে ছোকরা যারা আসে তাদের দুটি জিনিস জানলেই হবে। তাহলে আর বেশি সাধন-ভজন করতে হবে না।

মহারাজ : না, তিনটি জিনিস জানলেই হবে। এক, আমি কে? দুই, ওরা কে? আর আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ কী?

—হ্যাঁ। এর মানে কী, মহারাজ?

মহারাজ : এটা জানতেই কী কম সাধন দরকার! 'আমি কে' মানে—যিনি বলছেন, অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর। 'ওরা' মানে, ভগবানের ভক্ত (আমার ভক্ত)। আর উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হচ্ছে তাঁর অঙ্গ। তাঁর সাথে নিত্যযুক্ত (অন্তরঙ্গ)।

প্রশ্ন : গীতাতে ভগবান বলেছেন, যোগী হতে হলে সঙ্কল্প করা চলবে না। সঙ্কল্প মানে কী?

মহারাজ : সঙ্কল্প মানে, এটা করব, ওটা করব—এরকম চিন্তা করা।

—আমরা তো সঙ্কল্প করছি সর্বদা।

মহারাজ : কিরকম?

—এই বিল্ডিং তৈরি করে ওটা তৈরি করব, এরকম।

মহারাজ : তোমরা কি কর্মযোগী?

—হ্যাঁ, আমরা তো কর্মযোগী।

মহারাজ : কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, কর্মযোগী তীব্র কর্মের মধ্যে চরম শান্ত থাকবে। সে-কারণে তোমরা এখনো যোগী নও, যোগী হতে চাও।

—নাকি মহারাজ, এখন আমাদের যা অবস্থা তাতে সঙ্কল্প করতেই হবে?

মহারাজ : তা কেন? সঙ্কল্প করতেই হবে—এরকম বলো না। বল, সঙ্কল্প না করে আমরা এখন থাকতে পারি না। তা সঙ্কল্প না করলেই হয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, কর্ম যে ঠাকুরকে সমর্পণ করতে হয় বা ঠাকুরের কাজ, ঠাকুরকে নিবেদন করছি—এই যে ভাবা, এটা কি কাজের শেষে করতে হয়?

মহারাজ : সমর্পণ বা নিবেদন কাজের শেষে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শেষে করব—এই ভাবলে আর করে ওঠা হবে না, কাজের মাঝেই করতে হয়।

—কিন্তু মহারাজ, কাজটা শেষ না হলে কী নিবেদন করব? পায়েস রাঁধতে রাঁধতে কি নিবেদন করা যায়, না রান্না হলে?

মহারাজ : তুমি তো কর্ম product হিসাবে সমর্পণ করছ না। সমর্পণ করছ তোমার performance; মানে, কর্মের জড় ফলটা শুধু নয়, তার সঙ্গে তোমার কর্মদৃষ্টি ও মনোভাব। আর performance যখন যেটুকু হচ্ছে, সেটুকুই ঠাকুরকে নিবেদন করছি—এই ভেবে কাজ করা যায়। এভাবে ভেবে না করলে আসক্তি এসে যায়। কাজ যেটা করছি, সেটাই করতে করতে সমর্পণের কথা আছে। বলছে না : "যদ্ যদ্ কর্ম করোমি তদ্ তদ্ জগন্মাত তব পূজনম্।" 'করোমি' বলছেন, 'করিস্যামি' বলছেন না। সেরকম, "যৎ করোষি যদশ্নাসি জজ্জুহোষি দদাসি যৎ।" অর্থাৎ যা যা করছ তাই আমাকে সমর্পণ কর।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়। এর অর্থ কী?

মহারাজ : সাধন-ভজন করতে করতে সাধক যখন অনেক এগিয়েছে মনে করে, তখন বিধিপূর্বক সন্ধ্যা না করলেও হয়। তখন শুধু গায়ত্রী করলেই হয়। আরো যখন উন্নতি হয়, তখন শুধু ওঁ জপ করলেই হয়।

—এ কি আপনা থেকেই হয়?

মহারাজ : না, আপনা থেকে হয় না। সাধক নিজেই ঠিক করে নেয়।

—মহারাজ, গায়ত্রী-দর্শন কী? কী হলে বুঝব যে গায়ত্রী-দর্শন হয়েছে?

মহারাজ : গায়ত্রী মন্ত্রের যে-তাৎপর্য, যে-তত্ত্ব, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বা উপলব্ধিই হল গায়ত্রী-দর্শন।

—সন্ন্যাসের পরেও গায়ত্রী জপ করা যায়?

মহারাজ : কেন যাবে না? গায়ত্রী-দর্শন না হওয়া পর্যন্ত গায়ত্রী জপ করা যায়।

—মহারাজ, সন্ন্যাসের সময় আমরা যে গায়ত্রী গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছি এবং ব্রহ্মগায়ত্রী পেয়েছি। এখন আবার কী করে গায়ত্রী জপ করা যায়?

মহারাজ : ব্রহ্মগায়ত্রী পেয়েছ, বেশ। সেটা জপতে থাক। আবার গায়ত্রীও জপ। এতে অসুবিধাটা কোথায়? আর সন্ন্যাসের সময় যা যা ত্যাগ করেছ, তার কি আর কিছুই এখন করছ না? সত্যিই সব ত্যাগ হয়েছে?

—সব ত্যাগের সঙ্কল্প করেছি বটে।

মহারাজ : তোমরা যে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছ, সেটা বিধিগত সন্ন্যাস—প্রকৃত সন্ন্যাস নয়। প্রকৃত সন্ন্যাস হল সন্ন্যাস অবস্থা। সেই সন্ন্যাস হলে কিছুই করা সম্ভব নয়। কারণ, তখন তুমি-আমি সব আত্মা। তাছাড়া আর কিছু নেই। ত্যাগ অর্থ হল স্বার্থবুদ্ধি পরিত্যাগ করা। এর মানে এই নয় যে, যে উপায় বা প্রক্রিয়াগুলি আমাদের উদ্দেশে পোঁছাতে সাহায্য করে তাদের পরিত্যাগ করা। এগুলি আমাদের সহায়ক। সন্ন্যাসের পরও গায়ত্রী জপ করা আমাদের উদ্দেশ্যলাভে সহায়ক। এগুলো কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়। গীতায় ভগবান বলছেন না : “কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।” সকল প্রকার স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ।

প্রশ্ন : ঠাকুর তো বলেছেন—‘যত মত তত পথ’। আবার বলছেন, তাঁর কাছে আসতে হবে। তাঁর কাছে আসতে হবে কেন?

মহারাজ : তাঁর কাছে—মানে তাঁর ভাব মানুষকে নিতে হবে। সে যেখানেই থাকুক। দেখ, ঠাকুরের কথা আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। ঠাকুর কী অর্থে বলেছিলেন, তা তিনিই জানেন এবং যাঁকে বলেছিলেন, তিনি সম্ভবত বুঝেছিলেন। তাই আমরা কখনো বলি না—ঠাকুরের এই কথাটার এই অর্থ। আমরা শুধু বলি—আমাদের মনে হয় ঠাকুরের অমুক কথাটার এরকম অর্থ।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের ঠাকুর পবিত্রতার মূর্তিস্বরূপ। আমরা তাঁর অনুগামী। কিন্তু আমাদের মনে কত আবিলতা! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা কী করে ঠাকুরকে লাভ করব?

মহারাজ : ঠাকুরকে লাভ করা মানে কি, ঠাকুর আমাদের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে যাবেন? তা নয়। ঠাকুরকে লাভ করা মানে—তাঁর মতো হওয়া। জোনাকি কি সূর্য হয় কখনো? কিন্তু যতই আমাদের অপবিত্রতা ধীরে ধীরে সেই সূর্যের তেজে পুড়ে যাবে—যা আমাদের তাঁর থেকে পৃথক রেখেছে, সেই আবরণ সরে যাবে—ততই আমরা সূর্যের নিকটস্থ হব, আমরা সূর্য হব। সূর্য হওয়ার সম্ভাবনা এই দৃষ্টি থেকে। যেমন, কয়েক গণ্ডূষ জলের সমুদ্র হওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু সেই কয়েক গণ্ডূষ জল যেমন তার পরিধি বাড়াতে বাড়াতে নিজের স্বাতন্ত্র্য মুছে সমুদ্রে মিশে সমুদ্র হয়ে যায়, তেমনি আমরা আমাদের সমস্ত রকম সঙ্কীর্ণতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে এক হতে পারি। এই প্রশ্ন অনেকের মনে ওঠে—সত্যিই কি আমাদের পক্ষে সেই উচ্চ আদর্শ লাভ করা সম্ভব? তার কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য এত মহৎ, আদর্শ এত উচ্চ যে, মনে হয় আমরা যেন সেটি লাভ করতে পারব না। আমরা যদি এক পা এক পা করে সূর্যের দিকে এগতে থাকি, আমরা কি বুঝতে পারব, কতটা দূরত্ব আমরা অতিক্রম করলাম? তা বোঝা যায় না। কারণ, আমাদের অগ্রগতির তুলনায় আদর্শ এত উচ্চ, উদ্দেশ্য এত দূরে যে, মনে হয়, উদ্দেশ্যলাভ করা অসম্ভব। তাই সাধক-জীবনে এরকম মনে হওয়া ভাল। তাতে আমরা বুঝব, যে-আদর্শ আমরা বরণ করেছি, তা লাভ করা অত্যন্ত সুসাধ্য নয়। তার জন্য দরকার হয় বছরের পর বছর। হাজার জন্ম লাগুক। তার জন্য প্রস্তুত থাকা, তার জন্য চেষ্টা করার এই যে মনোবৃত্তি, এটিই বহু মূল্যবান।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর তাঁর যুবক ভক্তদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, আমাকে তোমার কী মনে হয়? এমন জিজ্ঞাসার কারণ কী?

মহারাজ : তারা ঠাকুরকে কতটুকু বুঝেছে বা কী দৃষ্টিতে দেখে—এটা দেখে ঠাকুর বুঝতে পারতেন, সেই যুবক ভক্ত কতটা এগিয়েছে বা কোন্

পথে চলছে। সেটা জেনে তাকে আরো এগিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সাহায্য করতেন। ঠাকুরকে কতটুকু আমরা বুঝি সেটিই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতির লক্ষণ।

—কিন্তু মহারাজ, গৃহী ভক্তরা কেউ বলছেন, আপনিই সেই, আপনিই গৌরাঙ্গ ইত্যাদি। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলছেন—ও কী কথা! আমি তাঁর দাসের দাস ইত্যাদি।

মহারাজ : কী বলছ, ভক্তরা আমাকেই বলে—আপনিই সেই, আপনিই অমুক! (হাসি) অবতার বলা সহজ, কিন্তু বোঝা কঠিন। অবতারকে বোঝা খুব, খু-ব কঠিন। জন্ম-মৃত্যুকে স্বীকার করে অসীম অনন্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিভাবে মানুষের মধ্যে আসেন—এ বোঝা খুব কঠিন। বরং শালগ্রাম শিলাকে অবতার বললে বোঝা যায়। কারণ, সেটি contradict করে না। সেখানে অবতার কল্পিত, আরোপিত। সত্যি সত্যি সেখানে অবতারত্ব রয়েছে কিনা—এ-প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মানুষরূপ অবতার হয়ে যখন তিনি আসেন, তখন তো সেখানে অবতারত্ব কল্পিত নয়, আরোপিত নয়। যেহেতু মানুষ হয়ে আসা, তাই তাঁর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, রোগ-শোক সব আছে অর্থাৎ সেটি প্রতি পদেই, প্রতি কাজে-কর্মে ব্যবহারে মূল তত্ত্বকে contradict করছে। সেজন্য অবতারকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। সেকারণে ঠাকুর বললেন—ভগবানের মানবলীলায় বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

—তাই মহারাজ। যখন গিরিশবাবু, রামবাবু ঠাকুরকে অবতার বলছেন, ঠাকুর বললেন—হ্যাঁ, একজন থেটার করে, আরেকজন ডাক্তার, বলে কিনা অবতার! অবতারের তারা কী বোঝে?

মহারাজ : হ্যাঁ, তাই। ওটা একটা কথার কথা মাত্র। তাই ওরকম যখন কেউ না বুঝে বলত, ঠাকুর প্রতিবাদ করতেন। যিনি অনন্ত, অসীম, এই জগতের অধীশ্বর—তিনি এইটুকু মানুষের মধ্যে আসেন, এ কি সহজে বিশ্বাস হয়? ভাগবতে দেবকীর স্তবে বড় সুন্দর কথা রয়েছে। দেবকী বলছেন :

"বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্॥
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো
নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥" (১০।৩।৩১)

—প্রলয়াবসানে অর্থাৎ সৃষ্টির পর স্থিতি সময়ে যিনি জগতের প্রতিটি বস্তুর সমান দূরত্ব বা ব্যবধান বজায় রেখে জগৎকে নিজ শরীরের মধ্যে ধারণ করেন, তিনি আমার গর্ভে জাত হয়েছেন—একথা জগতের লোক কিভাবে বিশ্বাস করবে? এটা তাদের বিড়ম্বনা মাত্র।

॥ ২৬ ॥

প্রশ্ন : শ্রীমা সারদাদেবী বলেছেন, যে যার সে তার যুগে যুগে অবতার। এই কথাটির অর্থ কী?

মহারাজ : ঠাকুর বলেছেন না, কলমির দল? একটাকে টানলেই সব আসে। অবতার ও তাঁর পার্ষদরা পরস্পর পরিপূরক। অবতার যখনি আসেন তাঁর জগৎকল্যাণরূপ কার্যসাধনের জন্য, তখন সঙ্গে অন্তরঙ্গদেরও নিয়ে আসেন। তাঁরা অবতারের ভাবের পুষ্টি ও বিকাশ সাধন করেন। তাই বলেছেন, যে যার সে তার। অন্তরঙ্গারা তাঁরই চিহ্নিত জন।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা দেখি, মা মাতৃত্বের জন্য অন্য সব কিছুকে উপেক্ষা করেছেন। মাতৃত্বের কাছে আর অন্য কোন কিছু গুরুত্ব পায়নি। বলেছেন—বিলেতের ছেলেরাও তাঁর, শরৎ যেমন ছেলে আমজাদও তেমন ছেলে ইত্যাদি। কিন্তু মায়ের জীবনের শেষে দেখি, মা অসুস্থ, সেবক পাউরুটি এনেছেন দুধে দিয়ে মাকে খাওয়াবেন। মা বলছেন, বাবা এই শেষ সময়ে মুসলমানের ছোঁয়াটা না দিলেই কী নয়? মাকে এরকম ব্যবহার করতে সাধারণত দেখা যায়নি। তাই মনে খটকা লাগে। মুসলমানরাও তো তাঁরই ছেলে।

মহারাজ : দেখ, লৌকিক দেহ ধারণ করলে দেহের কিছু সংস্কার থেকেই যায়। এটা সেইরকমই। এতে তাঁর মাতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি এতে

মুসলমানদের ঘৃণা করছেন, তাও নয়। এতে যে মুসলমানরা তাঁর মাতৃত্বের ভাগীদার রইল না, তাও নয়। তখনো আমজাদ তাঁরই ছেলে। তিনি ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে কিনা, এটা সেই সংস্কারের প্রভাব। ভাগবতী শরীরেরও কিছু সংস্কার থাকে। তা না হলে মানুষরূপ ধারণ সম্ভব হয় না। লক্ষ করবে, তাঁর মাতৃত্ব কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমারও এই সংস্কার ছিল। বহুদিন লেগেছে এটা কাটাতে। এখনো পুরোপুরি দূর হয়েছে কিনা, কে জানে! ছেলেবেলা থেকেই আমরা পাউরুটি খেতাম না— মুসলমানে তৈরি করে বলে। তখনকার দিনে বামুনদের মধ্যে এটার খুব চল ছিল। তারপর কলকাতায় শুরু হল বামুনের তৈরি পাউরুটি বিক্রি!

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন—মাতৃভাব সাধনার শেষ কথা। কেন?

মহারাজ : ঠাকুর কেন বলেছেন বলা কঠিন। তবে এ-ভাবটি ঠাকুরের অতি প্রিয় ভাব। মাতৃভাব বড় মিঠে ভাব। ঠাকুরের এটি একটি বিশেষ অবদান।

প্রশ্ন : মহারাজ, সুষুপ্তি ও সমাধির মধ্যে পার্থক্য কী একটু বলুন।

মহারাজ : মন হল সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। তিন অবস্থাতেই মনের বিকল্পরাহিত্য দেখা যায়—সুষুপ্তি, মূর্ছা ও নির্বিকল্প সমাধি। বিকল্পের অভাব এই তিনেতেই উপস্থিত। কিন্তু সুষুপ্তি ও মূর্ছাতে যে মনের লয় হয়, তা অজ্ঞানে হয়। লয়ের পরও বীজ থাকে। বীজ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের। সেই অজ্ঞানের বীজ ধরে আবার জাগ্রতে ফিরে আসে। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে মন লয় হয় জ্ঞানে।

প্রশ্ন : মহারাজ, নৈতিকতা আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সম্পর্ক কিরকম?

মহারাজ : নৈতিকতা হল আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। নৈতিকতা ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন সম্ভব নয়। ঐ শ্লোকটি মনে কর—

“নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।।”

(কঠোপনিষদ্, ১।২।২৪)

এখানে প্রজ্ঞাকে আরো ব্যাপক অর্থে জ্ঞান-ভক্তিও ধরতে পার।

—আচ্ছা মহারাজ, অনেকে তো আধ্যাত্মিকতা ছাড়াই শুধু নৈতিক হওয়ার কথা বলে। তাদের কী যুক্তি?

মহারাজ : হ্যাঁ, তাদেরও যুক্তি আছে, তাদেরও একটা দর্শন আছে। তাদের মতে নৈতিকতা অর্থাৎ সত্য, অহিংসা ইত্যাদি আশ্রয় না করলে সমাজের প্রতিষ্ঠা, সমাজ-বন্ধন—এককথায় সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। ধর, তুমি দোকানে গিয়ে জিনিস কেনার জন্য টাকা দিলে, দোকানি মাল দিল না। বা দোকানি মাল দিল, কিন্তু তুমি টাকা দিলে না। এভাবে কি সমাজ টেঁকে?

—আর মহারাজ, যারা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করবে, তারা কেন নীতিপরায়ণ হবে? বা ধরুন, কেন আমরা সত্য কথা বলব?

মহারাজ : সত্যকে ছাড়া, নৈতিকতা ছাড়া আমাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাবে। সত্যকে আশ্রয় না করলে উদ্দেশ্য স্থির থাকে না। অহিংসা, সত্য, অপরিগ্রহ, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য—এসবগুলিই ধর্ম।

প্রশ্ন : মহারাজ, বলা হয়েছে—'তন্নোহংস প্রচোদয়াৎ'। কোথায় প্রচোদয়াৎ, কোথায় প্রেরণ করুন?

মহারাজ : শুভের পথে, মঙ্গলের পথে আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করুন। মোক্ষপ্রাপ্তির পথে আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করুন।

—মহারাজ, এটা কি কোথাও আছে, নাকি স্বামীজীর তৈরি?

মহারাজ : না, না। স্বামীজীর তৈরি নয়, এটা গায়ত্রী।

—গায়ত্রীতে তো আছে, 'ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'। হংস কথাটা কোথায় আছে?

মহারাজ : ওটা পরমহংস গায়ত্রীতে আছে।

[ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা হচ্ছিল—কিভাবে একটি একটি উপমার সাহায্যে সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মবস্তুকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মহারাজ বলছেন—একটি একটি করে সুন্দর উপমার সাহায্যে ব্রহ্মবস্তুকে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু শ্বেতকেতু বুঝতে পারছে না। তারপর তাকে বলা হল, বৎস শ্রদ্ধাবান হও। শুধু উপমার দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। শ্রদ্ধা ছাড়া ধারণা সম্ভব নয়।]

প্রশ্ন : মহারাজ, এই যে শ্রদ্ধার কথা বলা হল, শ্রদ্ধালাভ করার উপায় কী?

মহারাজ : কোন কিছু করতে বলা হলে আমরা বুঝি সেটা করা যায়, না হলে করতে বলা হবে কেন? শ্রদ্ধাবান হতে যখন বলছে, তার মানে—সেটা হওয়ার যোগ্য, হওয়া যায়। কিভাবে হওয়া যায়? গুরু যেটা বলছেন সেটাকে গঠনমূলক দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে হবে, ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিতে নয়। অর্থাৎ, একটা সদর্থক দৃষ্টি নিয়ে গ্রহণ করা। আমাদের প্রবণতাই হল নঞর্থকভাবে সবকিছুকে নেওয়া। সেরকম নয়। তাতে কিছু লাভ হয় না।

প্রশ্ন : মহারাজ, ভগবান সম্পর্কে আমাদের কিরকম ধারণা হওয়া উচিত?

মহারাজ : স্বামীজী যেমন বলেছেন, একটি ব্যাঙ যেমন ভগবানকে কল্পনা করে একটি বিরাট ব্যাঙরূপে, একটি ষাঁড় একটি বিশাল ষাঁড়রূপে—সেরকম প্রত্যেকেরই নিজের সম্পর্কে যে-ধারণা থাকে, ভগবানকে তারই একটা বিরাট রূপ হিসাবে ভাবে। তিনি বিরাট, শক্তিমান ইত্যাদি রূপে ভাবতে হয়। পবিত্রতা, ঐশ্বর্য প্রভৃতি যেসব সদ্‌গুণ আমরা চাই, ভগবান সেসবের আকরস্বরূপ।

—মহারাজ, ভগবানলাভ সম্পর্কে কিরকম ধারণা থাকা উচিত? বলতে চাই, ভগবানলাভ মানে কী?

মহারাজ : বলছি। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, একত্ব আর অদ্বৈতের কৈবল্য—এরকম কথা আছে। সালোক্য মানে—তাঁর সঙ্গে এক লোকে থাকব, যেমন শিবলোক, বিষ্ণুলোক ইত্যাদি। সার্ষ্টি—তাঁর মতো ঐশ্বর্যশালী। শুধু সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—এই তিনটে ক্ষমতা হয় না। এটা হলে সবাই নিজের নিজের মতো সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করতে শুরু করবে এবং সৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা আসবে। সামীপ্য—তাঁর সমীপে অর্থাৎ কাছে থাকব। সারূপ্য—তাঁর মতো রূপ হবে। একত্ব—এটা বেদান্তোক্ত ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাওয়া নয়, এখানে একত্ব মানে আমি তাঁর অংশ। অর্থাৎ অংশ-অংশী সম্বন্ধ। এসব দ্বৈত মতের ভাব। আরেকটি আছে—অদ্বৈতীর

কৈবল্য বা মুক্তি। ভগবানলাভ সম্পর্কে এই কয়প্রকার ধারণার কথা আছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলছেন : "হরিষে লাগি রহো রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই।"—এ আমার ভাল লাগে না।

মহারাজ : তিনি বলেছেন কার জন্য? যার সেই রকম ব্যাকুলতা এসেছে। ঠাকুরের এক্ষুনি চাই—দেরি সইছে না। ঠাকুর বলছেন, ওরকম করে ডাকলে কী হয়? বলেই মাটিতে হাত-পা ছুঁড়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। দেখাচ্ছেন, কিরকম ব্যাকুল হলে তাঁকে পাওয়া যায়। এতটুকু কৃত্রিমতা নেই তাঁর মধ্যে।

—কিন্তু মহারাজ, স্বামীজী বলেছেন, কান্নাকাটি ইত্যাদি স্নায়বিক দৌর্বল্য।

মহারাজ : স্বামীজী কাঁদেননি? বৃন্দাবনে তিনদিন মাটিতে পড়ে স্বামীজী কাঁদেননি? হেসে হেসে কে ভগবানকে লাভ করেছে? না কেঁদে কে কবে ভগবানলাভ করছে? আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, যে দুর্লভ জিনিস আমরা চাই, যে অমূল্য বস্তু আমরা লাভ করতে চাই—তার জন্য একটা জন্ম কী, বহু জন্মও কিছু নয়। অমূল্য উদ্দেশ্যের জন্য অমূল্য মূল্যই দিতে হবে। সবাইকেই এই পথ দিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, অহঙ্কার এবং গৌরবের মধ্যে পার্থক্য আছে?

মহারাজ : আকাশ-পাতাল। অহঙ্কার হচ্ছে 'আমি' 'আমি' কর্তৃত্বাভিমান। সেটা মিথ্যা অভিমান। আর গৌরব হচ্ছে, গুরুত্বের বোধ। একটা হচ্ছে boasting, আরেকটা pride। Boasting হচ্ছে vain glory. We must be proud of our Sangha, of our Gurus, of our aristocratic family background. আমাদের সংঘের জন্য, গুরুর জন্য, সদ্বংশের জন্য গৌরব থাকবে—সেটা দোষের নয়। তাই না?

—হ্যাঁ মহারাজ। Vanity আর pride.

মহারাজ : হ্যাঁ।

—Vanity অর্থাৎ যেটা নেই সেটা আছে মনে করে মিথ্যা অভিমান করা। একটা শ্লোকে আছে—

"অহংকারং সুরাপানং গৌরবং ঘোর রৌরবম্।
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

এখানে গৌরবকেও ত্যাগ করতে বলছে কেন?

মহারাজ : এখানে গৌরব অহঙ্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

—এ শ্লোকটা বৈষ্ণবদের মধ্যে খুব প্রচলিত।

মহারাজ : দূর! তা কেন? প্রত্যেক সন্ন্যাসীরই এগুলো ত্যাগ করা কর্তব্য। তাই না? আমরা ভাবি, নিরহঙ্কার ভাব যেন শুধু বৈষ্ণবদের। এটা প্রত্যেক সন্ন্যাসীরই আদর্শ।

প্রশ্ন : ভগবান সত্যস্বরূপ। আবার বলা হচ্ছে, তিনি 'সত্যস্য সত্য'। এর মানে কী?

মহারাজ : সত্যের সত্য। একটি আপেক্ষিক সত্য, আরেকটি পারমার্থিক সত্য। এই যে জগৎ দেখছি তা সত্য, এটা আপেক্ষিক সত্য, বাধিত সত্য। অপরটি পারমার্থিক সত্য, অবাধিত সত্য। এই জগৎ, এই আপেক্ষিক সত্য অধ্যস্ত। কিন্তু পারমার্থিক সত্য অবাধিত। একমাত্র ব্রহ্মই অবাধিত। আর সত্য মানেও অবাধিত।

॥ ২৭ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, মন-মুখ এক করা যায় কিভাবে?

মহারাজ : সত্যকে আশ্রয় করে।

—মহারাজ, সত্যের ব্যাপকতা কতদূর?

মহারাজ (খুব গম্ভীর স্বরে) **:** মহা সর্বনাশ হলেও সত্যকে ধরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, শেষ সময়ে কি তাঁর কথা চিন্তা করা যায়?

মহারাজ (সহাস্যে) **:** এরকম কথা তো বুড়িরা বলে। শেষ সময়ের কথা ভাবার কী দরকার? বর্তমানের কথা ভাব। If you take care of the present, future will take care of itself. বর্তমানকে ব্যবহার কর, ভবিষ্যৎ আপনা থেকেই ভাল হবে। এক্ষুনি করতে হবে। পরে কেন?

ঠাকুর নিরঞ্জন মহারাজকে বলেছিলেন, তুই এখনো ভগবানলাভ করলি না? তাঁকে লাভ করবি কবে? বলছেন না তো—পরে করবি! কিরকম ব্যাকুলতা!

প্রশ্ন : মহারাজ, এক জায়গায় আছে—অকার্য করার প্রবৃত্তি জন্মালে তার প্রতিবন্ধক যে-লোকলজ্জা অর্থাৎ লোকে কী বলবে প্রভৃতি যে বৃত্তিবিশেষের ফলে অকার্যে প্রবৃত্তি প্রতিহত হয়, তার নাম হ্রী। মহারাজ, এই 'অকার্য' বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : নিন্দনীয় কার্য। সমাজের পক্ষে যেটা নিন্দনীয়, সেই কার্যই অকার্য।

—বিভিন্ন সমাজে তো নিন্দনীয় কার্য বিভিন্ন রকম।

মহারাজ : তা হোক। যে-সমাজের ক্ষেত্রে যে-কার্যটি নিন্দনীয়—তার প্রতিবন্ধক লজ্জাই সেই সমাজের ক্ষেত্রে হ্রী।

প্রশ্ন : মহারাজ, শুনছি তো অনেক, ধারণা হচ্ছে না কেন?

মহারাজ : সর্বদা বিচার করতে হবে। বিচার করতে করতে তত্ত্বের ধারণা হবে। তাই বলছে :

"আসুপ্তে আমৃতে কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া।
দদ্যাৎ নাবসরং কিঞ্চিদপি কামাদীনাং মনাগপি॥"

যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছি, যতক্ষণ এই দেহ থাকছে ততক্ষণ সর্বদা মনকে বেদান্ত-চিন্তার দ্বারা পূর্ণ করে রাখতে হবে। কেন? যাতে কামাদি মনে অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়। এইজন্য উপনিষদ্ পড়।

—মহারাজ, এই যে সদাসর্বদা বিচার করতে ঠাকুর বলছেন—'হাজার বিচার কর, আমি যায় না।' তবে উপায় কী?

মহারাজ : 'হাজার বিচার কর' মানে শুধু আলোচনা, পড়া নয়। জীবনে সেটা আনতে হবে। জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। খুব ঘষতে হবে। এখন শুনছি কিন্তু সংস্কার তৈরি হচ্ছে না। ঘষতে ঘষতে সংস্কার তৈরি হয়। খুব কঠিন। শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার বা আলোচনায় হবে না। সেজন্য আমার ঐ শ্লোকটা খুব ভাল লাগে। খুব দরকারি। এগুলিই

আমাদের সাধন। এগুলি করলে, সঙ্গে বিচার করলে নিশ্চয়ই হবে। সেটা হচ্ছে—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

(কঠোপনিষদ্, ১।২।২৪)

এখানে 'প্রজ্ঞা' মানে আলোচনা বা বিচার। শুধু বিচারের দ্বারা হবে না। ঐগুলির সাধন করতে হবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, অসূয়া আর ঈর্ষা কি এক?

মহারাজ : না, সামান্য তফাত। অনেকটা একই রকম। অসূয়া মানে পরের উন্নতিতে অসহিষ্ণুতা। আর ঈর্ষা হল—নিজের যেটি অভাব, অন্যের মধ্যে তা থাকায় সেটি পাওয়ার ইচ্ছা। তাই অন্যেও না পাক—এরকম ভাবনা হল ঈর্ষা।

প্রশ্ন : স্বামীজী বলেছেন, পরাধীনতা আর অনেক বছরের দাসত্বই আমাদের ঈর্ষার কারণ। এর অর্থ কী?

মহারাজ : বহুদিন পরাধীন থাকার সময় এটা আমাদের মধ্যে ঢুকেছে। যদিও আমরা এখন পরাধীন নই, তবু সেই সময়ই এটা আমাদের মধ্যে ঢুকেছে। শাসকশ্রেণির অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকে যেগুলি থেকে শাসিতরা বঞ্চিত হয়, সেগুলি পাওয়ার ইচ্ছাই ঈর্ষার সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন : মহারাজ, রাজা মহারাজ এক জায়গায় বলেছেন—কর্ম করতে গেলে প্রথমত, কর্মে খুব প্রীতি থাকা চাই এবং দ্বিতীয়ত, ফলের দিকে মোটেই দৃষ্টি দিতে নেই। এটিই কর্মযোগের রহস্য। মহারাজ, কর্মে প্রীতি বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : কর্মে প্রীতি থাকলে তা কখনো বোঝা বলে মনে হবে না। আমার ওপর কেউ কাজ চাপিয়েছে—এরকম মনে হবে না।

—কিন্তু মহারাজ, এই প্রীতি থেকেই তো কর্মে আসক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

মহারাজ : প্রীতি মানেই আসক্তি কেন? ভগবানে প্রীতি আমরা বলি না? সেটা কি আসক্তি?

—ভগবানে আসক্তি তো ভাল।

মহারাজ : সেইরকম, কর্ম যদি নিষ্কাম হয়—নিজের স্বার্থের জন্য না করা হয়, তবেই তা আসক্তি হল না।

প্রশ্ন : মহারাজ, বলা হয়—"Sri Ramakrishna is the method." 'Method' মানে কী?

মহারাজ : ঠাকুরের অন্যতম প্রধান ভাব হল—কারো ভাব নষ্ট না করা। এটাই method। যে যেভাবে চলছে, যে যে-ভাবের পথিক—তাকে সেই ভাবেই সাহায্য করা। ঠাকুর তাই করেছেন, স্বামীজীও করেছেন।

—মহারাজ, ঠাকুর তো বুঝতেন অন্যের কী ভাব। আমরা কী করে জানব, অন্যের কী ভাব?

মহারাজ : বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অন্যের ভাব বোঝার চেষ্টা করে তাকে সেই পথেই সাহায্য করতে হবে।

—মহারাজ, এরকম তো হতে পারে যে, সে যে-ভাবে চলছে সেটা ঠিক হচ্ছে না বা ভুল পথে যাচ্ছে।

মহারাজ : তা বলে তুমি তার ওপর তোমার ভাব চাপিয়ে দেবে কেন? সে যে-পথে চলছে বা সে যে-ভাবের অনুসরণ করছে, তার মধ্যে কিছু তো ভাল আছে। সেটুকু লক্ষ করে তাকে সেদিকে এগনোর জন্য সাহায্য করতে পার। আর কী করে জানলে, তোমার পথটাই বা তোমার ভাবটাই ঠিক? স্বামীজী যখন অভেদানন্দজীর মধ্যে অদ্বৈত ভাব ঢোকালেন, তখন ঠাকুর বকলেন; কারণ তিনি তাঁর নিজের ভাবে এগচ্ছিলেন। এতে তাঁর ভাবটা সব নষ্ট হয়ে গেল। ঠাকুরের দেওয়া এই শিক্ষাটা স্বামীজী অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী জীবনে এর অনেক উদাহরণ দেখতে পাই। এখন দুটি ঘটনা মনে পড়ছে। স্বামীজী কিরকম অন্যের ভাব অনুযায়ী তাকে সাহায্য করতেন, সেটা বোঝা যাবে। স্বামীজী মঠে নিয়ম করেছেন, খুব পড়াশোনা করতে হবে। স্বামী ধীরানন্দ স্বামীজীকে গিয়ে বললেন : "স্বামীজী, আমার তো পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না।" স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন : "তোর কী করতে ভাল লাগে?"

—"আমার জপ করতে ভাল লাগে।" স্বামীজী তখন বললেন : "তুই তাই কর।" আরেকবার রিলিফ শুরু হয়েছে, এদিকে শুদ্ধানন্দজীর খুব ইচ্ছা তপস্যায় যাওয়ার। দু-একজন গুরুভাইয়ের সাথে পরামর্শ করাতে তাঁরা বললেন : "সাবধান, এখন ওকথা স্বামীজীকে বলিসনি। স্বামীজী একেবারে চটে যাবেন। আর তোর ওপর স্বামীজী কত নির্ভর করেন! এখন তুই না থাকলে স্বামীজী খুব disheartened হবেন না?" কিন্তু শুদ্ধানন্দজীর মনে প্রবল ইচ্ছা, সেটা আর চেপে থাকতে পারছেন না। একদিন স্বামীজীকে বলেই ফেললেন : "স্বামীজী, মনে খুব ইচ্ছে তপস্যায় যাই।" স্বামীজী শুনে একটু চুপ করে রইলেন। পরে বললেন : "খুব ইচ্ছে করছে?" —"হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করছে।" স্বামীজী বললেন : "তবে যা।" দেখ, স্বামীজীর দরাজ হৃদয়বত্তা—অসুবিধা হবে জেনেও অন্যের ওপর নিজের ভাব চাপিয়ে না দিয়ে তার ভাবে এগিয়ে দেওয়া।

—মহারাজ, স্বামীজী বুঝতেন যে, শুদ্ধানন্দজী সুযোগটা সদ্ব্যবহার করবেন।

মহারাজ : আরে সে যাই হোক, আমরা হলে তো বলব—হ্যাঁ, এখনি তোমার তপস্যায় যাওয়ার সময় হল? যাও, হবে না। রিলিফে যাও।

প্রশ্ন : মহারাজ, আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্যের রহস্যটা কী?

মহারাজ : রহস্য কিছু নেই। সোজা কথা। Intense aspiration—তীব্র ব্যাকুলতা আর আন্তরিকতা—এই উপায়। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন—তোরা কিরকম প্রার্থনা করিস? ওরকম করে কী হয়? বলেই তিনি হাত-পা ছুঁড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। সেরকম কি আমাদের মনে হচ্ছে? যখন তাঁকে ছাড়া জীবনটা অর্থহীন বলে মনে হবে সেটিই হল ব্যাকুলতা। ঐ যে জলে চুবিয়ে ধরার গল্প বললেন ঠাকুর। আমাদের অবস্থা সেরকম যখন হবে, ভগবানের অভাবে যখন এরকম মনে হবে—তখনি সময় হয়েছে বুঝতে হবে। তোমরা নিজেদের জীবনের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবে। এই যে তোমরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসেছ, এ কম কথা নয়। কিন্তু যেরকম ব্যাকুলতা, যেরকম ত্যাগস্বীকার ভগবানের জন্য করতে হয়—সে-তুলনায় এটা কিছুই নয়। নিজেদের জীবনে প্রত্যেকেরই

কম-বেশি এরকম একসময় মনে হয়েছিল, ব্যাকুলতার তীব্রতা প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ছিল। যেমন আমার কথা বলি। বাড়ি থেকে পালাচ্ছি, পরনে যে-কাপড়টা ছিল, সেটা ফেলে দিয়ে অন্য একটা চার-হাতি কাপড় হাঁটু পর্যন্ত পরছি। যাব হাওড়া স্টেশনে, হাত কাঁপছে—পাছে কেউ দেখে ফেলে। দেখ, মনের কিরকম অবস্থা ছিল!

—মহারাজ, এই ব্যাকুলতা বাড়ে না কেন? কিভাবে ব্যাকুলতা বাড়ানো যায়?

মহারাজ : ব্যাকুলতা বাড়ছে না—এটা তো বুঝতে পারছ? আমাদের যতটুকু মূলধন আছে, তা-ই ব্যবহার করতে হবে। যা নেই তা নিয়ে ভাবলে কী হবে? বড় পুঁজি নেই বলে কি বসে থাকব? না, যতটুকু আছে তাকেই ঠিক ঠিক ব্যবহার করব? আমরা তো খুব বড় মূলধন নিয়ে আসিনি—যেমন ঠাকুরের সন্তানেরা এসেছিলেন। তাঁদের কী বৈরাগ্য, কী ব্যাকুলতা! তবে চেষ্টা করতে করতে আমাদের একদিন হবে, একদিন ব্যাকুলতা আসবে। এখন না হয় পরে, এ-জন্মে না হয় অনেক জন্ম পরে হতে পারে। (একথা বলতে বলতে মহারাজ ক্রমশ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে বলছেন—) ব্যাকুলতার কথা হলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

প্রশ্ন : মহারাজ, শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ কি একই?

মহারাজ : একই। শরণাগতি এলে আত্মসমর্পণ করা যায়। আবার আত্মসমর্পণ করলে শরণাগতি আসে। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে বলা যায় না। দুটো একই সঙ্গে হয়। শরণাগতি—আত্মসমর্পণ কি সোজা কথা? এতটুকু বাসনা থাকতে শরণাগতি আসে না। যেখানে চাওয়া-পাওয়ার শেষ, সেখানে শরণাগতি—তিনি যেমন রাখবেন।

কিছুদিন যাবৎ জনৈক যুবক সন্ন্যাসীর মনে অসন্তোষ চলছিল। এই আলোচনাকালে সুযোগ পেয়ে সেই সন্ন্যাসী পূজনীয় মহারাজকে তাঁর সমস্যার কথা খুলে বললেন। মহারাজ তাঁর সব কথা অত্যন্ত মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনে বলেন :

দেখ, আমরা সকলেই অপূর্ণ; পূর্ণ হতে এসেছি। খুব আত্মবিশ্লেষণ কর, তাহলে আমরা কী করছি, ঠিক করছি কী বেঠিক করছি—ধরা পড়বে। জানবে, ঠাকুরই তাদের দিয়ে তোমাকে ওসব বলিয়েছেন তোমার ভালর জন্য। যদিও আমরা সবসময় এটা মেনে নিতে পারি না, কিন্তু সদাসর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবে কোথায় ভুল হচ্ছে। আর ঠাকুরকে জানাও। স্বামীজী যেমন বলতেন—এখানে যারা আসে, তারা সকলেই ভাল। এখন আরো ভাল হতে হবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, ভজন-কীর্তন মানে কি শুধুই ভগবানের নামকীর্তন, গান? জপ কি এর মধ্যে পড়ে না?

মহারাজ : হ্যাঁ, জপও এর মধ্যে পড়ে। ভগবানের নাম করা, জপ করাও তো ভজন-কীর্তন। আসল কথা কী, যে এসব চেষ্টা করছে, ধ্যানের অভ্যাস করছে সে-ই বুঝতে পারবে। নতুবা যে কিছু করছে না, সে কী করে বুঝবে?

প্রশ্ন : রাজা মহারাজ বলছেন : "প্রকৃত শান্তি পেতে গেলে অশান্তিকে খুঁচিয়ে তুলতে হয়।" একথার অর্থ কী?

মহারাজ : তাই তো। বর্তমান অবস্থায় বেশ আছি—এরকম মনে করে বসে থাকলে কোনদিন শান্তি আসবে না। যতক্ষণ বর্তমান অবস্থায় ভাল আছি—এই বোধ থাকবে, ততক্ষণ কোনই উন্নতির আশা নেই। বর্তমান জীবনধারা, বর্তমান অবস্থাটা অসত্য বোধ না হওয়া পর্যন্ত কিছু হওয়ার নয়।

॥ ২৮ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, কী করে ব্যাকুলতার তীব্রতা বাড়ানো যায়?

মহারাজ : কী করে আর! বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে। সর্বদা একটা অশান্তি মনে জাগিয়ে রাখতে হয়। স্বামীজী বলতেন—এই অসন্তোষ সৌভাগ্যের; এইটি চাই। বাইবেলে আছে, একজন যিশুকে গিয়ে বলছে—যা যা করণীয় ও পালনীয় আমি সবই করছি, দান উপবাস সব করি, কিন্তু

শান্তি পাচ্ছি না। যিশু বললেন—তুমি যদি সব করেও শান্তি না পাও, তবে সবকিছু ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ কর। সে কিন্তু সেটা পারল না।

—মহারাজ, আমাদের জীবনেও তো সেরকমই মনে হচ্ছে। সবই করছি যেন রুটিন-মাফিক, গতানুগতিক।

মহারাজ : ঐ তো আলস্য; যতটা তীব্রতা প্রয়োজন, যতটা রোখ প্রয়োজন সেটা নেই। আর সব করছি মানে, ওটা একটা অভিমান।

—তাই মহারাজ, মাঝে মাঝে মনে হয়, মন অনেকটা যেন ওপরে উঠে গেছে; আবার কদিন বাদে যে কে সেই! একটা অলসতা আসে।

মহারাজ : তার কারণ ঐ তীব্রতা যতটা দরকার, সেটা নেই।

—মহারাজ, আবার আমার কিছু হচ্ছে না—এ-ভাবও তো ভাল নয়।

মহারাজ : সেটা একটা বিলাসিতা। যেদিন বর্তমান অবস্থাকে অসহ্য বোধ হবে, সেদিনই বর্তমান অবস্থাকে পালটানোর জন্য উঠেপড়ে লাগবে। ঠাকুর বলছেন না, রোখ চাই!

—মহারাজ, আপনি যে বললেন দুর্লভ অসন্তোষের কথা, এটা সাধুদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে?

মহারাজ : নিশ্চয়ই। নয়ত কি ভাল খাওয়া, ভাল পরার জন্য অসন্তোষ? এ-জায়গাটা ভাল না, এ-খাওয়াটা ভাল না, এ-কাপড়টা ভাল না—এরকম অসন্তোষ নয়। কেউ কেউ কোথা থেকে চলে আসে! জিজ্ঞেস করি—চলে এলে কেন? বলে—ওখানকার জল-হাওয়া ভাল নয়। গুজরাতিতে বলে, হাওয়া-পানি। বলে—হাওয়া-পানি মুফল নহি। আরে, জল-হাওয়াকে কি আমি পরিবর্তন করতে পারব?

প্রশ্ন : মহারাজ, কর্ম এবং ধ্যানের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে করা যায়?

মহারাজ : ইচ্ছাশক্তিকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে করা যায়। অভ্যাস করে করে ইচ্ছাশক্তি বাড়ে। শুধু বড় বড় পরিকল্পনা করলে হবে না, তাকে কাজে লাগাতে হবে। কিছু করবে না, শুধু প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প ভাল করলে—এতে হবে না। অনুশীলন চাই।

প্রশ্ন : মহারাজ, পুরুষকার ও কৃপা সম্পর্কে কিছু বলুন। এর মধ্যে কোন্‌টি চাই?

মহারাজ : দুটোই চাই। তবে কৃপাতেই সব হবে। তার মানে কি আমি কিছু করব না? হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? না, নিজের সামর্থ্যের সম্পূর্ণটা দিতে হবে। সম্পূর্ণটা দিলে বোধ হবে, আমি আর পারছি না। তখন শরণাগতি আসবে। শরণাগতি এলে তাঁর দয়া বা কৃপা হতে পারে। হতে পারে বলছি, কারণ কৃপা শর্তহীন। এত করেছি বলেই যে তিনি কৃপা করবেন, তা নয়। তবে চাই কী—ডানা ব্যথা করা। সাধন-ভজন মানে ডানা ব্যথা করা। ডানা ব্যথা হলে পাখি মাস্তুলে বসে। সাধন-ভজন করা এজন্য যে, সাধনের অভিমান এতে চূর্ণ হয়। সাধন-ভজনের অভিমান মারাত্মক। এত জপ করেও হবে না, এত ধ্যান করেও হবে না। শাস্ত্র বলছে না—'ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।' মেধার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। 'ন বহুনা শ্রুতেন'—হাজার শুনলেও হবে না। তবে কিভাবে হবে? 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।' তিনি যাকে বরণ করেন, সেই লাভ করে।

—মহারাজ, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এর তো দুটো অর্থ, আমরা কোন্‌টা নেব?

মহারাজ : দুটোই আমরা নেব। ঠাকুর দুটোকেই সত্য বলেছেন। এই হল ঠাকুরের জীবনের আলোকে শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ। 'বহুনা শ্রুতেন'—অনেক শুনলেও হবে না। কেন? এরকম আছে—ব্রহ্ম সম্পর্কে শাব্দ জ্ঞান, পরোক্ষ জ্ঞান নয়—অপরোক্ষ জ্ঞান। 'তত্ত্বমসি'—শোনার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। এসম্বন্ধে বিচার আছে—বলে, ব্রহ্ম সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্থাৎ শাব্দ জ্ঞান কি পরোক্ষ হয়? ব্রহ্ম সম্পর্কীয় জ্ঞান সর্বদাই অপরোক্ষ। হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, এত শুনেও জ্ঞান হচ্ছে না। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে—ব্রহ্ম সম্পর্কীয় শাব্দ জ্ঞান হয়েছে, অপরোক্ষ জ্ঞান হয়নি। কারণ, অজ্ঞান বিনষ্ট হয়নি। অপরোক্ষ জ্ঞান হলে অজ্ঞানের নাশ হতো।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলছেন, বাসনা ক্ষয় না হলে অনুরাগ হয় না। কিভাবে বাসনা ক্ষয় করা যায়?

মহারাজ : বিচারের দ্বারা হয়, প্রার্থনার দ্বারা হয়। ঠাকুর এও বলেছেন, অনুরাগ-বায়ু খপ খপ করে কাম-ক্রোধাদি খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ, অনুরাগ হলে বাসনা যায়। জগৎটা অনিত্য—এই বোধ না হলে বাসনা যায় না।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর এত প্রার্থনার কথা বলেছেন। আমরা প্রার্থনা করি, কিন্তু ঠিক যেন কার্যকরী হয় না।

মহারাজ : কারণ, বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস নেই যে, তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করতে পারেন। ঠাকুর যেমন বলেছেন নদীতে নেমে রামনামও করব, আবার অবিশ্বাসে কাপড়ও তুলব—তা হবে না।

—কতদিন এরকম প্রার্থনা করতে হবে?

মহারাজ : যতদিন না তিনি দিচ্ছেন। দেখ না, ভিখারি কিরকম এক জায়গায় পড়ে থাকে। শুধু বলে—মা একটি পয়সা দাও, মা একটি পয়সা দাও।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলছেন—'শক্তির অবতার'। একথাটির মানে কী?

মহারাজ : ব্রহ্ম তো নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু অবতরণের জন্য তো একটি ব্যক্তিরূপ চাই। তাই শক্তির অবতার। এইজন্য সাধারণত বলে—বিষ্ণুর অবতার। অবতার তো আসেন রক্ষা করতে। বিষ্ণু হলেন সৃষ্টির রক্ষাকর্তা। যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনজনই শক্তি। যখন সংহার করছেন পরমেশ্বর, সেও ব্রহ্মেরই শক্তি।

প্রশ্ন : মহারাজ, ভাগবতে বলা হচ্ছে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।' তারপর এরকম আছে—পূর্ণাবতার, অংশাবতার, কলাবতার। অবতারের আবার এরকম ছোট-বড় হয় নাকি?

মহারাজ : তাই তো। সব মায়ের কাছেই তার ছেলে সবচেয়ে সুন্দর। অবতারের আবার ছোট-বড় কী? এক ভগবানই আসছেন। তবে আমি বলি, যেসময়ে বা যুগপ্রয়োজনে যতটা শক্তিপ্রকাশের প্রয়োজন হয়েছিল, সেটুকু শক্তিই তিনি সে-যুগে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, ছোট-বড় যা

বলছি তা শুধু শক্তিপ্রকাশের তারতম্য। স্বামীজী তো ঠাকুরকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বললেন। অবতারের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ কী?

—মহারাজ, তাহলে কি আমরা ধরে নেব, এবারে শক্তির প্রকাশ সবচেয়ে বেশি হয়েছিল?

মহারাজ : সে-ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখ। স্বামীজী তো এও বলেছেন—এবারের পতন পূর্বেকার সকল পতনকে ছাড়িয়ে গেছে। এবারের পতনের তুলনায় পূর্বের পতনগুলি গোষ্পদতুল্য।

—মহারাজ, অবতারের তো কোন প্রারব্ধ কর্মের বশে দেহধারণ নয়। তবে কিভাবে তাঁর দেহধারণ সম্ভব হয়?

মহারাজ : গীতায় ভগবান বলছেন—'সম্ভবামি আত্মমায়য়া' অর্থাৎ, নিজের মায়ার দ্বারা দেহধারণ করি। কেন করেন?—'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' অর্থাৎ লোককল্যাণের জন্য। জগৎকল্যাণরূপ ব্রতই তাঁর দেহধারণের কারণ।

প্রশ্ন : লীলাপ্রসঙ্গে আছে, ঠাকুর একদিন জানতে পারলেন, তাঁর মুক্তি নেই। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে দেবেন?

মহারাজ : ঐ জগৎকল্যাণরূপ ব্রত থেকে তাঁর মুক্তি নেই। যখনি প্রয়োজন, জগৎকল্যাণের জন্য তাঁকে বারবার আসতে হবে। এই বারবার আসা থেকে নিবৃত্তি নেই।

—হ্যাঁ মহারাজ, লীলাপ্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, জমিদারির যেখানেই গণ্ডগোল দেখা দেয়, সেখানেই গোলোক চৌধুরীকে পাঠানো হয়।

মহারাজ : হ্যাঁ, সেখানে গোলোক চৌধুরীকে পাঠানোর কথা আছে। কিন্তু এখানে তাঁকে কেউ পাঠায় না। তিনি নিজেই আসেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, রোজই তো একটু একটু তত্ত্বকথা হচ্ছে, আজ একটু সাধনের কথা বললে ভাল হয়। ঠাকুর বলেছেন—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। এই ত্যাগের কথা কিছু বলুন।

মহারাজ : একজন ঠাকুরকে বলছে—মহাশয়, ভবনাথ পান, মাছ ত্যাগ করেছে। ঠাকুর শুনে বলছেন—পান, মাছ ত্যাগ করা আর কী ত্যাগ! কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। ধর, কেউ cash-এ কাজ করে, একজন চাঁদা দিতে এলে নেবে না বুঝি? যেহেতু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছে! হয়ত বা ডাক্তারি করছে, মহিলা রোগী এলে দেখবে না বুঝি? বা কোন মহিলা বিপন্ন হয়েছে, তাকে সাহায্য করবে না বুঝি? আক্ষরিক অর্থ ধরলে হবে না, ভাবটা নিতে হবে।

—মহারাজ, ঠাকুর তো সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে আন্তর এবং বাহ্য দুই-ই ত্যাগের কথা বলেছেন।

মহারাজ : এইবারই তো মুশকিল করলে।

—ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসী কামিনীর মুখের দিকেও তাকাবে না। আমাদের বাস্তব জীবনে এটা পালন করা কি সম্ভব?

মহারাজ : বাস্তবসম্মত করে নেবে। যতটুকু পালন করা সম্ভব, ততটুকু করবে। আসল কথা, কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করতেই হবে।

—মহারাজ, ঠাকুর তো বলছেন, যত সেয়ানাই হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে কালি একটু লাগবেই।

মহারাজ : তোমরা কি কাজলের ঘরে আছ?

—এই টাকা-পয়সা ঘাঁটছি...

মহারাজ : ওগুলো মোটেই কাজল নয়। আসক্তি থাকলেই ওগুলো কাজল। আসক্তি না থাকলে ত্যাগ করারও কিছু থাকে না। আসক্তি রয়েছে, অথচ বিষয় থেকে দূরে রইলে—এটা ত্যাগ হল না। আবার আসক্তি না থাকলে বিষয়ের মধ্যে থেকেও কোন ক্ষতি হয় না। ভেতরে যে ভোগের বাসনা, সেটাকে দূর করতে হবে। শুধু বিষয় থেকে দূরে থাকলে কী হবে? "রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।" (গীতা, ২।৫৯) বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে—"ভিক্ষুঃ হিরণ্যং রসেন ন স্পৃহয়তি।" আমরা এরকম সাধু দেখেছি, সে টাকা-পয়সা একটি পুঁটলিতে বেঁধে রাখত। রিকশাভাড়া দেওয়ার সময় রিকশাওয়ালাকে বলত—পুঁটলিটা খুলে পয়সা নিয়ে আবার

পুঁটলিটা বেঁধে দাও। এসব হচ্ছে ত্যাগের ক্যারিকেচার! (সকলের হাসি) শরীর রাখার জন্য যতটুকু দরকার, সেটুকু নিতে হবে। ধর, খেতে হবে, নাহলে মরে যাবে। জামাকাপড় না পরলে পুলিশ ধরবে। (সকলের হাসি) পরিব্রাজক হয়ে বাইরে বাইরে ঘুরলে অসুখ হবে, ডাক্তার লাগবে, আমাদের খরচ আরো বেড়ে যাবে। (সকলের হাসি) শরীরের প্রয়োজনে যতটুকু দরকার সেটুকুই নেবে। যত কম নেওয়া যায়, ততই ভাল। আমি বলি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করাই অপরিগ্রহ। এব্যাপারে সকলের জন্য কোন একটা ধরাবাঁধা নিয়ম হয় না। একজনের প্রয়োজন হয়ত আরেকজনের বিলাসিতা। বিপরীতক্রমে, একজনের পক্ষে যেটা বিলাসিতা, অন্যের হয়ত সেটা প্রয়োজন। খুব বিচার করবে। নিজেকে খুব বিশ্লেষণ করবে। আরেকটা কথা, ত্যাগের অভিমান পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে। 'আমি তো ত্যাগ করেছি'—এই অভিমানও থাকবে না। 'যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ'—যা দিয়ে ত্যাগ করেছ অর্থাৎ অহং, সেটিও ত্যাগ করতে হবে।

শ্রীমা আরো কঠিন কথা বলেছেন—সন্ন্যাসী কাঠের মেয়েমানুষ হলেও পায়ে উলটে দেখবে না। এটি ভাগবতে (১১।৮।১৩-১৪) আছে—

"পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গাসঙ্গাতঃ॥
নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা॥"

অর্থাৎ, ভিক্ষু কাষ্ঠময়ী যুবতীকে পদদ্বারাও স্পর্শ করবেন না। যদি স্পর্শ করেন তবে হস্তিনীর অঙ্গাসঙ্গের জন্য হস্তির ন্যায় গর্তে পড়ে নষ্ট হবেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনো নিজের মৃত্যুস্বরূপ কোন নারীতে আসক্ত হবেন না। যদি আসক্ত হন তবে গজ যেমন অন্য গজ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিনষ্ট হয়, সেরূপ তিনিও বলবান পুরুষ দ্বারা নিহত হবেন।

॥ ২৯ ॥

প্রশ্ন : ঠাকুর ও মা কী অর্থে অভেদ?

মহারাজ : ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—এই অর্থে।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী সমাধিতে ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন বলে ঠাকুর বলেছিলেন, এর চেয়েও আরো উচ্চ অবস্থা আছে। সে-অবস্থাটা কী?

মহারাজ : পরার্থে আত্মবিসর্জন, আত্মসমর্পণ।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর স্বামীজীকে বলছেন, তোকে আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকির হলাম। ফকির হলাম বলছেন কেন?

মহারাজ : আনন্দে আর কী!

—তা কাঁদছেন কেন?

মহারাজ : সেও আনন্দে। এ আনন্দাশ্রু। এই ভেবে আনন্দ যে, এতদিনে ঠিক উপযুক্ত একজনকে পাওয়া গেছে—যে তাঁর ভাবের উত্তরাধিকারী। আর শক্তি দিলেই কি শক্তি কমে যায়? "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" পূর্ণ থেকে পূর্ণ দিলে পূর্ণই থাকে।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য কী? কী কী শাস্ত্র আমাদের পড়া উচিত সেবিষয়ে একটু বলুন। অনেকে বলে, শাস্ত্র পড়লে পাণ্ডিত্য হয় আর ফলে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার হয়।

মহারাজ : কে বললে, শাস্ত্র পড়লে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার হয়? যে বলেছে সে কি শাস্ত্র পড়েছে?

—মহারাজ, ঠিক এই কথা একবার গম্ভীরানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন। একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— মহারাজ, অনেকে বলে শাস্ত্র পড়ার কী দরকার? শাস্ত্র পড়লে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার হয়। মহারাজও সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন—কে বললে শাস্ত্র পড়লে অহঙ্কার হয়? যে বলেছে সে কি শাস্ত্র পড়েছে?

মহারাজ (একটু হেসে বললেন) **:** দেখলে তো সব এক সুরে বাঁধা। ঠাকুর বলেছেন, একজন চিঠি লিখেছিল। চিঠিখানা পড়া হয়নি, হারিয়ে গেল। তখন সকলে মিলে খুঁজতে লাগল। যখন চিঠি পেয়ে গেল—পড়ে

দেখলে, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাবে। তখন চিঠিটা ফেলে দিলে, আর পাঁচ সের সন্দেশ আর কাপড় যোগাড় করতে লাগল। তেমনি শাস্ত্রের সার জেনে নিয়ে আর বই পড়ার কী দরকার? তখন সাধন-ভজন। এই হচ্ছে কথা। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত জেনে নিয়ে আর শাস্ত্র পড়ার দরকার নেই। তারপর সেগুলো জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে, জীবনে আয়ত্ত করতে হবে।

—কতদিন পড়তে হবে?

মহারাজ : যতদিন না সিদ্ধান্ত পাকা হচ্ছে।

—শাস্ত্র পড়ে তো অহঙ্কার হতে পারে যে, আমি অনেক পড়েছি, আমি একজন পণ্ডিত।

মহারাজ : না, অহঙ্কার হয় না। হবে না কেন বলছি—শাস্ত্রে যা করার বা হওয়ার কথা বলা আছে যখন দেখা যাবে আমার তার কিছুই করা হয়নি, তখন অহঙ্কার হবে কোত্থেকে?

—কিরকম বই পড়া উচিত?

মহারাজ : যেমন এখন আমাদের আর ফিজিক্স পড়ার দরকার নেই। আমাদের জীবনের সঙ্গে যার যোগ আছে এবং সাধন-ভজনের উপযোগী, সেইসব বই পড়া দরকার।

—তাহলে এইধরনের বইগুলো খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে।

মহারাজ : শুধু মনোযোগ দিয়ে পড়া নয়। সে তো পণ্ডিতরাও খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে, নিজেদের জীবনে ওগুলো কোন কাজে লাগে না। সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ইত্যাদি থাকা দরকার।

—অনেক সময় তো পড়তে ভাল লাগে, আনন্দ পাই, তাই পড়ি।

মহারাজ : ভাল লাগা বা আনন্দ পাওয়া শাস্ত্র পড়ার উদ্দেশ্য নয়। আনন্দ তো নভেল নাটক পড়েও লোকে সহজে পায়। আরো সহজে আনন্দ পায় সঙ্গীতে। বলে :

“কাব্যেন দর্শনং হন্তি, কাব্যং গীতেন হন্যতে।
গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন, সর্বং হন্তি বুভুক্ষুতা॥”

অর্থাৎ দর্শনাদি শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। তবু কাব্যের রস আস্বাদনের জন্য সময় প্রয়োজন, বিচার করতে হয়। কিন্তু আরো সহজে রস পাওয়া যায় সঙ্গীতে। শুধু কানে গেলেই হল। যদি ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্তি থাকে তবে এরকম গানও পড়ে থাকে। তাতে আর তখন রস পায় না। আর সব রস হরণ করে দারিদ্র। অনাহারে থাকলে কাব্য, গীত, ইন্দ্রিয় সুখভোগ কিছুই ভাল লাগে না।

—মহারাজ, সময় কাটানোর পক্ষেও তো বই পড়া একটা ভাল অভ্যাস।

মহারাজ : না, সময় কাটানো শাস্ত্র পড়ার উদ্দেশ্য নয়। সময় কাটানো যদি উদ্দেশ্য বল তাহলে তো সবচেয়ে সহজ তাস! (মহারাজ তাস খেলায় যেমন তাস মাটিতে ফেলে সেরকম ভঙ্গি দেখালেন) (সকলের উচ্চ হাসি)

—মহারাজ, সঙ্গে আরেকজন থাকলে পড়াশুনার সুবিধা হয়।

মহারাজ : হ্যাঁ, গল্প করতে সুবিধা হয়। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, তপস্যায় গেলে তখন আমাদের দিনচর্যাটা কেমন হওয়া উচিত? তপস্যা সম্পর্কে আমাদের ঠিক ধারণা নেই।

মহারাজ : না, ঠিক আছে। কী আর করবে? ইষ্ট নাম জপ করবে, ধ্যান করবে আর মনকে দেখবে। মনকে খুব বিশ্লেষণ করতে হয়। কী কাজে এলাম, কী কাজে গেল। সময় ঠিক ঠিক ব্যবহার করছি কিনা বিশ্লেষণ করতে হয়। নির্জনবাসের এই লক্ষ্য। কাছে কোন সাধু থাকলে যদি মনের মিল থাকে তাহলে তাঁকে দেখতে হয়, তাঁর জীবনটা লক্ষ করতে হয়।

—মহারাজ, পড়াশোনা করা উচিত?

মহারাজ : পড়াশোনা একটু-আধটু করলেও সেটা গৌণ।

—মহারাজ, কতদিন এরকম একনাগাড়ে তপস্যায় থাকা ভাল?

মহারাজ : যতদিন উৎসাহের সঙ্গে সাধন-ভজন করতে পারবে। উৎসাহ কমে গেলে শুধু রুটি ঠুকে সময় কাটিয়ে কোন লাভ হয় না। এরকম নির্জনবাস এক নাগাড়ে বেশিদিন করা খুব সহজ নয়। মাধবানন্দ স্বামী

একবার বলেছিলেন—ছমাস এরকম থাকার পর মনে হয়েছিল, মাথা একেবারে ফাঁকা। তাহলে ভাব, মাধবানন্দ স্বামীই এরকম বলেছিলেন। তিনি তো আর সাধারণ লোক নন। আর তপস্যায় যাওয়ার আগে মনকে তৈরি করে নিতে হয়। নতুবা লাভ হয় না। আমি তপস্যায় যাব—একথা মহাপুরুষ মহারাজকে বলতেই খুব উৎসাহ দিয়ে মহারাজ বলেছিলেন : "তপস্যায় যাবার আগে খুব জপ-ধ্যান লাগাও, মনকে তৈরি করে নাও।"

—ওঁরা খুব উৎসাহ দিতেন, না?

মহারাজ : অন্তত আমাকে তো দিয়েছেন, আমি তো পেয়েছি। কেন, আমরা কি অন্যরকম বলি?

—না, ঠিক তা নয়। আসলে আমরাই সেরকম করতে পারি না।

মহারাজ : ঠিক তাই।

—মাঝে মাঝে তপস্যায় যাওয়া উচিত তাই তো।

মহারাজ : হ্যাঁ, ছুটি পেলে। নতুবা নাম কেটে দেবে। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, তপস্যা প্রসঙ্গো মাধবানন্দজী বলেছিলেন— 'মাথা ফাঁকা হয়ে যাওয়া'। মাথা ফাঁকা হয়ে যাওয়া মানে কী?

মহারাজ : মানে, মাথা আর চিন্তা করতে পারছে না।

—মহারাজ, তপস্যার স্থান দুরকম হয়—এক আমাদেরই কোন আশ্রম, আর এক বাইরের কোথাও। কোন্‌টা পছন্দ করা উচিত?

মহারাজ : বাইরে থাকা উচিত। শুধু আমাদের আশ্রম নয়। এমনকি সেখানে যেন পরিচিত কেউ না থাকে। জনসমাজ থেকে দূরে থাকতে হয়। ভিক্ষা করে খেতে হয়। এটা-ওটা ব্যবস্থা করা, দুধের যোগাড় করা—এসমস্ত করতে নেই। এসব করলে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। আর চলে আসার কথা ভাবতে নেই। আমাকে যখন তপস্যার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন কতদিনের জন্য তা কিছু বলেননি। এরকমই করতে হবে। যতদিন পারা সম্ভব ততদিন করে ফিরে আসতে হয়।

—মহারাজ, তপস্যার জন্য প্রস্তুতির কথা বলছিলেন। প্রস্তুতিটা কিরকম?

মহারাজ : মনকে অন্তর্মুখী করা। মনের ছোটাছুটি যখন কিছুটা কমে এসেছে, মন কিছুটা শান্ত হয়েছে, তখন তপস্যায় গেলে লাভ হয়। আর অন্তর্মুখী করার উপায় ঐ জপ-ধ্যান। প্রস্তুতি মানে টাকাপয়সা যোগাড় করা—দুধ-টুধের ব্যবস্থা করা নয়! (সকলের হাসি)

—দুধ-টুধের ব্যবস্থা তো করা যাবে না বলছিলেন।

মহারাজ : না, তা করা যাবে না।

—আসলে দীর্ঘ সময় বসার অভ্যাসও করা দরকার।

মহারাজ : দীর্ঘ সময় বসা নয়, মনকে বশে রাখার অভ্যাস দরকার।

প্রশ্ন : মহারাজ, শাস্ত্রপাঠ প্রসঙ্গে বললেন, সেই ধরনের বই আমরা পড়ব, যেগুলি আমাদের সাধন-ভজনের উপযোগী। এখন বাস্তব সমস্যা কি হয়, হয়ত সেরকম বই-ই পড়ছি—ধরুন, গীতা বা উপনিষদ্। পড়তে পড়তে এক এক জায়গায় ন্যায়ের প্রসঙ্গ আছে, মীমাংসা বা ব্যাকরণের প্রসঙ্গ আছে। তখন সে-বিষয়গুলি বোঝার জন্য ন্যায় বা মীমাংসার বই থেকে দেখে নিতে বা কারো কাছে শুনে নিতে দু-তিনদিন সময় চলে যায়। তখন মনে হয়, আরে এ কী করছি! এগুলোর সঙ্গে মূলের কোন সম্পর্ক নেই, সাধন-ভজনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। খুব বিভ্রান্ত হই, কী করব বুঝতে পারি না। এই প্রসঙ্গগুলি কি উপেক্ষা করব?

মহারাজ : হ্যাঁ, ও আমাদের দরকার নেই। ওসব পাণ্ডিত্যের জন্যে। শোন, একবার আমার কী হয়েছিল। তপস্যায় ছিলাম তখন। সঙ্গে একটা ছোট গীতা ছিল। ঐটি পড়তাম। একদিন একটা শ্লোক পড়ছি। পড়তে পড়তে ইচ্ছে হল দেখি—শ্রীধর স্বামীর টীকাটা কী বলছে? খুলে পড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণ পড়ে মনে হল—না, মন তো দুষ্টুমি করছে। সঙ্গে সঙ্গে বইটা বন্ধ করে তুলে রাখলাম।

—ন্যায়-মীমাংসার প্রসঙ্গ দূরের কথা, টীকা পড়াই বন্ধ করে দিলেন! কিন্তু বলা হয়—বেদ-বাক্যের অর্থ বুঝতে হলে বেদাঙ্গ পড়তে হবে।

মহারাজ : ওসব পণ্ডিতদের জন্যে।

—শাস্ত্রপাঠ প্রসঙ্গো বলছিলেন—যতদিন না সিদ্ধান্ত পাকা হচ্ছে। কথাটির অর্থ কী?

মহারাজ : যতদিন না সিদ্ধান্ত নিঃসন্দিগ্ধ হচ্ছে।

—পড়া বা শোনার পর সিদ্ধান্ত নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া তো অভ্যাসের ওপর নির্ভর করছে। আর কি বারবার পড়ার দরকার আছে?

মহারাজ : অভ্যাসই কর না। পড়া মানে—শ্রোতব্য। এর পরে মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। মনন করতে হবে, চিন্তা করতে হবে এবং নিদিধ্যাসন করতে হবে।

—তাহলে আর তো পড়তে হবে না।

মহারাজ : না, পড়তেও হবে, মনন-নিদিধ্যাসনও করতে হবে। একইসঙ্গো চলবে। তখন পড়াটা অনুশীলনের মধ্যে। আগে শুধু পড়ব তারপর শুধু মনন করব তারপর শুধু নিদিধ্যাসন করব—এরকম হয় না। সবই একসঙ্গো করে যেতে হয়।

—তাহলে, ঠাকুরের গল্পে চিঠি পড়ে ফেলে দেওয়ার সঙ্গো ঠিক এটা মিলছে না। সিদ্ধান্ত জানার পরেও বারবার পড়তে হচ্ছে।

মহারাজ : হ্যাঁ। সেখানে বস্তু কী পেতে হবে সেটা স্থির হয়ে গেছে। আমাদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য স্থির করতে পড়া। বস্তুলাভ হলে আর না পড়লেও চলবে।

॥ ৩০ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত। সংঘের সঙ্গো আমাদের সম্পর্ক কিরকম হওয়া উচিত—এসম্পর্কে একটু বলুন।

মহারাজ : সংঘ উপাস্য আর আমরা উপাসক—এই সম্পর্ক।

—আরেকটু বিস্তৃত করে বলুন।

মহারাজ : হ্যাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের উপাস্য, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপাসক। শ্রীরামকৃষ্ণ—সংঘমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের যে-ভাব, যে-আদর্শ, সেটি সংঘের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে, সংঘের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর

ভাব বা আদর্শ সংঘরূপে মূর্তি ধারণ করেছে এবং এই সংঘের মধ্য দিয়েই তাঁর ভাব প্রচারিত হচ্ছে।

—মহাপুরুষ মহারাজ এক জায়গায় বলেছেন, "সংঘের আদেশই ঠাকুরের আদেশ।" এই কথা বুঝব কী করে?

মহারাজ : শুধু মহাপুরুষ মহারাজ কেন? স্বামীজীও বলেছেন, সংঘের আদেশই ঠাকুরের আদেশ।

—কখনও হয়ত মোহন্ত মহারাজ এমন কিছু করতে বললেন, যেটা সাধুজীবনের পরিপন্থী। সেক্ষেত্রে এই আদেশকে ঠাকুরের আদেশ বলে কী করে মনে করব?

মহারাজ : মোহন্ত মহারাজের সব কথাই যে অকাট্য হবে, এমন তো কথা নেই। ঠাকুরের জীবনের সঙ্গে, ঠাকুরের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। তবে এরকম মেলানো খুব কঠিন, আদৌ সহজ নয়। কারণ, আমরা আমাদের মন দিয়ে বিচার করি, তুলনা করি। আমাদের মনে রয়েছে অশুদ্ধি। অশুদ্ধ মন দিয়ে বিচার করলে বিচারের মধ্যে ত্রুটি থেকে যায়। তবে স্বামীজী সংঘের আদেশ বলতে সম্মিলিত সংঘের আদেশের কথা বলেছেন। সম্মিলিত সংঘের ওপর স্বামীজী অনেক দায়িত্বও দিয়েছেন।

—মহারাজ, সম্মিলিত সংঘ বলতে কি অছিদের বুঝব?

মহারাজ : বাব্বা! তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখছি তোমাদের খপ্পরে পড়ে গেছি! (সকলের হাসি) অছি বলতে ব্যক্তিবিশেষ নয়। অছি পরিষদের সম্মিলিত আদেশকে ঠাকুরের আদেশ মনে করতে পার। সেখানেও যে ভ্রম থাকবে না—এমন নয়। সম্মিলিত সংঘের আদেশকেও ঠাকুরের জীবনের এবং ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুর বেদস্বরূপ। বেদের বাক্য যেমন সহজে বোঝা যায় না, গুরু এবং আচার্যদের কাছ থেকে বেদবাক্যের অর্থ বুঝে নিতে হয়—সেরকম এখানেও সম্মিলিত সংঘের আদেশকে ঠাকুরের জীবনের আলোকে বিচার করে নিতে হবে। আর রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত মানে শুধু সংঘের

খাতায় নাম থাকা নয়, ব্যাপক অর্থে রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত মানে—যে শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমাদের সংঘের খাতা থেকে তুমি কারো নাম কাটতে পার, কিন্তু ব্যাপক অর্থে যে রামকৃষ্ণ-ভাবের অন্তর্ভুক্ত, সেখান থেকে কারো নাম কাটতে পার না।

—তাহলে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনও রামকৃষ্ণ সংঘের মধ্যেই পড়বে?

মহারাজ : হ্যাঁ, সারদা মিশনও ব্যাপক অর্থে রামকৃষ্ণ সংঘেরই অন্তর্ভুক্ত।

—মহারাজ, স্বামীজী যে আমাদের সংঘ স্থাপন করলেন, ঠাকুরের কাছ থেকেই যে তিনি এর আদেশ বা নির্দেশ পেয়েছিলেন—এবিষয়ে পুরনো সাধুদের কাছে কিছু শুনেছেন?

মহারাজ : হুঁ, তোমাকে সাক্ষী রেখে ঠাকুর নির্দেশ দেবেন নাকি? শোননি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের দরজা বন্ধ রেখে ঠাকুর স্বামীজীকে কত কী বলতেন? তাহলে বোঝ, স্বামীজী ভুঁইফোড় নন।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের তো সন্ন্যাস হয়েছে। আমরা কি আমাদের মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের (আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে) প্রণাম করতে পারি?

মহারাজ : কেন পারবে না? কী হয়েছে তোমাদের? সন্ন্যাস হয়েছে বলে কি ধিঙ্গি হয়েছ? করবে। যখন সাধু-ব্রহ্মচারীদের মা-বাবারা আসে বা যখন তারা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে, তখন আমি বিশেষভাবেই বলে দিই মা-বাবাকে প্রণাম করতে। কারণ, অনেকের এরকম একটা সংশয় থাকে—বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের যে, এখন কি বাবা-মাকে প্রণাম করা ঠিক হবে? রাজা মহারাজ যখন ঠাকুরের কাছে রয়েছেন, একদিন মহারাজের বাবা এসেছেন। মহারাজ ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন : "বাবার এঁটো খাব কি?" ঠাকুর বলছেন : "কেন খাবিনি? তোর কী হয়েছে?" (একটু চুপ করে থেকে)

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

(শিক্ষাষ্টকম্, শ্লোক-৩)

[জনৈক সন্ন্যাসী পূজনীয় মহারাজের সাথে মধ্যপ্রদেশে গেলে তাঁর বাবা-মা মহারাজের দর্শনে আসেন। মহারাজ উক্ত সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন মা-বাবাকে তাঁর সামনেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে।]

প্রশ্ন : মহারাজ, কথামৃতে দেখা যায় ঠাকুর কোন প্রসঙ্গ করছেন। মাস্টারমশায় বা অন্য কেউ বলছেন : "হ্যাঁ, শুনেছি।" ঠাকুর বলছেন : "শুধু শুনলে হবে না, ধারণা চাই।" 'ধারণা চাই' বলতে ঠাকুর কী বুঝিয়েছেন?

মহারাজ : ধারণা চাই মানে—কথাটায় বিশ্বাস চাই। এক কান দিয়ে শুনলাম, আরেক কান দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল এরকম নয়। ধারণা কথাটা 'ধৃ' ধাতু থেকে এসেছে। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধরে থাকা। যা সত্য বলে জানছি তাকে ধরে থাকার অর্থ ধারণা।

প্রশ্ন : মহারাজ, ত্যাগ-তপস্যা-তিতিক্ষার কথা হচ্ছিল। এবিষয়ে দুরকম মত দেখি। একটি হল—কঠোরতা, তিতিক্ষা খুবই দরকার। শরীরের দিকে লক্ষ রাখার দরকার নেই। আবার কেউ বলেন—না, শরীরটা তাঁর মন্দির। তাকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। কোন্‌টি সত্য?

মহারাজ : দুটো কথার মধ্যেই সত্যতা রয়েছে। তবে যারা বলে—'দেহটা তাঁর মন্দির তাকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে' ইত্যাদি, দেখতে হবে তাদের ভাবের ঘরে চুরি আছে কিনা। কথাগুলো আপাত মনোহর।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনারা ঠাকুরের সন্তানদের জীবনে যেরকম ত্যাগ-তপস্যা দেখেছেন সেসম্পর্কে একটু বলুন।

মহারাজ : ঠাকুরের সন্তানদের যখন আমরা দেখেছি, তখন তাঁরা বৃদ্ধ। তাঁদের তপশ্চর্যা বা তিতিক্ষার সময় তো তাঁদের দেখিনি। তবে সেসব কথা তাঁদের কাছে শুনেছি। এককালে তাঁরা কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন, করে শরীরকে ক্ষয় করেছেন। তারপর শেষবয়সে আর ততটা কঠোরতা করেননি। সকলের কল্যাণের জন্য শরীরটাকে রেখেছেন। শরীরকে যতটা সম্ভব যত্ন করেছেন। সে তো তাঁদের শেষ বয়সে। তোমরা যদি এখনই তোমাদের শরীরকে বাঁচিয়ে চলতে চাও তবে শরীরটাকে ব্যবহার করবে

করবে? (কথাটা একটু হয়ত আমাদের পক্ষে শক্ত হয়ে গেল ভেবে মহারাজ কথাটা বলেই একটু মৃদু হেসে সু—মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন—তাই না?)

—যখন আপনারা তাঁদের দেখেছেন, তাঁদের জীবনে নিয়মানুবর্তিতা, সাধারণ জীবনযাপনের ভাব—এসব নিশ্চয় লক্ষ করেছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। তাঁরা খুব সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। যেমন, শরৎ মহারাজের জীবনের একটি ঘটনা বলি। একবার তীর্থে যাচ্ছেন। Third class-এ travel করতেন। Third class-এই টিকিট হয়েছে। সেবার ঐ গাড়িতেই তাঁর শিষ্যা পুঁটিয়ার রানিও যাবেন। তাঁদের টিকিট first class-এ। First class ছাড়া তাঁরা কখনো travel করেননি। এখন তাঁরা পড়েছেন মুশকিলে। তাঁরা যাবেন first class-এ, আর তাঁদেরই গুরু যাচ্ছেন third class-এ। শরৎ মহারাজকে খুব অনুরোধ করা সত্ত্বেও মহারাজ first class-এ travel করতে রাজি হলেন না। মহারাজ বললেন : "আমি আমার মতো যাই, তোমরা তোমাদের মতো যাও।" শেষে তাঁদের সব টিকিট বাতিল করে মহারাজের সঙ্গে একটা inter class compartment reserve করা হল, third class-এর ওপরে ছিল inter class, তারপরে second class। তবে তখনকার দিনে inter class-এও একটু সামান্য গদি থাকত।

—শরৎ মহারাজের চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া কেমন ছিল?

মহারাজ : খাওয়া-দাওয়া! যখন তাঁরা ভিক্ষে করে খেয়েছেন তখন তাঁদের কেউ পোলাও-কালিয়া রেঁধে খাওয়ায়নি। (সকলের হাস্য) তবে শেষের দিকে খাওয়া একটু ভাল হয়েছে। ভাল মানে কিন্তু আড়ম্বর নয়। একটু ভাল। মানে, আমাদের খাওয়া যদি third class হয়, তবে ওঁদেরটা inter class। এই আর কী! (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের জীবনে ত্যাগ-তপস্যার ভাব কিরকম হওয়া উচিত?

মহারাজ : বাইরে কোন আড়ম্বর থাকবে না, ভিতরে থাকবে ত্যাগ।

—মহারাজ, ত্যাগ এবং ঈশ্বরে অনুরাগের মধ্যে সম্পর্কটা কিরকম? অনেক সময় দেখা যায়, জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে ত্যাগ আসা সত্ত্বেও ঈশ্বরে অনুরাগ আসে না।

মহারাজ : একটি কারণ, অপরটি কার্য। ঈশ্বরে অনুরাগ কারণ আর ত্যাগ কার্য। তবে ঈশ্বরে অনুরাগ না এলেও আমরা ত্যাগ করি।

—মহারাজ, ত্যাগ করব কেন? ঈশ্বরের দিকে কিছু আকর্ষণ না হলে বিষয় ত্যাগ করব কেন? আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কতটুকু হচ্ছে জানি না, কিন্তু ত্যাগ তো আমরা করছি।

মহারাজ : কেন ত্যাগ করবে?

—কিছুটা আবেগ, আর আদর্শবোধ। যেহেতু জানা আছে যে, ঈশ্বরকে লাভ করতে হবে—তাই সেই আদর্শকে সামনে রেখে ত্যাগকে সেই আদর্শলাভের উপায়-রূপে আমরা গ্রহণ করছি। ত্যাগ হলে ঈশ্বরে অনুরাগ হবে—এই আশায়।

মহারাজ : ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবিহীন ত্যাগ অহঙ্কার আনে। সেই ত্যাগের এক কানাকড়িও দাম নেই। ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণেই সব ত্যাগ হয়ে যায়। এরকম দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রয়েছে। দেখ না, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ না করেও তাঁর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিল। সেই আকর্ষণের জন্যই সব ত্যাগ করে আসতে পেরেছিল এবং এসে তাঁকে লাভ করেছিল।

প্রশ্ন : মহারাজ, কর্ম কিভাবে উপাসনারূপে করা সম্ভব?

মহারাজ : যে-কাজটি করছ, সেটি ঠাকুরের—এই মনোভাব নিয়ে করলে কর্মই উপাসনা হবে। আর অহঙ্কার-অভিমানের বশবর্তী হয়ে কাজ করলে তা উপাসনা হবে না।

—কর্মই উপাসনা মানে কি রাজা মহারাজ যেমন বলেছেন—কাজ করতে করতে ভগবানের নামজপ করা?

মহারাজ : তা কি হয়? হয়ত accounts করছ। জপ করবে কিভাবে? জপ করতে গেলে খাতায় শুধু রামনাম লেখাই ভাল। (সকলের হাসি) তা নয়। কাজের শুরুতে তাঁকে ডাকবে, কাজের শেষে তাঁকে স্মরণ
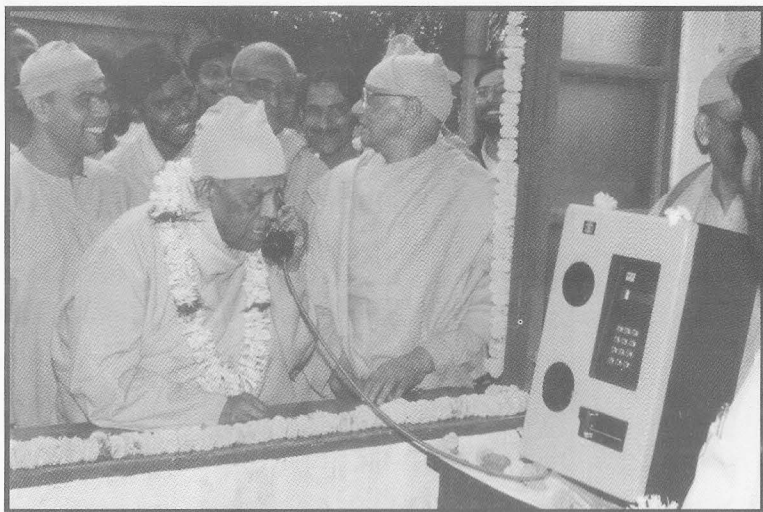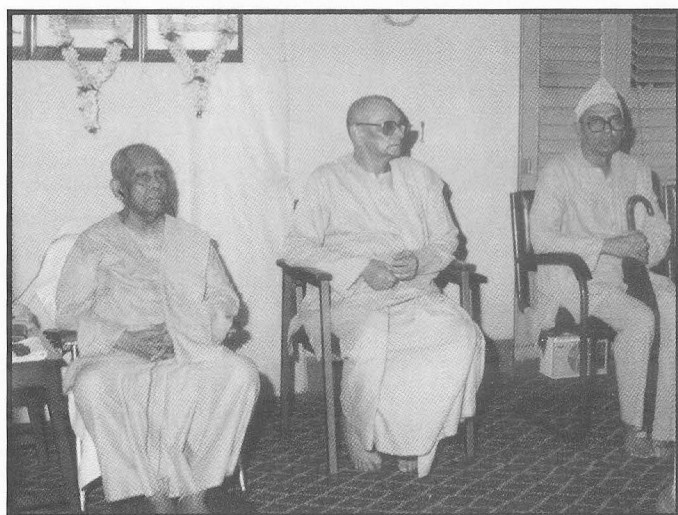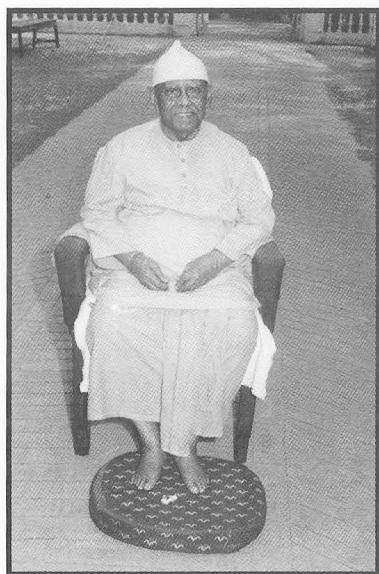
করবে। আর যে-কাজটি করছ সেটি উপাসনা, সেটি তাঁরই কাজ, এই ভাব বজায় রেখে করার চেষ্টা করবে। মাধবানন্দজী বলতেন, আমরা work and worship করতে পারি। কিন্তু স্বামীজী তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি চান, work is worship—কর্মই উপাসনা।

॥ ৩১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, সাধুত্ব বজায় রেখে কিভাবে প্রশাসনিক কাজ করা সম্ভব?

মহারাজ : ভেবে দেখ, চিন্তা কর, তাহলে উত্তর পাবে।

—না মহারাজ, একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলুন।

মহারাজ : বললাম তো, নিজে চিন্তা করে আত্ম-বিশ্লেষণ কর।

—মহারাজ, খুলেই বলছি। প্রশাসনের কাজ মানে তো রাজবুদ্ধি দরকার। সাধুত্ব আর রাজবুদ্ধি একসঙ্গো কিভাবে সম্ভব?

মহারাজ : (একটু যেন বিরক্ত হয়ে) নিজেকে রাজা ভাবছ কেন? দাস ভাব। তাহলেই সাধুত্ব বজায় রেখে প্রশাসনের কাজ করতে পারবে।

—কেউ কেউ বলে কাজ আদায় করতে...

মহারাজ : মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়? মিথ্যা কথা বলতে হয়? ঠাকুর এত করে সত্যের ওপর জোর দিয়েছেন, টাকার জন্যে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। তাতে সংঘ থাকে থাকবে, না থাকে না থাকবে! (মহারাজ গম্ভীর হয়ে চুপ করে আছেন, সকলে নির্বাক) সত্যের সঙ্গো কখনো আপস করবে না। টাকার জন্যে বড়লোকের তোয়াজ করা—তাতে সর্বনাশ হবে।

—কিন্তু মহারাজ, এই কাজকর্মের ফলে মন বহির্মুখী হয়ে যায়।

মহারাজ : খুব আত্মবিশ্লেষণ চাই। যদি কাজটি ঠাকুরের—এই ভেবে কর তাহলে কোন ক্ষতি হবে না।

"যদ্ যদ্ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।"

"নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
আহার করো মনে করো আহুতি দিই শ্যামা মারে॥"

পাটোয়ারি চলবে না।

—কাজকর্মের মধ্যে সকলের সঙ্গে ব্যবহারটা কিভাবে ভাল করা যায়?

মহারাজ : এর জন্যে খুব আত্মবিশ্লেষণ চাই। প্রতি পদে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে হয়। অনেকে বলে—কী! দুদিনের ছেলে আমার মুখের ওপর কথা! জানে না, আজ যে দুদিনের ছেলে কালই সে দশদিনের ছেলে হবে। আমি একজন ক্ষমতাবান উচ্চপদস্থ—এরকম না ভেবে সকলের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করতে হয়। আদেশ না করে বুঝিয়ে বললে মানুষ বোঝে। আসলে নিজেরা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে রেগে গিয়ে গলাবাজি করে। গলাবাজি মানেই আদেশ নয়। একবার এক জায়গায় পড়েছিলাম—একজন commander খুব মিষ্টভাষী। অনেকে তাঁকে দেখে আশ্চর্য হতো। জিজ্ঞেস করত, এত নরম মিষ্টি গলায় কিভাবে command করা সম্ভব? তিনি বলেছিলেন : "Command needs no high pitch."

—ধরুন মহারাজ, আমার সহকর্মী কেউ কয়েকদিনের জন্য কোন তীর্থে যেতে চাইছে। অথচ এখানে বেশ কাজের চাপ। আমি তাকে কিভাবে বোঝাব?

মহারাজ : দেখবে, সে না থাকায় কী অসুবিধা হতে পারে। সেটিই তাকে বুঝিয়ে বলবে। বুঝিয়ে বললে সে বুঝবে। তা না করে যদি খেঁচিয়ে-মেচিয়ে বল—না, যাওয়া হবে না ইত্যাদি, তাহলে তার মনে অসন্তোষ হবে। এরকম ব্যবহার পেলে মনে অসন্তোষ দানা পাকিয়ে ওঠে। পরে তাদের বুঝিয়ে বললেও শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না। প্রত্যেককে তার মর্যাদাটুকু দিতে হয়। মা বলেছেন : "ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়।"

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। চিদাত্মানন্দ (অলোপী মহারাজ) একজন সাধুকে খুব বকেছে। সাধুটি চলে গেলে আমি চিদাত্মানন্দকে বললাম : "মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে।" সে আমার এই কথা শুনে ঐ সাধুটিকে ডেকে আনিয়ে বলল : "বুঝলে? তোমায় বকেছি বলে ভূতেশানন্দ স্বামী আমায় বকেছেন, বলেছেন মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে। তুমি কিছু মনে করো না।" ডেকে এনে এভাবে বলায় তার মনটা

কত হালকা হয়ে গেল, নতুবা তার মনে একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে থাকত।

—আচ্ছা মহারাজ, সবসময় মিষ্টি কথাতে কি কাজ হয়?

মহারাজ : সবসময় রূঢ় কথাতেও কি কাজ হয়?

—আপনি তো সবসময় সকলের সাথেই মিষ্টি কথা বলেন, কিভাবে মিষ্টি কথায় কাজ হচ্ছে?

মহারাজ : কাজ হচ্ছে না তো অ-কাজ হচ্ছে?

—না তা নয়। কিন্তু সত্যি আমরা আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, আপনি কিভাবে সকলের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করতে পারেন!

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর মাকে বলেছিলেন : "কারো কাছে চিত হাত করো না, চিত হাত করলে তার কাছে মাথাটা বিকিয়ে দিতে হয়।" আমরা যে আশ্রমের জন্য লোকের কাছে টাকা চাইছি!

মহারাজ : তুমি তো আর নিজের জন্য চাইছ না, আশ্রমের জন্য চাইছ। আশ্রমের জন্য নিলে তোমার নেওয়া হল না।

—মহারাজ, সাধারণত দেখা যায় লোকে ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে দান করে।

মহারাজ : ব্যক্তিগত প্রভাবে টাকা সংগ্রহই আমাদের অধোগামী করে। দান নিতে গিয়ে যদি নিয়ম লঙ্ঘন করতে হয় তবে তা নেবে না। কিন্তু রেগে-মেগে বলবে না, বিনয়ের সঙ্গে বলবে। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বোম্বেতে collection করি। একজন আমাকে একটা পাড়ায় নিয়ে গিয়েছিল, মানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি নিজে গেলে কিছু দেবে না, তাই ওদের একজন চেনা লোক আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। চাঁদা চাইতে আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করল : "আপনারা নাকি ওখানে (ছাত্রাবাসে) হরিজনদের রাখেন?" আমি জানালাম : "উপস্থিত আমাদের ওখানে কোন হরিজন ছাত্র নেই, তবে পেলে আমরা রাখব।" একথা শুনেই বলল : "না, আমি আপনাদের donation দেব না।" আমিও হাতজোড় করে বললাম : "আপনার donation আমাদের দরকার নেই।"

—মহারাজ, কারো কাছে চিত হাত না করার কথা হচ্ছিল। বললেন যে, নিজের জন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া উচিত নয়। কিন্তু তীর্থ করতে গেলে তো চিত হাত করতে হয়!

মহারাজ : তীর্থে যাবে না।

—তাই!

মহারাজ : হ্যাঁ, আমি তো তীর্থে যেতাম না। তবে তপস্যায় গিয়েছি। আমি যে তীর্থে যেতাম না—এটা কেরামতি কিছু নয়। আমার ইচ্ছে হতো না। এরকমই আমার স্বভাব ছিল। টাকা-পয়সা কেউ না কেউ দিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছেটা তো আর কেউ দিতে পারে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা কর্মযোগ এবং তারই সাথে সাধন-ভজন করার চেষ্টা করছি। অনেকে বলেন, এই গতানুগতিক দিনযাপন ছেড়ে মাঝে মধ্যে তপস্যায় যাওয়া উচিত।

মহারাজ : হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। মাঝে মধ্যে তপস্যায় যাওয়া উচিত। কারণ, সেরকম জীবন তো আমরা এখানে কাজের মধ্যে যাপন করতে পারি না। ঠাকুর যেমন বলতেন : "চাল ঠিক কাঁড়া হয়েছে কিনা মাঝে মধ্যে তুলে দেখতে হয়।" সেরকম আমাদের মনকেও কাজের মধ্য থেকে তুলে নিয়ে দেখতে হয়।

॥ ৩২ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, শুধু ঠাকুর-স্বামীজীর বই পড়লেই কি হয় না? অন্যান্য শাস্ত্র পড়ার কি দরকার আছে?

মহারাজ : ঠাকুর-স্বামীজীর কথাগুলোতে সংশয় যাবে কী করে যদি শাস্ত্রের সাথে তুলনা বা বিচার না কর? আবার, ঠাকুরের জীবন দিয়ে বিচার না করলে শাস্ত্রের অর্থও ঠিকমত বোঝা যায় না।

—মহারাজ, অনেক শাস্ত্রের মধ্যে একেবারে সংক্ষেপে কী পড়া উচিত? অত তো আমাদের পড়া হয়ে ওঠে না।

মহারাজ : গীতা পড়। গীতা সর্ব-শাস্ত্রের সার। শুধু গীতা পড়লেই হয়।

—মহারাজ, গীতা-উপনিষদের শ্লোক বা মন্ত্রগুলো সংস্কৃতে মুখস্থ রাখার প্রয়োজন আছে, নাকি অনুবাদ মুখস্থ রাখলেই চলে?

মহারাজ : অনুবাদ মুখস্থ রাখা কঠিন। শ্লোক বা মূলটি মুখস্থ থাকলে যখন তখন আবৃত্তি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মননের সুবিধা হয়। এজন্যই তো শ্লোকের আকারে এগুলো তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, একদিন বলছিলেন—যেহেতু আমরা কর্মের মধ্যে তপস্যার মনোভাব সবসময় ঠিক বজায় রাখতে পারি না, তাই মাঝে মধ্যে তপস্যায় যাওয়া উচিত।

মহারাজ : সবসময় বজায় রাখতে পার না কী বলছ! বল—কোন সময়ই বজায় রাখা যায় না।

—আবার বলেছেন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া যাবে না। তবে তপস্যায় যাব কী করে?

মহারাজ : যাবে না! তাছাড়া, তপস্যা মানে কি অমুক জায়গায় যেতে হবে, নাকি মনকে সেই অবস্থায় তুলতে হবে?

—তাহলে তো এখানে বসেই হয়।

মহারাজ : বসে তো থাকতে পারবে না। পিছনে ইট বাঁধা আছে যে! (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন : "স্বাধীন ইচ্ছাটুকু তিনিই রেখে দেন, নতুবা জগতে পাপের বৃদ্ধি হতো।" সাধারণ লোক সম্পর্কে একথাটার অর্থ বুঝি। কিন্তু যে-সাধক সিদ্ধ হয়েছেন, যাঁর স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছুই নেই, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সর্বদা চালিত—তিনি যদি কোন গর্হিত কর্ম করেন, তার দ্বারা কি জগতে পাপের বৃদ্ধি হবে?

মহারাজ : প্রথমত, কথাটা ঠাকুর এধরনের সাধক প্রসঙ্গে বলেননি, সাধারণ লোক সম্বন্ধে বলেছেন। যার স্বাধীন ইচ্ছা নেই, তার দ্বারা পাপের বৃদ্ধি হবে না। কারণ, তার কর্তৃত্ববোধ নেই। যার কর্তৃত্ববোধ নেই, তার কোন কর্ম নেই। আর পাপ-পুণ্য কর্মেরই ফল। কর্ম যখন নেই তখন পাপ-পুণ্য কোথা থেকে আসবে?

—যেহেতু তাঁর কর্তৃত্ববোধ নেই, সেহেতু সেই পাপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করবে না—এটা ঠিক, কিন্তু যেহেতু সেই গর্হিত কর্মটা জগতে রয়ে গেল তাতে কি আমরা—অর্থাৎ অন্যেরা—বলতে পারি না যে, জগতে পাপের বৃদ্ধি হল?

মহারাজ : সকলে কি শুধু তার পাপকর্মই দেখবে? তার যে কর্তৃত্ববোধ নেই, সেটা দেখবে না?

প্রশ্ন : মহারাজ, 'নেতি নেতি' করে যাচ্ছি। কোথায় থামব?

মহারাজ : যেখানে আর নেতি করার কিছু থাকবে না।

—কী করে বুঝব?

মহারাজ : আরে, কী করে বুঝব কী? আর নেতি করার কিছুই রইল না, মানে—যা রইল তাই রইল। যেখানে সব সংশয় চলে যায়। যতক্ষণ সংশয় রয়েছে, ততক্ষণ নেতি নেতি চলবে।

—সুতরাং যেখানে থামছি অর্থাৎ যা আমি খুঁজছিলাম, সেটি যেখানে পেলাম—মানে সেটির স্বরূপ সম্বন্ধে জানা হল, তখনি থামব। নতুবা সেটিও তো নেতি করে চলে যাবে।

মহারাজ : ধুৎ! পরের কথা গোড়ায় লাগাচ্ছ। নিজেকে জানে না এমন কেউ নেই। তুমি কি তোমায় জান না?

—জানি, কিন্তু সে-জানা তো সম্পূর্ণ সত্য নয়।

মহারাজ : তা না হোক। যেটুকু জান সেখান থেকে শুরু কর। বিচার করে এগিয়ে যাও।

—বিচার তো করি কিন্তু আবার গুলিয়ে যায়।

মহারাজ : গুলিয়ে না যাওয়ার জন্যই তো নিদিধ্যাসন।

প্রশ্ন : মহারাজ, পঞ্চীকরণ ব্যাপারটা বোঝা খুব সমস্যা। বিশেষ করে বায়ু আর আকাশ। পৃথিবীর যেমন গন্ধ, রং ইত্যাদি আছে, কিন্তু বায়ু আর আকাশের তো সেটা নেই!

মহারাজ : জলের রং, গন্ধ আছে নাকি? আসলে বায়ু, আকাশ—এগুলো বোঝা যায় না সূক্ষ্ম বলে। কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও অনুভব কি হয় না? বায়ুর

অনুভব হয়। আকাশ নিয়ে সমস্যা, তবু তারও অনুভব হয়। অনুভব হলে পঞ্চীকরণ মানতে হবে। আসল কথা, পঞ্চীকরণ বা ত্রিবৃৎকরণ নয়, সেই এক থেকেই যে সৃষ্টি হয়েছে সেটা বোঝানোর জন্যই পঞ্চীকরণ। কোথাও আবার বলছেন ত্রিবৃৎকরণ। যেহেতু পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়ও পাঁচটি, তাই পঞ্চীকরণ। যদি আমাদের ছয়টি ইন্দ্রিয় থাকত, তবে হয়ত হতো ষষ্ঠীকরণ। (সকলের হাসি)

—কিন্তু মহারাজ, ঐ যে ১/৮ করে অনুপাতটা, সেটা কে ঠিক করল?

মহারাজ : সে তো সোজা অঙ্কের হিসাব। একটার আট আনা আর বাকি চারটে থেকে দু-আনা—এ তো সোজা হিসেব। পুরো এক করতে হবে তো।

—এই অনুপাতটা কিভাবে ঠিক হল? ব্যাপারটা কেমন যেন কল্পনা বলে মনে হয়।

মহারাজ : (হেসে) আরে, এ তো কল্পনাই। পঞ্চীকরণ, ত্রিবৃৎকরণ কল্পনাই তো। সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করা চাই। সুতরাং এরকম একটা কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।

—আবার যেমন, চতুর্দশ ভুবন।

মহারাজ : মনে করছ কি চতুর্দশ ভুবন নিচ থেকে পরপর রয়েছে? তা নয়। সেগুলো কল্পনা। এখন কথা হল, এগুলো তো ইন্দ্রিয়গম্য নয়, শাস্ত্রগম্য—শাস্ত্রে বলেছে।

—কিন্তু মহারাজ, স্বামীজী বা অভেদানন্দজী যে cosmology-কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, সেরকমভাবে কি এগুলোর ব্যাখ্যা করা যায় না?

মহারাজ : বিজ্ঞান এগুলো কী ব্যাখ্যা করবে? এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাইরের বিষয়। বিজ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাইরে কিছু জানে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, পঞ্চীকরণের কথা তো শেষ হল না—

মহারাজ : ঐ তো বললাম, পঞ্চভূত রয়েছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। প্রত্যেকটির মধ্যে পাঁচটি উপাদান (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ)

রয়েছে। তবে পাঁচটা আলাদা নাম হল কেন? বলতে পার—একটা নাম হলেই তো হতো। না, তার কারণ প্রত্যেকটির মধ্যে পাঁচটি উপাদান থাকলেও প্রত্যেকটির মধ্যে একটি উপাদানেরই প্রাধান্য রয়েছে। উপাদানের বিশেষ গুণটি সেটির মধ্যে অধিক পরিমাণে রয়েছে। অন্যগুলো কম মাত্রায় থাকায় সেগুলো সূক্ষ্ম। যেমন—পৃথিবীর গুণ গন্ধ; গন্ধ সবগুলোর মধ্যেই আছে। কিন্তু পৃথিবীতে রয়েছে বেশি—মানে আট আনা, আর বাকি চারটে থেকে দু-আনা করে মোট ষোলো আনা পেয়ে গেলে। এই তো হিসাব।

—এটা ইচ্ছেমত ঠিক করা হয়েছে।

মহারাজ : ইচ্ছেমত নয়, গাণিতিকভাবে।

—না, মানে ল্যাবরেটরিতে এগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এরকম অনুপাত পাওয়া যাবে কি?

মহারাজ : এগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম ভূত। সূক্ষ্ম ভূতকে অন্য জিনিসের মতো ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করা যায় না।

॥ ৩৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের তিনটি ব্রতর ওপর জোর দেওয়া হয়—পবিত্রতা, দারিদ্র আর আনুগত্য। পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়— কায়মনোবাক্যে। এই তিনটেই তো প্রয়োজন। কতটা প্রয়োজন?

মহারাজ : কতটা প্রয়োজন কী? এর কি কোন মাপ-জোখ চলে নাকি? পূর্ণ প্রয়োজন। পূর্ণ পবিত্রতা দরকার। সেখানে কোন আপস চলে না। এতটা পবিত্র হব—এরকম বলা চলে না।

—বলা হয় যে, বস্তুলাভ করতে গেলে পূর্ণ পবিত্রতা প্রয়োজন। আবার বলা হয়, পূর্ণ পবিত্র হলে বস্তুলাভ হবে।

মহারাজ : পূর্ণ পবিত্রতা আর বস্তুলাভ কি আলাদা? বস্তুলাভ মানে কি ওপর থেকে একটা জিনিস হঠাৎ পড়বে? না, পূর্ণ পবিত্র হওয়া মানেই বস্তুলাভ।

—মহারাজ, বলা হল : কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা প্রয়োজন। আবার শ্রীমা বলেছেন : "কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়।"

মহারাজ : তুমি কী কলি চাও, না সত্য চাও?

—আমরা তো কলিযুগেই রয়েছি।

মহারাজ : কলিযুগে রয়েছ মানে কলির যেসব গুণ বলা হয়েছে—সেগুলো কর। সেগুলো কি করবে? কলিকে চাও, না কলিকে অতিক্রম করতে চাও?

প্রশ্ন : মহারাজ, দারিদ্র প্রসঙ্গে আগেও আলোচনা হয়েছে। একদিন বলেছিলেন যে, আমাদের কাছে টাকা-পয়সা থাকা উচিত নয়।

মহারাজ : টাকা-পয়সা থাকবে না মানে, টাকা-পয়সার প্রতি মমত্ব থাকবে না। টাকার প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে তা মাটির ঢেলার সমান। যার টাকার প্রতি মমত্ব নেই, তার কাছে মাটিও যা টাকাও তাই।

—কিন্তু মহারাজ, বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের কাছে কিছু টাকা-পয়সা রাখার দরকার মনে হয়। নিজের সামান্য কয়েকটা প্রয়োজন—যেটা আশ্রম থেকে সবসময় দেওয়া হয় না বা দেওয়া যায় না। যদি সেগুলো আশ্রম দেয়, তাহলে আর রাখার দরকার হয় না।

মহারাজ : তার মানে আশ্রমের কাছে পাওনা হল। তা হবে না।

—তবে?

মহারাজ : তবে কী? মরে যাবে! শরীরটাকে শব ভাববে! (খুব দৃঢ়-ভাবে কথাগুলি বলে মহারাজ গম্ভীর হয়ে আছেন)

—আচ্ছা মহারাজ, এবারে আনুগত্য। আনুগত্য কতটা?

মহারাজ : ও! কতটা মানেই আবার আপসের কথা বলছ। কোন সীমা হয় না। পূর্ণমাত্রায়। সত্য কি একটু পালন, আরেকটু পালন নয়—এরকম হয়? আর প্রথমত বল—আনুগত্য কার প্রতি? আদর্শের প্রতি আনুগত্য। তার কি ভাগাভাগি হয়?

—অনেক সময় আমাদের এমন কোন কিছু করতে হয়, যাতে মন পূর্ণমাত্রায় সায় দেয় না—মানে যেন বিবেকে লাগে, আদর্শ থেকে যেন বিচ্যুত হতে হয়। তখন কী করণীয়?

মহারাজ : সংঘ কী? সংঘ কি আদর্শ ছাড়া? যতটা আদর্শের প্রতি অনুরাগ থাকবে ততটাই অনুগত হতে পারবে। আর যতটা পার না ততটাই আপস কর। যতটা আপস কর ততটা কম পড়ে গেল, এটা মনে রাখতে হবে। এমন কাজ, যা করলে আদর্শ থেকে সরে আসতে হবে বলে মনে হবে, তা করবে না। যেমন, মিথ্যে কথা বলবে না। যাতে চরিত্র নষ্ট হয়—এমন কাজ করবে না।

—আচ্ছা মহারাজ, এব্যাপারে প্রত্যেকের তো নিজের বিবেককেই অনুসরণ করা উচিত?

মহারাজ : তাহলেই হয়েছে! নিজের নিজের বিবেককে অনুসরণ করা নয়, শুদ্ধ মন যার হয়েছে তার বিবেককে অনুসরণ করতে হবে।

—মহারাজ, হয়ত সাধারণ সম্পাদক মহারাজ কাউকে কোন কেন্দ্রে যাওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন : "তুমি ওখানে যাও।" তার যদি সেখানে অসুবিধা থাকে এবং না যায়, তাহলে কি সেটা আদেশ উল্লঙ্ঘন হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ, উল্লঙ্ঘন হবে।

—যদি মহারাজকে তার অসুবিধার কথা বলে তাঁকে রাজি করাতে পারে?

মহারাজ : বোঝাতে পারলে তো হয়ে গেল। আসল কথা, নিজেকে বিশ্লেষণ করতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে যে, নিজের সুখ-সুবিধা খোঁজাটাই উদ্দেশ্য, নাকি যথার্থ কোন অসুবিধা আছে। সুবিধাবাদীর কোথাও সুবিধা হবে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, গীতায় ভগবান বলেছেন—

"কর্মণো হ্যপি ৰোদ্ধব্যং ৰোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ ৰোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।" (৪।১৭)

এখানে 'অকর্ম' বলতে কি নিষ্কাম কর্মকে বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : কর্ম সম্বন্ধে বুঝতে হবে। কর্ম মানে শাস্ত্র বিহিত কর্ম। বিকর্ম হল নিষিদ্ধ কর্ম। আর অকর্ম হল কর্তৃত্ববোধরহিত কর্ম অর্থাৎ নিজেকে অকর্তা জেনে কর্ম করা। আর নিষ্কাম কর্মে কর্তৃত্ববোধ থাকে কিন্তু কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না।

—আচ্ছা, মহারাজ, কর্তৃত্ববোধ ছাড়া কি কর্ম হয়?

মহারাজ : তাই। কর্ম করতে গেলে কর্তৃত্ববোধ ছাড়া হয় না। তাই অকর্মকে বলা হয় কর্মাভাস—যেমন কর্ম হচ্ছে 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি'। (গীতা, ৫।৮) আত্মা কোন কর্ম করে না। আমি আত্মা—এইভাবে নিজেকে জেনে যে-কর্ম, সে-কর্ম যেন কর্ম—প্রকৃত কর্ম হচ্ছে না।

—মহারাজ, এই অকর্মের ভাব তো আমাদের নিষ্কাম কর্ম করার সময়ও অভ্যাস করতে পারি?

মহারাজ : তাই করবে। তত্ত্বত নিজেকে অকর্তা জেনে কাজ করতে হবে। আর তার ব্যাবহারিক দিক হল ফলাকাঙ্ক্ষা না করা।

—মহারাজ, আমি কিছু করছি না মানে ঠাকুর করছেন?

মহারাজ : আবার ঠাকুরকে আনছ কেন? আত্মা অকর্তা।

—গুণের ফলে কর্ম হচ্ছে।

মহারাজ : "গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।" (গীতা, ৩।২৮) ইন্দ্রিয়গুলো গুণ, আবার বিষয়গুলোও গুণ। এদের সংমিশ্রণেই কর্ম হচ্ছে। আত্মা এথেকে পৃথক। আত্মা অকর্তা। নিজেকে এরকম জেনে যে-কর্ম, তাই অকর্ম।

—মহারাজ, এই অকর্ম অবস্থাকেই কি কর্মে অকর্ম দর্শন বলা হয়েছে? পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে—

"কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স ব্‌দ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥"

(গীতা, ৪।১৮)

মহারাজ : কর্তৃত্ববোধরহিত যে-কর্ম তা আপাতদৃষ্টিতে কর্ম বলে মনে হলেও সেটি কর্ম নয়, অর্থাৎ অকর্ম। সেইরকম আপাতদৃষ্ট কর্মে যিনি অকর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ সেইরকম কর্মকে কর্ম বলে দেখছেন না এবং যিনি অকর্মে কর্ম দর্শন করেন—তিনিই বুদ্ধিমান। অকর্মে কর্ম দর্শন হল—(মহারাজ চোখ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে দেখালেন) চুপ করে বসে থেকে আমরা ভাবছি, আমি কিছু করছি না। এটা যেন অকর্ম! কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে এরকম চুপ করে বসে থাকাও কর্ম। শাঙ্করভাষ্যে এবিষয়টি পরিষ্কার করে বলা আছে। তোমরা কি ভাষ্য দেখ না?

—না মহারাজ, ভাষ্য দেখি। তবু আপনার কাছ থেকে আরো পরিষ্কার করে নিই।

মহারাজ : তা নাও, পরিষ্কার হচ্ছে কি?

—হ্যাঁ, মহারাজ। এবারে পরিষ্কার।

মহারাজ : বাঃ। তোমরা তো বেশ চট করে বুঝে নাও। (সকলের হাসি)

॥ ৩৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনারা যখন মঠে ছিলেন, সেসময় শাস্ত্রচর্চা কিরকম করতেন, সেবিষয়ে একটু বলুন।

মহারাজ : মঠে আমরা কয়েকজন একসঙ্গে পড়তাম। দুপুরবেলা সকলকে বিছানা থেকে টেনে তুলে এনে পড়তে বসতাম। এই দায়িত্বটা ছিল আমার। তারপর আস্তে আস্তে খসতে লাগল। শেষে রইলাম আমরা দু-তিনজন। এর মধ্যে অনঙ্গ মহারাজ (স্বামী ওঙ্কারানন্দ) ছিলেন। তিনি আমাকে নিয়ে ন্যায় পড়তেন। ব্যাপ্তি প্রকরণ পড়া হল। আমি বললাম, আমি আর পড়ব না। জিজ্ঞেস করলেন, কেন? আমি বললাম, ন্যায় পড়তে বারো বছর লাগে। আপনি কি আমায় গ্যারান্টি দিতে পারেন যে, আমি বেলুড় মঠে বারো বছর থাকব? মহারাজ হাসলেন। যাই হোক, উনি চাইতেন আমাকে নিয়ে একসঙ্গে পড়তে। একজনকে সঙ্গে না পেলে কার সঙ্গে তর্ক করবে, কার সঙ্গে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে? আমাদের পড়াতেন তারাসার পণ্ডিত। ব্রহ্মসূত্রটা খুব যত্ন করে পড়াতেন। নিজের বইপত্র কিছু ছিল না। সব লাইব্রেরির বই। তাতেই নোট করতেন বা দাগাতেন। পরে একবার অনঙ্গ মহারাজ বলেছিলেন : "তোর ব্যবহৃত বইগুলো বা আমার ব্যবহৃত বইগুলো এখন কোথায় কে জানে! মঠ থেকে কোথায় একবার গেলাম। শাস্ত্রের বইগুলো কাপড়ে বেঁধে ঘরে রেখে গিয়েছিলাম। ঘর পরিষ্কার করার সময় কে সব খুলে

সেগুলিকে লাইব্রেরিতে দিয়ে দিয়েছিল।” তারপর Mysore study circle-এ বেশ পড়া হল। মাদ্রাজে এসেও সে-ধারাটা বজায় ছিল। বেশ কয়েকজন একসঙ্গে পড়তাম। ছাত্রদের মধ্যে ছিল স্বামী তপস্যানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও আরো অনেকে। ব্রহ্মসূত্র পড়তাম। ভামতী টীকা খুব ভাল লাগত। সেখানেও আস্তে আস্তে সংখ্যা কমে গেল।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন—অদ্বৈত শেষকথা। এর অর্থ কী?

মহারাজ : অদ্বৈত শেষকথা মানে যার পরে আর কথা চলে না। মানে, বলা-কওয়া আর যায় না। একত্বানুভূতি মানে এই নয় যে, অদ্বৈতই চূড়ান্ত।

—হ্যাঁ মহারাজ। আমরা তো সেরকমই ভাবি।

মহারাজ : এই নিয়ে আমাদের খুব ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এর মানে এই নয় যে, ঠাকুর অদ্বৈতকেই সর্বোচ্চ বলেছেন। ঠাকুর যদি তাই বলেন, তাহলে তাঁর সর্বমতের সমন্বয়—সব মত সত্য ইত্যাদি কথাগুলো টেঁকে না, তিনি শুধু অদ্বৈতী হয়ে পড়েন। তিনি যেমন অদ্বৈতকে সত্য বলেছেন, তেমনি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতকেও সত্য বলেছেন। তিনি সবরকম ভাবেই সাধনা করে সব পথেরই সত্য উপলব্ধি করেছেন। অদ্বৈতকে চূড়ান্ত বললে অন্য সব মতকে ছোট করা হয়। তা ঠাকুরের অভিপ্রায় নয়, সেজন্য ঠাকুর আসেননি। সব মতের সত্যতা এবং সমন্বয়ই ঠাকুরের আদর্শ।

—কিন্তু মহারাজ, শ্রীমা তো বলেছেন, ঠাকুর অদ্বৈত ছিলেন। তোমরা তাঁর সন্তান। তোমরাও অদ্বৈত।

মহারাজ : মা এই কথা বিশেষ জনকে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন। এই কথার দ্বারা ঠাকুরের দর্শন বা ঠাকুরের ভাবকে সীমিত করা যাবে না। ঠাকুর কি শুধুই অদ্বৈতী ছিলেন? দ্বৈতী ছিলেন না? মা অদ্বৈত আশ্রমে পূজা বন্ধ করতে বলেছেন। কৈ বলেননি তো উদ্বোধনের ঠাকুরঘর তুলে দিতে! (সকলের হাসি) ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বরের ইতি করা যায় না, তাঁর অনন্ত ভাব, অনন্ত লাভ। যার যেমন ভাব, তার

তেমন লাভ। আমি সব নিই।—ঠাকুরের এই কথাগুলো মনে রাখবে। শুধু একটা-আধটা কথা নিয়ে বিচার করলে মূল সত্য আমরা ধরতে পারব না।

—মহারাজ, ভগবানের অনন্ত লাভ কী?

মহারাজ : ভগবানের ভাব অনন্ত। সুতরাং তাঁর লাভও অনন্ত। অর্থাৎ, যার যেমন ভগবান সম্পর্কে ধারণা বা আদর্শ, সেরকমই সে উপলব্ধি বা অনুভব করবে। কিন্তু যার যেরকমই উপলব্ধি হোক, বস্তু একটিই। এক বস্তুরই অনুভবের বিভিন্নতায় বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে।

—আচ্ছা মহারাজ, বিভিন্ন মতের আচার্য বা সাধকেরা সত্য বা তত্ত্বকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করছেন। তাহলে আমরা কী করে বলব যে, একই বস্তু রয়েছে? বা একই বস্তুর অনুভব করছে সকলে? এরকমও তো হতে পারে, বস্তু বিভিন্ন রকম রয়েছে বলেই বিভিন্ন জন বিভিন্ন অনুভব করছে।

মহারাজ : না, বস্তু একটিই। কিন্তু ঐ যে বললাম, অনুভবের বিভিন্নতায় প্রকাশটা ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে।

—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এই বাক্যের সত্যতা কোন বিশেষ মতের আচার্য যেমন শঙ্কর, রামানুজ বা মধ্ব—কারো কথাতেই প্রমাণিত হয় না। কী করে বুঝব একথাটি সত্য?

মহারাজ : ঠাকুর বলছেন, সব মত সত্য। সব পথে তিনি নিজে সাধন করে সেই সেই পথের সত্যতা অনুভব করে তবে বলেছেন। অতএব ঠাকুরের কথাতেই আমরা বুঝব, বস্তু একটিই। বিভিন্ন সাধক তাঁদের নিজ নিজ উপলব্ধি অনুসারে তাঁকে ব্যাখ্যা করেছেন।

—হ্যাঁ। একমাত্র ঠাকুরই একথা বলতে পারেন; কারণ, তিনি সবগুলো করেছেন। আর কেউ তো সবগুলো করেননি। আচ্ছা মহারাজ, প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের আদর্শ সমন্বয়ের আদর্শ। আমরা এই সমন্বয়ের ভাবটা কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় ব্যবহার করব? কারণ, সাধনের সময় তো আর সবগুলো নিয়ে করা যায় না। কোন একটাকে নিয়ে তো সাধন করতে হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ। সত্যিকথা বলতে কী, আমরা যা সাধন করছি, তা দ্বৈত। সুতরাং যেরকম করছ সেরকমই করে যাও। সঙ্গে অদ্বৈতজ্ঞান 'আঁচলে বেঁধে' অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্বের সত্যতা মেনে নিয়ে। তাহলেই হল। যেন অদ্বৈত তত্ত্বের সত্যতা ভাবনা-চিন্তার পশ্চাতে থাকে।

প্রশ্ন : মহারাজ আগের দিন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত প্রসঙ্গে কথা হয়েছে। এবিষয়ে 'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে কিছুটা লিখে এনেছি। পড়ব?

মহারাজ : পড়।

—স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন : "ঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকল ভাব বা মতই মানিতেন। তবে বলিতেন, ঐ তিন প্রকার মত মানব-মনের উন্নতির অবস্থানুযায়ী পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। এক অবস্থায় দ্বৈতভাব আসে—তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ধর্মোন্নতির উচ্চতর সোপানে উঠিয়া অপর অবস্থায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আসে—তখন নিত্য নির্গুণ বস্তু লীলায় সতত সগুণ হইয়া রহিয়াছেন, এরূপ বোধ হয়। তখন দ্বৈতবাদ তো মিথ্যা বোধ হয়ই, আবার অদ্বৈতবাদে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাও মনে উপলব্ধি হয় না। আর মানব যখন ধর্মোন্নতির শেষ সীমায় সাধনসহায়ে উপস্থিত হয়, তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণরূপেই কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া তাহাতে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করে। তখন আমি-তুমি, জীব-জগৎ, ভক্তি-মুক্তি, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম সব একাকার!" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ৫৭)

আরেক জায়গায় বলেছেন : "দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব ঠাকুর বলিতেন উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থা-সাপেক্ষ।" (ঐ, সাধকভাব, একবিংশ অধ্যায়, পৃঃ ২১৫)

এখন প্রশ্ন হল, শরৎ মহারাজ তো উল্লেখ করলেন যে, ধর্মোন্নতির শেষ সীমায় মানুষ অদ্বৈতভাবে অবস্থান করে। তাহলে তো অদ্বৈতই উচ্চতম হল?

মহারাজ : না, শেষ সীমা মানে উচ্চতম সীমা নয়। যেখানে শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণরূপেরই কেবল উপলব্ধি হয়—মানে, সগুণরূপে দ্বৈতে যিনি জগদম্বারূপে কল্পিত, তিনিই নির্গুণরূপে উপলব্ধ হন সাধকের কাছে এবং তিনি তখন অদ্বৈতভাবে অবস্থান করেন। একই সত্য বা তত্ত্বের দুটি ভিন্ন অবস্থা। যেটি আগে আসে সেটি নিম্ন এবং যেটি পরে আসে সেটি উচ্চ—এরকম নয়। যে-সাধক যেটিকে লক্ষ্য বা আদর্শ করবে তার কাছে সেটিই উদ্দেশ্য এবং তার পরাকাষ্ঠা লাভই তার কাছে উচ্চতম অবস্থা। অদ্বৈতবেদান্তীর কাছে নির্বিকল্প সমাধি চরম লক্ষ্য; কিন্তু গোপীরা সেটি অনুভব করতে চাইছেন না, গোপীপ্রেমে ভাব, মহাভাব ইত্যাদি হল চরম অবস্থা। দুটি ভিন্নমার্গের উদ্দেশ্যকে নিয়ে উচ্চ-নিচ তুলনা চলে না। ঠাকুরের 'অদ্বৈত শেষ কথা' মানে—যেখানে পৌঁছালে আর ব্যবহার সম্ভব হয় না। অর্থাৎ দ্বৈত নেই। 'শেষ কথা' মানে কথা শেষ।

॥ ৩৫ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"

(১৮।৬৭)

[এই গীতার্থ তুমি কদাচ স্বধর্মানুষ্ঠানবিহীন, অভক্ত বা গুরুশুশ্রূষাহীন ব্যক্তির কাছে বলবে না এবং যে আমাকে মনুষ্যবোধে অবহেলা করে বা নিন্দা করে, তাকেও এ গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দেবে না।] মহারাজ, ভগবান একথা বললেন কেন?

মহারাজ : এদের বললে এরা বুঝবে না, ধারণা করতে পারবে না। অশ্রদ্ধা করবে। এমনকি বিপরীত অর্থ বুঝবে।

—কিন্তু মহারাজ, আমাদের ধারণা এইরকম যে, একটু একটু করে শুনতে শুনতে ভক্তি-বিশ্বাস বাড়ে। একদম না শুনলে ভক্তি-বিশ্বাস কী করে হবে?

মহারাজ : না, তা নয়; বোঝার জন্য, ধারণা করার জন্য অধিকারী হতে হবে। অধিকারী না হলে শুধু শুনলে কী হবে? আমরা কি ছেলেবেলা থেকে শুনছি না যে, আমরা আত্মা? আমাদের কি ধারণা হচ্ছে? ভগবানের বলার উদ্দেশ্য নিন্দা করা নয়, বরং অধিকার অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলির স্তুতি করা। তাৎপর্য এই যে, 'নাতপস্কায়' ইত্যাদি না হয়ে তপস্কায় ইত্যাদি হওয়া।

—মহারাজ, ধারণা হয় না কেন?

মহারাজ : মন শুদ্ধ নয় বলে। শুধু বিচার করে বা শুনে ধারণা হয় না। মনের অশুদ্ধি দূর করতে হবে।

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

(কঠোপনিষদ্, ১।২।২৪)

[যে পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত হয়নি, ইন্দ্রিয়-লোলুপতা থেকে বিরত হয়নি, একাগ্রচিত্ত হয়নি, সে এই আত্মাকে কেবল প্রজ্ঞান-সহায়ে লাভ করতে পারে না।]

—মহারাজ, শুদ্ধ মনের লক্ষণ কী?

মহারাজ : যা তত্ত্বধারণে সমর্থ। তত্ত্বের যেটি মূল অর্থ বা তাৎপর্য, শুদ্ধ মন সেটি ধারণে সমর্থ।

—মহারাজ, যেকেউ তো মনে করতে পারে যে, সে তত্ত্ব ধারণা করেছে!

মহারাজ : তা মনে করতে পারে। পাগলের কাছে তার ধারণা যথার্থ। কেউ তাকে বোঝাতে পারবে না—তার অনুভূতি মিথ্যা বা ভুল। যাইহোক, সৎ-এর লক্ষণ কী? তা ত্রিকালাবাধিত হতে হবে। সংশয়-বিপর্যয়রহিত হতে হবে। যিনি যথার্থ ধারণা করেছেন, তাঁর আর কখনো সংশয় বা doubt হবে না। তাঁর অনুভূতিকে বিপরীত কোন মত বা যুক্তি আর বিচলিত করতে পারবে না।

—মহারাজ, বুদ্ধি শুদ্ধ কী করে হয়?

মহারাজ : বিচার করে হয়। এই জগৎ অনিত্য, তার প্রতি এখনো আসক্তি কেন? এইভাবে বারবার বিচার করে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, গীতায় ভগবান বলছেন :

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি ৰ্দ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" (১০।১০)

[যে-ভক্তগণ আমাতে সতত যুক্তচিত্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাঁদের আমি এমন সদ্‌বিষয়ক জ্ঞান-প্রদান করি, যাতে তাঁরা আমাকে (আত্মরূপে) লাভ করেন।] মহারাজ, এখানে বুদ্ধিযোগ বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : যে-উপায়ে তাঁকে লাভ করা যায়, সেই উপায়টি তিনি দেন। 'যেন মামুপযান্তি তে'—যার দ্বারা আমাকে লাভ করতে পারবে; এটাই বুদ্ধিযোগ।

প্রশ্ন : মহারাজ, ধ্যান এবং কল্পনার ভিতর তফাত কী?

মহারাজ : কল্পনা হচ্ছে অবাস্তব বিষয়ের চিন্তা করা, যেটি বাস্তবে নেই। আর ধ্যানে যে-বিষয়ের চিন্তা করা হয়, তার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি যে, আমাদের ধ্যেয়বস্তুর অস্তিত্ব আছে। যদিও এখন আমরা কল্পনার সাহায্যেই ধ্যান করার চেষ্টা করছি, তবু সেটা নিছক কল্পনা নয়। অবাস্তব জিনিসের—যার কোন প্রকৃত সত্তা নেই, তার চিন্তা কল্পনা। আর ধ্যানের বস্তুর অস্তিত্বে আমরা অবিশ্বাস করি না।

—মহারাজ, একটা উদাহরণ দিন।

মহারাজ : যেমন আকাশে বাগান কল্পনা করা। এর বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। এটা নিছক কল্পনা। আকাশে বাগান থাকা সম্ভব নয়।

—মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন—ঈশ্বরের পক্ষে সব সম্ভব, যেমন লাল ফুল গাছে সাদা ফুল হওয়া। তবে আকাশে বাগান হওয়া সম্ভব নয় কেন?

মহারাজ : সম্ভব নয় আমরা বলি এই কারণে যে, এরকম আমরা হতে দেখিনি। অর্থাৎ পূর্বে এরকম ঘটেনি।

—মহারাজ, আমরা সবসময় পূর্ব দৃষ্টান্ত খুঁজি। আমরা জানতে চাই আগে এরকম ঘটেছে কিনা। তার মানে সৃষ্টিকে অনাদি মানছি।

মহারাজ : কী অনাদি?

—মহারাজ, সৃষ্টি অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা দৃষ্টান্ত নিচ্ছি যে, আগে এরকম হয়েছে কিনা।

মহারাজ : হয়েছে কিনা নয়, ঘটেছে কিনা।

—হ্যাঁ, ঘটেছে কিনা।

মহারাজ : তার কারণ, পূর্বে অনুভূত হয়নি—এরকম কিছুর অনুভূতি সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ না হোক অংশতও অনুভূত হয়নি—এরকম বস্তুর ধারণা আমাদের মন করতে পারে না। অংশত অনুভূত বিষয়ের সঙ্গে অন্য কিছুর সংযোগ বা combination করে মন ধারণা করতে পারে। একেবারে অননুভূত জিনিসের ধারণা মনের রাজ্যের বাইরে।

—মহারাজ, তাহলে আমাদের কি ভগবানলাভের অনুভূতি আগে হয়েছে যে, আমরা আশা করছি ভগবানলাভের অনুভূতি আমাদের হবে?

মহারাজ : ভগবানলাভের অনুভূতি আমাদের হয়েছে। ভগবান সম্পর্কে যেটুকু ধারণা, সেটুকু কী তা তো বুঝি বা জানি। সেটুকুই যখন আমরা লাভ করি তখন কি বলতে পারি না—ওটুকু আগে অনুভূত হয়েছে? যাতে সিদ্ধ হতে চাই সেটা সম্পর্কে ধারণাটুকুই অনুভূত ধারণা। যা সাধন করছি সেটাই তো সিদ্ধ অবস্থায় পাই।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী সব ক্ষেত্রেই আদর্শ কী হওয়া উচিত, সেটাই উপস্থাপিত করেছেন। আমরা সেটা কি জীবনে পুরোপুরি করতে পারব বা করা সম্ভব?

মহারাজ : হ্যাঁ, আদর্শ কী হওয়া উচিত, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। সেটা আমাদের সামনে থাকলে তাকে লক্ষ্য করে এগতে পারব। আদর্শকে পুরোপুরি অনুসরণ করা সম্ভব না হলেও আমাদের জানতে হবে এবং সামনে রাখতে হবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, 'দাস আমি'টা কি?

মহারাজ : আমি তাঁর দাস। "ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।" এরকম ভাবতে ভাবতে 'আমি'টা (ego) শুদ্ধ হবে এবং সেখানে তাঁর স্থান হবে। ঠাকুর বলতেন : "নাহং নাহং তুঁহুঁ তুঁহুঁ।" 'আমি' তো কিছুতেই যাবে না। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।

—মহারাজ, স্বামীজী বহুবার শক্তির কথা বলেছেন। এখন "নাহং নাহং তুঁহুঁ তুঁহুঁ" অনুশীলনের সঙ্গে স্বামীজীর শক্তির ধারণার—

মহারাজ : বিরোধ হয় কিনা, তাই তো?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : স্বামীজীই না বললেন :

"কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥"

[তারকা চর্বণ করব, ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন করব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।] আমরা রামকৃষ্ণের দাস। এই দাস! হনুমান যখন রামনাম উচ্চারণ করতেন, তখন কী দারুণ শক্তি তিনি উপলব্ধি করতেন! বলতেন—রামদাস হনুমান। এই পরিচয়েই তাঁর বিশাল শক্তি। রামশক্তিতে তিনি বলীয়ান।

॥ ৩৬ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, বলা হয়—গুরু-শিষ্য সম্পর্ক চিরন্তন, এর মানে কী?

মহারাজ : চিরন্তন মানে নিত্য। গুরুকরণের আগে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক ছিল না। আবার গুরুর দেহ যাওয়ার পরেও শিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না। অতএব, সম্পর্কটা তিন কালে থাকছে না। সুতরাং যা তিন কালেই বর্তমান নেই তা নিত্য হতে পারে না।

—তবে বলা হয় কেন?

মহারাজ : এটা অতিশয়োক্তি। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলা হয়ে থাকে।

—নাকি মহারাজ, সচ্চিদানন্দই গুরু, ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক নিত্য— এভাবে কথাটাকে বুঝব?

মহারাজ : হ্যাঁ, সেটাই। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক নিত্য। মানুষ-গুরুর দেহত্যাগ হবে। কিন্তু ভগবান নিত্য এবং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধও নিত্য।

—মহারাজ, আবার বলা হয়—যতক্ষণ না গুরুর সব শিষ্য মুক্তিলাভ করছে বা উদ্ধার হচ্ছে, ততক্ষণ গুরুরও মুক্তি নেই। একথাটা কিভাবে বুঝব?

মহারাজ : হ্যাঁ, গুরুর মুক্তি নেই মানে গুরু দয়াপরবশ হয়ে শিষ্যকে কৃপা করেন। গুরু দয়ার বশবর্তী হয়ে তাঁর দেহ যাওয়ার পরেও সূক্ষ্মদেহে অপেক্ষা করেন শিষ্যকে সাহায্য করার জন্য।

প্রশ্ন : মহারাজ, 'জীবনে আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই' (seek not, avoid not policy) নীতিটি কিরকম?

মহারাজ : যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ। যা আমাদের আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। ন্যূনতম প্রয়োজনের বেশি চেয়ো না। যেটুকু না হলে নয়, সেটুকুই যথেষ্ট। এটিই সুখী হওয়ার উপায়। চরম দুর্দশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারলে দেখবে, সবসময়ই তুমি সুখী। যখন চেরাপুঞ্জিতে ছিলাম, তখন খুবই কঠোরতা করতে হতো। কিন্তু সেসময় আমি আমার উত্তরকাশীর কঠোরতম দিনের সঙ্গে তুলনা করতাম। উত্তরকাশীর অভাব-অনটন ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। সেসব দিনের সঙ্গে তুলনা করে দেখতাম, চেরাপুঞ্জির অবস্থা যথেষ্ট ভাল।

প্রশ্ন : মহারাজ, পুরনো দিনের কিছু কথা বলুন।

মহারাজ : তখন আমি মঠে রয়েছি। শুনছি, আমাকে পাঠানো হবে শিলং-এ। সকলে আমায় খুব ভয় দেখিয়েছিল। প্রচণ্ড ঠান্ডা, অভাব-অভিযোগ, তুমি ওখানে থাকতে পারবে না ইত্যাদি। আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ শুনে যেতাম। কয়েকদিন পর শোনা গেল—শিলং নয়, আমাকে নাকি চেরাপুঞ্জি পাঠানো স্থির হয়েছে। সকলে এবার আমায় আরো বেশি ভয় দেখাতে লাগল। শিলং-এর চেয়ে বহুগুণ ঠান্ডা বেশি, প্রচণ্ড বৃষ্টি, খাবারদাবার কিছু নেই, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি বলে বলে আমায় খুব চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। অনেকে বলল, তুমি ওখানে গেলে মরে যাবে। যাই হোক, খুব দুশ্চিন্তা হল। কিছু ঠিক করতে পারছি না। একদিন পূজনীয় বিরজানন্দজী মহারাজকে গিয়ে বললাম : "মহারাজ,

চেরাপুঞ্জি আমি যাব না।" মহারাজ চুপ করে শুনলেন। একটি কথাও বললেন না। আমি চলে এলাম। দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। মহারাজও কিছু বলেন না, আমিও কিছু বলি না। তারপর আমার হঠাৎ মনে হল—এ কী করছি আমি? কাউকে না কাউকে তো ওখানে যেতে হবে। অসুবিধাগুলো তো কাউকে না কাউকে face করতে হবে। তবে আমি নয় কেন? আমি যাব স্থির করে ফেললাম। বিরজানন্দজীকে গিয়ে বললাম, আমি ঠিক করেছি চেরাপুঞ্জি যাব। মহারাজ খুব খুশি হলেন বুঝলাম। কিন্তু কোন কথা বললেন না—একটি কথাও না। জিজ্ঞাসা করলেন না—কেন যেতে চাইছিলাম না; কিছু বোঝানো বা কিছু বলা—কিচ্ছু না, একদম চুপ করে রইলেন। কিন্তু তিনি খুশি হয়েছেন, বুঝলাম। আসলে মহারাজ এটাই চাইছিলেন—আমি নিজে চিন্তা করি, বিষয়টি ভাবি এবং সিদ্ধান্ত নিই।

চেরাপুঞ্জিতে গিয়ে দেখলাম—অভাব-অভিযোগ, ঠান্ডা, বৃষ্টি, কষ্ট যা শুনেছিলাম সবই তার চেয়ে বেশি! যে যতটা বলেছিল, কম করেই বলেছিল। (সকলের হাসি) প্রথমেই বলেছিল স্কুলটার দিকে নজর দিতে। শুনলাম স্কুলটার অচলাবস্থা। একবছর শিক্ষকরা কোন মাইনে পাচ্ছেন না। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা হল। তিনি গত এক বছর মাইনে ছাড়াই পড়িয়েছেন এবং স্কুল চালানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গত এক বছর তিনি আশ্রমের নামে বাকিতে খেয়েছেন পাশের এক দোকান থেকে। সেখানে অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে। সেটা শোধ করতে হবে। প্রথমেই আমার কাজ হল শিক্ষকদের বাকি মাইনে মিটিয়ে দেওয়া। ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের কিছু টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। সেসব দিয়ে আস্তে আস্তে সেটি মেটানো গেল। প্রধান শিক্ষককে বললাম, আপনাকে মাইনে দিতে পারি, নতুবা দোকানের বাকি টাকা শোধ করতে পারি। একসঙ্গে দুটো দিতে পারব না। কিন্তু তিনি দুটোই চাইছেন। যেকোন একটাতে রাজি না হওয়ায় তিনি স্কুলে আর থাকলেন না, ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর আবার নতুন প্রধান শিক্ষক খোঁজার সমস্যা। তখনকার দিনে

যেখানে-সেখানে অত পাশ করা লোক পাওয়া সহজ ছিল না। শেষে একজনকে পাওয়া গেল—পাঁচশো টাকা দিতে হবে! কী করব, রাজি হলাম। সেই টাকা যোগাড় করাই তখন আমার লক্ষ্য হল। এখানে-ওখানে ক্লাস করা শুরু করলাম। আস্তে আস্তে লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলাম ক্লাসের মাধ্যমে। সপ্তাহে একদিন শিলংও যেতাম ক্লাস নিতে। সেদিন ওখান থেকে আসার সময় আমার সপ্তাহের প্রয়োজনীয় চাল নিয়ে আসতাম। ডাল এখানে এক দোকানে এমনিই দিত। আর আশ্রমে হতো স্কোয়াশ। চাল, ডাল আর স্কোয়াশ সেদ্ধ, ব্যাস! নুনও কিনতাম না। ভাত খাওয়ার কথা, নুন তো খাওয়ার কথা নয়! আমার নিজের জন্য আশ্রম থেকে কোন পয়সা খরচ করতাম না। শুধু কুকারের নিচে আগুন দেওয়ার জন্য আট আনার কাঠকয়লা। মাসে আট আনা। আর আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল একটি স্কুলবাড়িতে। ফুটো চাল। বৃষ্টি বাইরের চেয়ে যেন ঘরেই পড়ত বেশি! জামাকাপড় ছিল সামান্য, কিন্তু সর্বদা ভেজা। ২৪ ঘণ্টাই প্রায় ভেজা ভেজা। একটা কাপড় শুকিয়ে রাখতাম। যেদিন শিলং যেতাম, সেটা পরে যেতাম।

এর কিছুদিন পর নতুন হেডমাস্টার চলে গেল। একজন আমাকে এক এম এ পাশ করা যুবকের সন্ধান দিল। দেখা করলাম তার সঙ্গে। বললাম সব। সে রাজি হল। মাইনের কথায় বলল, পঞ্চাশ টাকা দিলেই হবে। অবিবাহিত। ত্যাগী ভাবের ছেলে। কিন্তু আমার মনে হল, পঞ্চাশ টাকা খুব কম হয়ে যাবে। তাকে বললাম : আমাদের অবস্থা এত খারাপ নয়, আপনাকে আমরা আরেকটু বেশি দিতে পারব। সে কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না। বলল : "আপনাদের স্কুল তো ত্যাগীদের, সন্ন্যাসীদের। অত টাকা কোথায় পাবেন? আমার পঞ্চাশ টাকাতেই চলে যাবে।" সত্যিই সে আর বেশি নিল না। তারপর চাঁদা তুলতে যেতে হতো বাড়ি বাড়ি।

—মহারাজ, চাঁদা তখনকার দিনে দু-এক টাকা করে দিত, না?

মহারাজ (চোখ দুটো বিস্ফারিত করে) : দু-এক টাকা! দু-এক টাকা যে দিত সে তো মিশনের বড় ভক্ত! চাঁদা দিত দু আনা, আট আনা।

(সকলের হাসি) সাইকেল চড়ে খুব ঘুরতে হতো শিলং-এ। চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যেই। একজন মুসলমান পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন আমাদের খুব পরিচিত। শেষের দিকেও সাইকেল চালাতাম। সাইকেলে যখন যেতাম, তিনি নমস্কার করতেন এবং বলতেন : "স্বামীজী, এখনো সাইকেল চালাচ্ছেন? ভুলে যাবেন না, বয়স হচ্ছে।" আমি সাইকেল থেকে নেমে হেসে প্রতিনমস্কার জানিয়ে একটু কথাবার্তা বলতাম। তাঁর এই কথাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে—স্বামীজী, ভুলে যাবেন না, বয়স হচ্ছে।

কিন্তু একটা কথা, এত কিছুর মধ্যেও কোনদিন কষ্টবোধ হয়নি। তার কারণ, আমি সবসময় উত্তরকাশীর জীবনের সঙ্গে তুলনা করতাম। তুলনা করে দেখতাম, এখানে অনেক ভাল। উত্তরকাশীর জীবনই ছিল আমার আদর্শ, ওটা ছিল মাপকাঠি। সেই জীবনের সঙ্গে তুলনা করতাম। বিচার করতাম আর দেখতাম, উত্তরকাশীতে কী কঠোরতাই না ছিল! সে-তুলনায় এখানে অনেক ভাল। যদি আমরা সবচেয়ে খারাপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকি তবে কোথাও আমাদের অশান্তি হবে না। বরং যেখানেই থাকি না কেন, দেখব আমার আদর্শ খারাপ অবস্থার থেকে সে-জায়গা ভাল। আর এটাই সুখী হওয়ার উপায়।

যাক, দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। আশ্রমের অবস্থা তখন স্থিতিশীল হয়েছে। মিশনের পরিচিত ভক্তের সংখ্যাও বেড়েছে। আমার মনে হল, আশ্রমের এখন আর অতটা খারাপ অবস্থা নেই। মঠে চিঠি লিখলাম মাধবানন্দজীকে—মহারাজ, আশ্রম ও স্কুলের অবস্থা এখন মনে হচ্ছে স্থিতিশীল হয়েছে। এখন আশা করি যে-কারো পক্ষে আশ্রম চালাতে অসুবিধা হবে না। আমাকে আপনারা মনে করলে অন্য আশ্রমেও নিতে পারেন। মাধবানন্দজী জানালেন : "ঠিক আছে। তোমার কথা মনে আছে—দেখব।" তখন রাজকোট আশ্রমে খুব অচলাবস্থা। যেন আর চলে না। শুনলাম, পঁচাত্তর হাজার টাকা ঋণ নিয়ে চলছে। মঠ একজন কর্মী খুঁজছে। কাকে ওখানে পাঠায়? সামাল দিতে তো হবে। আমার আবেদনের কথা ভোলেননি মাধবানন্দজী।

ডেকে নিয়ে এলেন চেরাপুঞ্জি থেকে। বললেন : "যাও, রাজকোট যাও।" এবারও সকলে খুব ভয় দেখাতে লাগল। তুমি কি পাগল হয়েছ, রাজকোট যাচ্ছ? এত সাহস তোমার? আমি যথারীতি একই রকম উত্তর দিয়েছিলাম। সাহস আমার খুব নেই। কিন্তু কাউকে না কাউকে যেতে হবেই। তা আমি যাব না কেন? গেলাম। সেখানেও আস্তে আস্তে সেই দেনা শোধ হয়েছিল।

॥ ৩৭ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, শাস্ত্রে আছে—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। শুধু ব্রহ্মবিদ্ কেন? বেদান্তের দৃষ্টিতে সকলেই তো ব্রহ্ম।

মহারাজ : হ্যাঁ, সকলেই ব্রহ্ম। কিন্তু সকলেই উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে জেনে নিরুপাধিক হয়। 'এব' শব্দের দ্বারা এই জোর দেওয়া হচ্ছে। 'ব্রহ্ম এব ভবতি'—ব্রহ্মই হল। মানে, নিরুপাধিক হন।

প্রশ্ন : মহারাজ, শঙ্করাচার্য প্রস্থানত্রয়ে যেভাবে অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে কি শক্তির স্থান আছে?

মহারাজ : আছে। তিনি শক্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু ব্রহ্ম হিসাবে, ব্রহ্ম থেকে আলাদা কিছু নয়।

—অর্থাৎ শক্তি আর শক্তিমান অভেদ, এই দৃষ্টিতে?

মহারাজ : ব্রহ্ম-অতিরিক্ত আর কোন সত্তা নেই, এই হিসাবে।

—কেন মহারাজ, শঙ্করাচার্যের সৌন্দর্যলহরি স্তোত্র?

মহারাজ : এগুলোকে শঙ্করের রচনার মধ্যে ধরে না।

—মহারাজ, শঙ্করাচার্য ভাষ্যের মধ্যে শক্তিকে স্বীকার করেছেন, না শুধু তাঁর জীবনীতে এসব পাই?

মহারাজ : হ্যাঁ, ভাষ্যের মধ্যেও আছে। তিনি ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন। ঈশ্বরকে স্বীকার করা মানেই শক্তিকে স্বীকার করা। আর স্তবস্তুতি ধরলে তো করেছেনই। যেমন বলছেন :

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥" (বিষ্ণুষট্পদী)

[ভেদ অপগত হলেও আমি তোমার, তুমি আমার নয় (অর্থাৎ আমি তোমার অংশ, তুমি আমার অংশ নও)। কারণ সমুদ্রের অংশই তরঙ্গ, তরঙ্গের অংশ কখনো সমুদ্র হয় না।]

তবে তার মধ্যে ব্রহ্ম অতিরিক্ত কোন সত্তা নেই।

—স্বামীজীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'তেও এই ভাবনা যে, শিব ব্যতীত অন্য কোন পৃথক সত্তা জীবের নেই, তাই না?

মহারাজ : কিন্তু স্বামীজী যে সেকথাও বলেছেন, উভয়ই যদি শিব হন, তবে কে কার সেবা করবে? সেব্য সেবক থাকে কি?

—মহারাজ, সে তো তত্ত্ব বুঝলে। যতক্ষণ না তত্ত্ব উপলব্ধি হচ্ছে, ততক্ষণ তো সেই অবস্থা লাভের জন্য সাধন।

মহারাজ : হ্যাঁ তাই। দুটো কথা আছে। তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে জীবের সেই সেব্য সেবক নেই। সাধনের সময় জীব শিব, সেব্য সেবক রয়েছে। তখন আবার তত্ত্ব নেই। তাই সাধনের সময় দ্বৈত রয়েছে। খুব রয়েছে। তখন সব দরকার। ঈশ্বর দরকার, গুরু দরকার, মন্ত্র দরকার, সব দরকার। তত্ত্বে পৌঁছালে আর এসব নেই। তখন তত্ত্ব যা তা-ই। তাই তো বলছেন :

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।"

(মাণ্ডূক্য কারিকা, ২।৩২)

ঠাকুর পাঞ্জাবি বেদান্ত পছন্দ করতেন না।

—মহারাজ, পাঞ্জাবি বেদান্তটা কী?

মহারাজ : এক বেদান্তীর নামে কুৎসা রটছে, শুনে ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন : কিগো, তুমি না বেদান্তী! তা তোমার নামে এসব কী শুনছি? সেই বেদান্তী উত্তর দিল : হ্যাঁ মহারাজ। এজগৎ তো তিনো কালমে মিথ্যা হ্যায়। আউর ইয়ে যো শুন রহেঁ হ্যায়, এ ভি মিথ্যা হ্যায়। ঠাকুর

তার উত্তর শুনে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন এবং কী বলেছিলেন তা তোমরা সবাই জান। (সকলের হাসি) আসল কথা, বেদান্তচর্চা আমরা কেন করি? করি অজ্ঞান দূর হওয়ার জন্য। সেই অজ্ঞান যদি রয়েই যায়, তবে বুঝতে হবে বেদান্তচর্চায় কোন লাভ হচ্ছে না।

—মহারাজ, কেউ যদি তার সিদ্ধান্তে অবিচলিত না থাকে, কিছুদিন পরে তার ব্যবহারে সিদ্ধান্তের বৈপরীত্য দেখা যায়। সেক্ষেত্রে এটাই কি প্রমাণিত হয় যে, সে তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত নয়?

মহারাজ : তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে তো অবিচলিত হওয়ার কথা। তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কি সে এরকম বলছে? এটাই প্রশ্ন। আর যে একবার তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে ওসব কেন করতে যাবে? ওদিকই সে মাড়াবে না।

—মহারাজ, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—এটা কি তন্ত্রের মতবাদ?

মহারাজ : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : মহারাজ সেদিন বলছিলেন, দয়ানন্দজী আপনাকে বাঁচিয়েছিলেন, নতুবা আপনার সাধু হওয়া হতো না। ঘটনাটা একটু বলুন।

মহারাজ : ঘটনাটা হৃষীকেশে। আমি তখনো সাধু হইনি, সাধু হব বলে পালিয়ে চলে গিয়েছি হৃষীকেশে। সাদা কাপড় পরি। সেসময় দয়ানন্দজী ওখানে ছিলেন। কথাবার্তা হল। বললাম মনের কথা। তিনি বললেন : "এখন তুমি ফিরে যাও। পরীক্ষা শেষ কর। তারপর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দাও। নতুবা তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে এভাবে ঘুরে ঘুরে ভাল সাধু হওয়া যায় না।" কথাগুলো শুনে খুব ভাবলাম। আমাকে একথা বলে তাঁর কী লাভ? নিশ্চয়ই আমার ভালর জন্যই বলছেন। এর আগে রামকৃষ্ণ মিশন এবং সাধুদের সাথে আমার মেলামেশা, পরিচিতি ছিল। কিন্তু মিশনে যোগ দেব, সেরকম কিছু ঠিক করিনি। অবশ্য সাধু হব—এই ইচ্ছা ছেলেবেলা থেকেই ছিল। হৃষীকেশে গিয়ে ভাবলাম, এই তো এরাও সাধু, আমিও সাধু। এখানে সাধু হয়ে থেকে যাব। কিন্তু তা হল না। দয়ানন্দজীর কথাগুলো খুব চিন্তা করলাম। মনে হল, তিনি ঠিকই

বলেছেন। ঠিক করলাম, ফিরে আসব। কিন্তু টাকাপয়সা সঙ্গে তেমন নেই। ওদের কাছেও কিছু ছিল না। তাই দয়ানন্দজী বললেন : "আমার কাছে টাকাপয়সা কিছু নেই। তা তুমি ভেবো না, এমনিই চলে যাও।" সঙ্গে অনেকগুলি রুটি দিয়ে দিলেন। সেগুলি বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে এসে দেখলাম, ভগবানের ডিব্বা (ট্রেন) দাঁড়িয়ে! (সকলের হাসি) উঠে পড়লাম। কিছুদূর আসার পর টিকিট কালেক্টর এসে টিকিট চাইল। আমি বললাম : "আমার না আছে টিকিট, না আছে টিকিট কাটার মতো পয়সা।" সে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল। কিছু বলল না। (সকলের হাসি) তখনকার দিনে তো এখনকার মতো এত দ্রুতগামী ট্রেন ছিল না। ট্রেনেই অনেকটা সময় লেগে যেত। মাঝে মাঝে খিদে পেলেই রুটিগুলো বের করে জলে ভিজিয়ে একটু একটু খাই। তা, একটা স্টেশনে ট্রেন এসে থামল। দেখলাম, সেখানে ঝুপড়ির মতো ঘর, হোটেল। সঙ্গে একেবারে যে একটা পয়সাও ছিল না, তা নয়। ভাবলাম, চার আনা দিয়ে ডাল-ভাত খাই। খুব খিদেও পেয়েছে। তাই করলাম। চার আনা দিয়ে পেট ভরে খেলাম। কী অমৃতই না লাগল। সে-স্বাদ বহুদিন মনে ছিল। যাই হোক, আবার ট্রেনে চাপলাম। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আবার কোন স্টেশনে এসে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আমিও প্ল্যাটফর্মে নেমে বেড়াচ্ছি। দেখছি চারদিকে খুব টিকিট কালেক্টর। কী করব, ট্রেনে চাপতে ভয় হচ্ছে। আবার ভাবছি, ট্রেন ছেড়ে দিলেই বা আমি কী করে যাব? কোথায় থাকব? সাহস করে গার্ডকে কাছে পেয়ে বললাম : "I've no money to buy a ticket. But I must go. What to do?" সে অ্যাংলো সাহেব। তখন স্বদেশি যুগ। Quit India Movement-এর সময় সম্ভবত। সে বিরক্ত হয়ে বলল : "You beg of your countrymen, certainly they will help you."

যাই হোক, ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল দেখে একজন টিকিট কালেক্টর আমায় ইশারা করল ট্রেনে উঠে পড়ার জন্য। উঠে পড়লাম। দেখতে দেখতে বর্ধমানের কাছে চলে এলাম। আবার চেকার টিকিট চাইল। আমি

স্পষ্ট বললাম : টিকিট নেই। কোথা থেকে আসছ—জিজ্ঞেস করল। বললাম, হৃষীকেশ থেকে। বিরক্ত মুখে সে আমাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। ভাবটা এই—হৃষীকেশ থেকে যে বিনা টিকিটে এতদূর চলে আসতে পেরেছে, তার কাছে টিকিট চাওয়ার আর কী অর্থ! (সকলের হাসি) তখন মনে হল, আমার কাছে কিছু পয়সা তো আছে, পুরো পথটাই বিনা টিকিটে আসা ঠিক নয়। রেলকে ফাঁকি দেওয়া ভাল হচ্ছে না। যেটুকু পারি, রেলকে কিছু পয়সা দেওয়া উচিত। এই ভেবে বর্ধমান থেকে একটা টিকিট করলাম। (সকলের উচ্চ হাসি) যাই হোক, চলে তো এলাম মঠে। সকলের সাথে দেখা করলাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ কিন্তু আমাকে মঠে নিতে চাইলেন না। বললেন : "পড়াশুনা শেষ কর, তারপর হবে।" আর কী করব! ফিরে গেলাম।

॥ ৩৮ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, কথা হচ্ছিল—আপনি সাধু হতে হৃষীকেশ চলে গিয়েছিলেন। পূজনীয় দয়ানন্দজীর কথায় ফিরে আসেন। কোথায় ফিরে এলেন? বাড়িতে?

মহারাজ : না, বাড়িতে নয়, বাগবাজারে জ্ঞান মহারাজের ওখানে। এদিকে শরৎ মহারাজ চাইছেন, আমার ব্রহ্মচর্য হোক। আমাকে বললেন : "যাও, মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে ব্রহ্মচর্য প্রার্থনা কর।" শরৎ মহারাজ ব্রহ্মচর্য দেন না। মহাপুরুষ মহারাজ দেন মঠে। জ্ঞান মহারাজকে বললেন : "ওকে মঠে নিয়ে যাও। মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য চেয়ে নিক।" জ্ঞান মহারাজ কিন্তু চাইছিলেন না আমার এত আগে ব্রহ্মচর্য হোক। কিন্তু কী করবেন, শরৎ মহারাজের আদেশ! আমাকে মঠে নিয়ে এলেন। প্রথমটায় মহাপুরুষ মহারাজও রাজি হননি, তারপর হলেন। শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন কিনা!

—তা join করার আগেই ব্রহ্মচর্য?

মহারাজ : হ্যাঁ। শোন না। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন : "ব্রহ্মচর্য দিচ্ছি। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করতে হবে। Join করা এখন চলবে না।"

—তখন কি কলেজে পড়ছিলেন মহারাজ?

মহারাজ : না না, কলেজ! স্কুল শেষ করার আগেই পালিয়েছিলাম। তখন সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। সেটা দিতে হল। তারপর কলেজও শেষ করতে হল। ব্রহ্মচর্যের জন্য আমাকে বেশ মূল্য দিতে হয়েছে!

[এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণীয়। পূজনীয় সন্তোষ মহারাজ (স্বামী সত্যরূপানন্দ) একদিন একটি হিন্দিভাষী যুবককে সঙ্গে করে এনেছেন। ছেলেটি স্বামী ভূতেশানন্দজীকে প্রণাম করে উঠতে সন্তোষ মহারাজ বললেন : "মহারাজ, এ-ছেলেটি সাধু হতে চায়। ইংলিশে এম এ দিয়েছে। বয়স একটু বেশি হয়ে গেছে। আপনি ব্যবস্থা করলেই ওর পক্ষে সাধু হওয়া হতে পারে।" মহারাজ ইংরেজিতে দু-একটি কথা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলেটি কিছু উত্তর দেয় না। তারপর মহারাজ বললেন : "যাও, ওদের (মানে সাধারণ সম্পাদক, তখন স্বামী আত্মস্থানন্দজী) সঙ্গে কথা বল। দেখ কী ব্যবস্থা হয়।" সন্তোষ মহারাজ বললেন : "ওর ইচ্ছা এখানে চেষ্টা করে যদি না হয়, তবে উত্তরকাশী বা অন্যত্র চলে যাবে। সেখানে গিয়ে সাধু হবে।" মহারাজ বললেন : "যাও আগে ওদের সাথে কথা বল। উত্তরকাশী বা অন্যত্র গিয়ে অনেকেই ভবঘুরে হয়ে যায়। প্রবীণ সন্ন্যাসীদের দৃঢ় ছত্রছায়ায় না থেকে শুরুতে নিজেকে ঠিক পথে চালানো সহজ নয়।"]

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী বলেছেন : "আমি কাজ থেকে বিরত হব না—যতক্ষণ না জগৎ জানছে যে, সে এবং ঈশ্বর এক।" স্বামীজী কি এখনো কাজ করছেন?

মহারাজ : তা না হলে সব চলছে কী করে? তিনি বলেছেন : "স্থূলশরীর ছেড়ে দেওয়ার পরও শক্তি হিসাবে কাজ করব।"

—মহারাজ, ঠাকুরের অন্য সন্তানেরা স্বামীজীর প্রসঙ্গ খুব করতেন। সেসব তো অনেক শুনেছেন।

মহারাজ : সেগুলি তো সব বইতে বেরিয়ে গেছে। নতুন কথা কী বলব? তবে একটা কথা বলি, ঠাকুরের সন্তানেরা স্বামীজীকে ঠাকুরের সঙ্গে এক করে দেখতেন। যদিও প্রথমদিকে তাঁর সঙ্গে তর্ক, বিবাদ পর্যন্ত করেছেন তথাপি একবার স্বামীজীর কোন ভাব সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় হয়ে গেলে সারাজীবন সেটিকে অবিচলিতভাবে অনুসরণ করেছেন। তাঁরা জানতেন, ঠাকুর ও স্বামীজী অভিন্ন।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি একদিন বলছিলেন, ভালবাসার একটি লক্ষণ এই যে, ভালবাসার পাত্রকে ছোট ভাবা।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—মহারাজ, এটা কি শুধু বাৎসল্যভাবে, নাকি মধুরভাবেও দেখা যায়?

মহারাজ : গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন : "তোমার কোমল পাদপদ্ম আমাদের কঠিন হৃদয়ে ধ্যান করতে আমরা শঙ্কিত হই—পাছে তোমার পায়ে ব্যথা লাগে, আর তুমি কিনা সেই পায়ে এই বনে বনান্তরে কাঁটার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ!" শ্রীকৃষ্ণ ললিতার ঘরে যাবে শুনে শ্রীমতী বলছেন : "সে ললিতার ঘরে যাক তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ললিতা সেবা করতে জানে না।" ভাবটা এই, তিনি না হলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা হবে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, কথামৃতে এক জায়গায় আছে, ঠাকুর দেখছেন—ঘর-বাড়ি, গাছপালা সব মোমের তৈরি। এর মানে কী?

মহারাজ : এর মানে—সর্বত্র এক সত্তা। সত্তা বা উপাদান হিসাবে সব এক। তার অতিরিক্ত দ্বিতীয় সত্তা নেই। ঠাকুর অন্যত্র বলছেন, দেখলাম সব চৈতন্যে জরে আছে। জরে আছে মানে ওতপ্রোত—ভিতরে এবং বাইরে এক সত্তা।

প্রশ্ন : মহারাজ, আজ খোকা মহারাজের তিথিপূজা। তাঁকে আপনারা কেমন দেখেছেন একটু বলুন।

মহারাজ : জন্মদিনের কথায় মহাপুরুষ মহারাজের কথা মনে পড়ল। মহাপুরুষ মহারাজকে যখন বলা হতো—মহারাজ, আজ আপনার জন্মদিন, তখন মহারাজ বলতেন : "আমার জন্মই হয়নি। আমার

আবার জন্মদিন!” আবার কখনো বলতেন : “বেশ, খুব করে ঠাকুরের ভোগ লাগাও।”

মহাপুরুষ মহারাজ খোকা মহারাজকে ‘খোকা’ বলেই ডাকতেন। গঙ্গাধর মহারাজ বলতেন : “খোকা মহারাজ নামেই খোকা! আমিই সবচেয়ে ছোট।” মানে—ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট গঙ্গাধর মহারাজ। খোকা মহারাজ ছোট্ট চেহারার, বেঁটে এবং রোগা ছিলেন। খুব চটপট হাঁটতেন। আমরা দেখেছি, তিনি রোজ পঙ্গাতে বসেই খেতেন। নিজের কাজকর্ম নিজেই করতেন। কাপড়-চোপড় নিজেই কাচতেন। তিনি তামাক খেতেন। ভাণ্ডার থেকে তামাক দেওয়া হতো। তখন ভাণ্ডারী অপূর্বানন্দজী। দেখেছি, খোকা মহারাজ তামাকের জন্য ভাণ্ডারে গিয়ে অপেক্ষা করছেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, ‘তর্কপ্রস্থান’ বলা হয়। সেখানে ‘প্রস্থান’ মানে—যা পৌঁছে দেয়। আবার উপনিষদে বলা হয়েছে : “নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া” —তর্কের দ্বারা তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মহারাজ : তাই তো। তর্কের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় না। শুধু তর্কপ্রস্থান কেন, শ্রুতিপ্রস্থানও তো বলা হয়। শ্রুতিও সেখানে পৌঁছে দিতে পারে না।

—তাহলে শ্রুতির প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

মহারাজ : শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। বেদ লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না, পথনির্দেশ করে মাত্র। দিঙ্‌নির্দেশ করে দেয়। পথ দেখিয়ে দেয়। লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না। ঠাকুরের সেই তিন ডাকাতের গল্প। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনটিই ডাকাত। তবে সত্ত্ব বড় রাস্তায় তুলে পথ দেখিয়ে দিতে পারে। শ্রুতিও তাই। গীতায় আছে : “নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।” (১১।৫৩)

—মহারাজ, এখানে বেদ বলতে কি বেদান্তকে বুঝব?

মহারাজ : ‘বেদান্ত’ মানে কী? বেদের অন্ত। ‘অন্ত’ মানে সারতত্ত্ব। বেদের অন্ত মানে—বেদের তত্ত্ব বা সার। সেই সারভাগ উপনিষদে রয়েছে বলে উপনিষদ্‌কে সাধারণ অর্থে বেদান্ত বলা হয়।

—মহারাজ, অন্ত মানে তো শেষ এবং উপনিষদ্ যেহেতু বেদের শেষ ভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড, তাই কি উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলা হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ। সেও একটা যুক্তি। বেদের তত্ত্ব ব্রহ্ম। বেদান্তের প্রতিপাদ্যও ব্রহ্ম। "সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"—'সর্বে বেদা' খুব জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে।

—মহারাজ, 'সর্বে বেদা' বলতে কি কর্মকাণ্ডকেও বুঝব?

মহারাজ : কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য পরম্পরাক্রমে আত্মজ্ঞানে। শ্রুতি অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এবং স্মৃতি—সব একই কথা বলছে। স্মৃতি মানে কী? যা শ্রুতিবাক্যকে স্মরণ করে লেখা হয়, তা-ই স্মৃতি।

—মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণের কথা 'গীতা'কে বলা হয় স্মৃতি, ঠাকুরের কথামৃতকেও স্মৃতি বলা যায়?

মহারাজ : তা বলতে পার।

॥ ৩৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বয়ং ভগবানের কথা গীতা, কথামৃত ইত্যাদি হল স্মৃতি, আর মুনি-ঋষিদের কথা—যা বেদে আছে তা হল শ্রুতি। বলা হয়, স্মৃতির প্রামাণ্যের চেয়ে শ্রুতির প্রামাণ্য অধিক বলবান। তাহলে তো স্বয়ং ভগবানের কথার চেয়ে মুনি-ঋষিদের কথার প্রামাণ্য অধিক!

মহারাজ : তার কারণ, শ্রুতির কোন শুরু বা আদি নেই। কিন্তু স্মৃতির আদি আছে। একজনের থেকে স্মৃতি শুরু হচ্ছে। শ্রুতির আদি নেই, কর্তা নেই। শ্রুতি অনাদি, তাই তার প্রামাণ্য অধিক।

—অর্থাৎ, স্মৃতি অপৌরুষেয় নয়, তাই তো?

মহারাজ : নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন : মহারাজ, কেউ যদি আমাদের কোন কটূক্তি করে, তার কি প্রতিবাদ করা উচিত? একজন বলছিল, প্রতিবাদ করা হল অহঙ্কারের প্রকাশ। আবার একজন বলল, আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য অন্তত একটু ফোঁস করা উচিত।

মহারাজ : "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" (১২।১৯) —গীতায় আছে না? তার কী করবে? আত্মসম্মানের প্রশ্ন হলে, যে-আদর্শ গ্রহণ করেছ, তাকে কায়মনোবাক্যে সম্মান করবে—জীবনে গ্রহণ করবে। কিন্তু তোমরা গেরুয়া পরে মান চাইবে?

—মহারাজ, ফোঁস করা সম্পর্কে তো ঠাকুর বলেছেন, ত্যাগীর ফোঁস করার দরকার নেই।

মহারাজ : তবে?

—কাজকর্মে তেমন পরিস্থিতি এলে একটু ফোঁস করলে সুবিধা হয়।

মহারাজ : তাহলে তো তোমরা সুবিধাবাদী!

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনাকে চাঁদা আদায়ের জন্য দ্বারে দ্বারে যেতে হয়েছে?

মহারাজ : কত হয়েছে! একবার গেছি এক শেঠের বাড়ি। দারোয়ান ঢুকতে দেবে না। বলছে : "ঐ গাছতলায় সাধুরা যেমন বসে, সেখানে বস গিয়ে।" আমি ভাবলাম, তাই তো, আমার জায়গা তো গাছতলাই। গিয়ে গাছতলায় বসলাম। একটু পরে মনে হল, পকেটে আশ্রমের একটা কার্ড ছিল। সেটা নিয়ে গিয়ে বললাম : কার্ডটা শেঠজীকে দিয়ে এস। সে বলল : "আমি গেট ছেড়ে কী করে যাব?" সত্যিই তো। (সকলের হাসি) তারপর একজন পরিচারককে পেয়ে তাকে কার্ডটা দিলাম। সে দয়া করে নিল। হ্যাঁ, সে তো না নিতেও পারত। যাক, কার্ডটা শেঠজীর কাছে পৌঁছাল। শেঠজী এলেন, আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

আরেকবার একজনের বাড়ি যাই। গেলেই বলে—আজ না আরেকদিন আসুন। এই করে পাঁচ দিন গেছি। সেদিন বলে : "বাব্বা, রামকৃষ্ণ মিশনের চাঁদা দেখছি গভর্নমেন্ট ট্যাক্সের চেয়েও বাড়া!" (সকলের হাসি) পনেরো টাকা দিয়েছিল। আমি বললাম : আপনি আসতে বলেছেন, তাই আসছি। আপনি যদি প্রথমেই বলতেন দেবেন না, তাহলে আসতাম না।

আরেকবার এক শেঠজীর বাড়ি গেছি। দারোয়ান বলল : "শেঠজী বাড়ি নেই।" ফিরে দেখি, শেঠজী বেরিয়েছে! আমায় ডেকে ভিতরে

নিয়ে গেল। আমি বললাম : দারোয়ান যে বলল, আপনি বাড়ি নেই? তা উত্তর দিল : "ওকে ওরকম বলা থাকে।" (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি বলছিলেন—বিচার যতক্ষণ করছ ততক্ষণ ব্যাবহারিক সত্য স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। বিচার করা মানেই খানিকটা সত্যতা—জীবজগতের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে তারপর সেটা নিরসন করার চেষ্টা।

মহারাজ : আমি যে বলছিলাম—উত্তরকাশীতে সাধুরা একজন কলেরা-রোগীকে ফেলে চলে গেল, তাতে তোমার পূর্বপক্ষ যে বিক্ষেপ হবে বলে—সত্যিই তো বিক্ষেপ হয়। যখন ধ্যানের সময় এরকম রোগীর সেবার দিকে মন দিতে হয়, তখন বিক্ষেপ তো হয়ই, সেসময় যে মন্ত্র জপছে, তাতে বাধার সৃষ্টি হয়। বিচারপন্থীদের মতে, তার থেকে সব দূরে যাওয়া। সুতরাং জাগতিক ব্যাপারে ব্যাপৃত না হয়ে বিচারে মগ্ন থাকা ভাল। এটা একটা মত।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন যতক্ষণ আমাদের ভিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে, নিজের দেহরক্ষার জন্য চেষ্টা আছে—ততক্ষণ অসুস্থ লোকের সেবা না করলে তোমার ভাব দেহসর্বস্ব হল।

মহারাজ : হ্যাঁ, দেহসর্বস্ব হল। দেহসর্বস্বতা স্বার্থপরতা।

—আরো বলেছিলেন সেবাবুদ্ধি করতে পারলে দেহবুদ্ধি কমে যায়।

মহারাজ : দেখ, বিচারের সঙ্গে ব্যাবহারিক জগতের—কর্মের বিরোধ তখন হয় যখন মানুষ ধ্যানের ভিতর ডুবে থাকে। যখন গভীর ধ্যানে পৌঁছায়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় বন্ধ করে ধ্যানেতে মনঃসংযোগ করতে হয়; সেসময় কর্মের সঙ্গে বিরোধ হয়। সে অনেক উন্নত অবস্থায়। ঠাকুর যখন সমাধিমগ্ন হতেন তখন কি তিনি কাজ করতে পারতেন?

—কথাই বলতে পারতেন না।

মহারাজ : কাজেই সে-অবস্থায় কাজ হয় না—সকাম কাজও হয় না, নিষ্কাম কাজও হয় না। সে-অবস্থার সঙ্গে বিরোধ আছে, কিন্তু তার আগে অবধি কোন বিরোধ নেই। যতদিন পর্যন্ত না সাধক সেই উচ্চ

অবস্থায় আসতে পারছে, ততদিন তার বিরোধ নেই। তাছাড়া বিরোধ কোন্‌খানে? যে-কর্ম মানুষকে সঙ্কুচিত করে, তার সঙ্গো বিরোধ আছে, অর্থাৎ স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত কর্মের সাথে বিরোধ আছে। কিন্তু নিঃস্বার্থ কর্মের সঙ্গো কোন বিরোধ নেই। স্বামীজী কী বলছেন? শঙ্করও এসম্পর্কে স্পষ্ট; তিনি বলেছেন—সকাম কর্ম করতে করতে যদি মনে নিষ্কাম ভাব এসে যায়, তবে আর বিরোধ রইল না।

—বলেছিলেন, সকাম কর্ম শুরু করে মনে নিষ্কাম ভাব এলেও আগের কর্মটা নিষ্কামভাবে করে যাচ্ছে।

মহারাজ : তিনি বলছেন, একজন একটা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। যজ্ঞ করতে করতে তাঁর ভিতরে কামনা সব চলে গেল। কিন্তু তিনি যজ্ঞটি শেষ করলেন। যখনি কামনা চলে গেল, তখনি সেটা নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্মের সাথে বিরোধ রয়েছে। কিন্তু, নিষ্কাম কর্ম তোমাকে সঙ্কুচিত করছে না, দেহের সঙ্গো তোমাকে আবদ্ধ করছে না। এইজন্য নিষ্কাম কর্মের সাথে জ্ঞানের বিরোধ নেই।

আর নিদিধ্যাসনের সঙ্গো কর্মের স্বভাবতই বিরোধ হয়। নিদিধ্যাসন হল মননের পরে—বিচারের পরে যে-সিদ্ধান্ত হল, তাতে ডুবে যাওয়া। সেসময়ে আর কর্ম করা যায় না। সাধারণ বা নিচু অবস্থায় বিরোধ একটা অছিলা মাত্র। ঐ বিরোধের ঢং করে আমরা—আমাদের যা উচিত ছিল—মানুষের সেবা করা, সেটা থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। এই হল সিদ্ধান্ত। বিরোধ কোন্‌খানে?—যেখানে আমি সমাধিস্থ হচ্ছি। যেখানে আমি সব ব্যবহার করছি, সেখানে বিরোধ নেই। শঙ্করও, যেখানে বিরোধ আছে বলছেন সেটি সকাম কর্ম প্রসঙ্গো।

—শঙ্করের মতে, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হবে।

মহারাজ : জ্ঞাননিষ্ঠা যদি লাভ হয়, তারপরে জ্ঞানেতে স্থিতি হয়।

—তারপরে জ্ঞানের অন্তরঙ্গা সাধন।

মহারাজ : অন্তরঙ্গা সাধন হল ব্রহ্মাকারা বৃত্তি।

—মহারাজ, সেটা তো নিদিধ্যাসন।

মহারাজ : নিদিধ্যাসন মানে ধ্যান—সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে ধ্যান।

—সেই অবস্থায় শ্রবণ-মননের অবকাশ নেই?

মহারাজ : শ্রবণ-মননের পরে নিদিধ্যাসন। শ্রবণ-মনন করে নিদিধ্যাসন।

—তার মানে, জ্ঞাননিষ্ঠা আসা পর্যন্ত কর্ম করা। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করা বা চিত্তশুদ্ধ করা, তারপরে জ্ঞানের যে অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—সেগুলি।

মহারাজ : নিষ্ঠা মানে 'নিতরাং স্থিতি'। নিষ্ঠা মানে দৃঢ়তা নয়, নিষ্ঠা মানে তাতে স্থিতি। জ্ঞানে স্থিতি যখন হয়, তখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত যখন হচ্ছে তখন ধ্যানের অবস্থা। তখন কর্মের সঙ্গে বিরোধ আছে। আর তার আগে পর্যন্ত বিরোধ নেই। এই আমার বক্তব্য। কাজেই স্বামীজীর কর্ম আর ধ্যান—এ-দুটো বিরুদ্ধ নয়। তবে কর্ম যদি ঠিকমত করতে থাকে তাহলে সে-কর্ম ব্যক্তির সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার বাধা নয় অর্থাৎ, যদি সে তার সঙ্গে বিচার রাখে, লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকে, তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকে না।

॥ ৪০ ॥

প্রশ্ন : "কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (গীতা, ৩।২০) —এখানেও তো কর্মের স্তুতি করে বলা হল যে, তিনি সিদ্ধ হয়েছেন।

মহারাজ : এরকমভাবে ব্যাখ্যা করো না। যদি তাকে সিদ্ধ বল, তাহলে 'কর্মণাসহ' সেইভাবে। আর তা না হলে কর্মের দ্বারা যদি বল, তাহলে কর্মের দ্বারা তার চিত্তশুদ্ধি হল, তার পরে সিদ্ধি বা জ্ঞান হল।

—অর্থাৎ, চিত্তশুদ্ধিটাই সিদ্ধির কারণ হল।

মহারাজ : শঙ্কর চিত্তশুদ্ধিটাকেই এনেছেন। স্বামীজী বলছেন, আলাদাভাবে ওটার কোন দরকার নেই। চিত্ত শুদ্ধ হলে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির আর দরকার কোথায়? চিত্তশুদ্ধ মানে—যা আমাদের জ্ঞানকে আবৃত করে রেখেছে, সেই আবরণটা চলে গেলে তো হয়ে গেল। সুতরাং স্বপ্রকাশ আত্মা প্রকাশিত হল।

—তাহলে চিত্ত শুদ্ধ হলে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির দরকার নেই?

মহারাজ : আর বৃত্তির প্রয়োজন কী? ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রকাশ করতে পারছি? তা তো স্বপ্রকাশ—

—সেই চিত্ত তো রয়ে যাচ্ছে, তাই না? চিত্ত তো নাশ করতে হবে।

মহারাজ : চিত্ত রয়ে গেল মানে কী? শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক। ঠাকুরের পরিষ্কার কথা। যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেল, সেটা তখন অনির্দিষ্ট হয়ে গেল। যা আবরণ করছিল, সে আবরণশক্তিটা চলে গেল। তখন নাশ করার কিছু রইল না। কোন বাধা রইল না।

—আর জ্ঞান কর্ম সমুচ্চয় সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর যে বারবার বলেছেন, তা অসম্ভব।

মহারাজ : সেখানে কর্ম সকাম।

—আর নিষ্কামের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই?

মহারাজ : কোন বিরোধ নেই। নিষ্কাম কর্ম সহকারী।

—সহকারী?

মহারাজ : বিরোধ কোন্‌খানে হয়? ঐ নিদিধ্যাসনের সাথে বিরোধ। তুমি যদি ভাব, এই সময়টায় আমাকে অমুক করতে হবে, তমুক করতে হবে—তাহলে তোমার জ্ঞানেতে নিষ্ঠা থাকবে না। কাজেই সেরকম ভাববে না। ঐচ্ছিকভাবে চলতে হবে।

—এটা অবশ্য বলেছেন। কিন্তু উত্তরকাশীতে বেদান্তীরা বলে, জগৎ তো তিনকাল মে নেহি হ্যায়।

মহারাজ : জগৎকে তো স্বীকার করছি না। জগৎকে—যেমন ব্রহ্মাকারা বৃত্তিকে যদি স্বীকার কর, তাহলে বৃত্তি থেকে তুমি মুক্ত হতে পারবে না। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি জগতেরই মতো। ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও জগতেরই অধীন। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে। জ্ঞান বলতে যদি ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হবে ভাব, তবে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি যাবে কী করে? কার দ্বারা যাবে?

—বৃত্তিগুলি নিজের পথেই চলবে।

মহারাজ : বৃত্তি যাবে কী করে? শঙ্করও বোঝাতে পারেননি।

—নির্মলির মতো।

মহারাজ : নির্মলির মতো বলা হয়। নির্মলি একটা বড়ির মতো। তা জলকে নির্মল করে। জলে নির্মলি ফেললে সে নিজে থেকেই জলে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

—কাঠে আগুন থাকে, সে-আগুন কাঠকেও নিঃশেষ করে দেয়। নিঃশেষ করে দেয় মানে নিজেও নিঃশেষিত হয়।

মহারাজ : "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।" (গীতা, ৪।৩৭)

—অর্থাৎ, যেমন আগুন জ্বলে জ্বলে কাঠকে ভস্মসাৎ করে দেয়, সেরকম জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে দেয়। সমস্ত কর্ম বলতে, শঙ্কর বুঝিয়েছেন, প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া। প্রারব্ধ কর্মকেও যদি ভস্ম করে দিত, তাহলে আচার্যও থাকতেন না। সেজন্য বলছেন, প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া। চিত্ত যখন শুদ্ধ হল, তখন তার আর আবরণ রইল না।

—এই সম্পর্কে কাল একটা শ্লোক বলেছিলেন, মহারাজ।

মহারাজ : "প্রারব্ধ সিদ্ধ্যতে তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতি।
দেহাত্মভানৈবে স্যাৎ প্রারব্ধ কুতঃ?"

—প্রারব্ধ তখনি স্বীকার্য, যখন দেহাত্মবুদ্ধি রয়েছে—আমি কর্ম করছি, তার ফল আমি ভোগ করছি—কিন্তু দেহাত্মভাবটা তো আমাদের সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হচ্ছে না। এটা ইষ্ট না। দেহাত্মভাবটা আমরা স্বীকার করছি না। সুতরাং প্রারব্ধকে ত্যাগ কর। কার প্রারব্ধ?

—মহারাজ, এরকমও বলা হয়—জ্ঞানীর প্রারব্ধ ভোগ করতে হয় না। শরৎ মহারাজ, লীলাপ্রসঙ্গের মধ্যে সেটা অবলম্বন করে ঐরকম বলেছেন। দেহের মধ্যে আমি বোধ যদি না থাকে তাহলে প্রারব্ধ ভোগ করবে কে?

মহারাজ : কার প্রারব্ধ?

—অপরের হয় হোক।

মহারাজ : যে কর্ম করেছে তার ভোগ হোক। আমি কর্ম করিওনি, আমার ভোগও নেই।

প্রশ্ন : মহারাজ, জ্ঞান এবং ভক্তি কোন্‌টি কাকে অনুসরণ করে?

মহারাজ : ঠিক সেভাবে বলা যায় না। আসলে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন বিভেদ নেই। একটি বিষয় হল—জ্ঞান-বিচার অনেক সময় তত্ত্বহীন তর্কে পরিণত হয়ে যায়। যদি তুমি অনুভব কর যে, সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন স্বভাবতই তোমার ভালবাসা সকলের প্রতি সমানভাবে প্রবাহিত হবে—যেমন তুমি নিজেকে ভালবাস।

—মহারাজ, আমি বুঝতে পারি না জ্ঞান অথবা ভক্তি কোন্‌টি আমার পক্ষে অনুসরণযোগ্য।

মহারাজ : আমি জানি না কেউ বিষয়টি নিয়ে এভাবে ভাবনাচিন্তা করে কি না। কারণ, ভক্তিযোগ সাধারণ মানুষ এবং জ্ঞানযোগ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে অনুসরণীয় বলে মনে করা হয়। মনুষ্যসমাজকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—আবেগপ্রবণ ও বুদ্ধিবিচারশীল মানুষ। স্বামীজীর বিচারে আবেগপ্রবণ ব্যক্তিরা বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কারণ, শুষ্ক জ্ঞানবিচার অনেক সময় কোন উচ্চতায় উঠতে পারে না কিন্তু প্রেমাভক্তি অনির্বচনীয় আনন্দ ও শান্তির সন্ধান দিতে পারে। হৃদয়হীন জ্ঞানবিচারে আনন্দের কোন স্থান নেই। কিন্তু ভক্তি প্রতিপদে আনন্দের সন্ধান দিতে পারে।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী বলেছেন : "যতই আমি বড় হচ্ছি, যতই আমি বৃদ্ধ হচ্ছি, ততই প্রতি বস্তু আমার কাছে পৌরুষযুক্ত বলে মনে হচ্ছে—এটাই আমার নতুন বাণী।" পৌরুষযুক্ত কথাটির অর্থ কী?

মহারাজ : পৌরুষযুক্ত, অর্থাৎ নিজের প্রতি, নিজের শক্তিসামর্থ্যের প্রতি আস্থা।

—'প্রতি বস্তু আমার কাছে মনে হয়'—'মনে হয়' মানে কী?

মহারাজ : মনে হয় অর্থাৎ আমার বুদ্ধিবিচারে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

প্রশ্ন : মহারাজ, ভক্তিও পুরুষকারের ওপর নির্ভর করে?

মহারাজ : অবশ্যই। ভক্তিও পুরুষকারের ওপর নির্ভরশীল। কারণ, যদি তুমি মনে কর যে, তুমি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না বা তোমার নিজের চেষ্টা না থাকে, সেটা ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগ যে পথেই হোক, কোনপ্রকার উন্নতিই তুমি আশা করতে পার না।

প্রশ্ন : মহারাজ, শরণাগতি কী?

মহারাজ : শরণাগতি একটি মহার্ঘ প্রাপ্তি যা ভক্তি সহায়ে লাভ করা যায়। কোন দুর্বল ব্যক্তিত্ব বা শিশুসুলভ ঠুনকো অভিমান দ্বারা শরণাগতি লাভ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার জন্য সাহসী হৃদয়ের একান্তই প্রয়োজন। শরণাগতির অর্থই তো তাই।

—অতএব প্রথম প্রয়োজন পুরুষকার?

মহারাজ : একরকম তাই-ই। পুরুষকারের আরো অন্য অনুভূতি থাকতে পারে। কিন্তু এটি তারই মধ্যে একটি।

—মহারাজ, এখানে স্বামীজী কী অর্থ করছেন?

মহারাজ : তিনি এর অর্থ করছেন নিজের ওপর আস্থা বা বিশ্বাস।

—তাহলে শুরুতে আমরা বলতে পারি—প্রথমে নিজেকে প্রস্তুত কর। অতঃপর ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন কর।

মহারাজ : তারপর?

—নিজের ওপর আস্থা বর্ধিত হলে, যথার্থ শক্তিসঞ্চয় হলে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন কর।

মহারাজ : প্রশ্নের কোন শেষ নেই। তোমার যাত্রা শুরু হলে, এগিয়ে চল। এমন নয় যে, প্রথমে পুরুষকার অর্জন অতঃপর ভক্তিনিবেদন। শুধু তুমি এগিয়ে চল, এগিয়ে চল যথার্থ পুরুষকার সহায়ে।

—তাহলে শরণাগতিই শেষ পর্যায়?

মহারাজ : বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা বলা যায়। কেউ বলে শরণাগতি, কেউ বলে প্রেমাভক্তি। লোকে কী বলছে বা অনুভব করছে সেটাই শেষ কথা নয়। শরণাগতি একটি প্রাপ্তি এবং প্রেমাভক্তিও একটি প্রাপ্তি। যে ব্যক্তির প্রেমাভক্তি আছে তার শরণাগতি থাকবেই থাকবে। এই দুটিকে

পরস্পরের থেকে আলাদা করা যায় না। এগিয়ে চল। হঠাৎ করে কোন উচ্চতায় উঠে যাওয়া নয়। এটি একটি ক্রমবিকাশের পর্যায়। ঈশ্বরের আশীর্বাদে অথবা আমাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনার ফলস্বরূপ যখন শরণাগতি আসে তখনি আমরা তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে সক্ষম হই। তোমার জীবন তোমার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা তাঁরই একান্ত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে তুমি তোমার জীবনকে পরিচালিত করবে—তোমার জীবনের লক্ষ্য কী। আর তোমার জীবনের ভাঙাগড়া সম্পূর্ণই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। ঠিক আছে?

—ঈশ্বরের কাছে কিভাবে আত্মনিবেদন করা যায়, প্রাত্যহিক প্রার্থনার মাধ্যমে?

মহারাজ : সত্যি বলতে কী, সেই শক্তি অর্জন করার জন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি, কারণ এখনো তা আমরা অর্জন করতে পারিনি। এটি একটি দীর্ঘ পরিক্রমা। সত্যান্বেষণ বা চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে গেলে পর্যায়ক্রমে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। এটি একটি দীর্ঘ যাত্রা পথ।

—এই চলার পথে পুরুষকার আমাদের একান্তই প্রয়োজন, তাই তো?

মহারাজ : অবশ্যই। তোমার আপন ক্ষমতা অনুযায়ী আত্মবিশ্বাস একান্তই কাম্য। চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এটি অত্যাবশ্যক। তোমার আত্মবিশ্বাস থাকতেই হবে, এই আত্মবিশ্বাস যে, সাধনভজন করার জন্য আমরা স্বাধীন। লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব—এই বিশ্বাস যদি না থাকে, তবে কেউ পা-ই বাড়াবে না।

॥ ৪১ ॥

প্রশ্ন : আত্মবিশ্বাসকে কি motto বলা যেতে পারে? এই উপায়ে মোক্ষ হতে পারে, বলা হল?

মহারাজ : তার মানে, মোক্ষটাই তোমাদের কাম্য হল? আর কিছু হল না?

—মহারাজ, এটা তো উপায়—কিভাবে একে মানব?

মহারাজ : এর মধ্যে জগৎ-হিত নেই। কিন্তু সেটিকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হবে। যাঁরা শুধু মোক্ষকামী, সব পথ যে একই লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে—এটা তাঁরা জানেন না।

—তাহলে তো একসঙ্গে দুটোতেই জোর দেওয়া হয়েছে।

মহারাজ : দুটো কী একটা—সে-কথা নয়। কারণ, স্বামীজী বলছেন : "Each soul is potentially divine."

—রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতীকে চারটি যোগ দেখানো হয়েছে। আর নিচে লেখা রয়েছে—'তন্নোহংসঃ প্রচোদয়াৎ'।

মহারাজ : এটা প্রার্থনা।

—এটি আমাদের emblem। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এটাকে আমাদের motto বলা হয়।

মহারাজ : হ্যাঁ, আদর্শ। কিন্তু emblem-টা তো আদর্শ নয়। চারটে যোগের সমন্বয়ে কিভাবে আদর্শটি লাভ হবে তার ইঙ্গিত সেখানে রয়েছে।

প্রশ্ন : সদা সর্বদা তাঁর নাম করতে হয়, ঠাকুর বলছেন। আবার এক জায়গায় বলছেন—মৃত্যুকে সদা মনে রাখা উচিত। তা, এ-দুটো একসঙ্গে কী করে হবে, মহারাজ?

মহারাজ : "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।" অর্থাৎ, যেন যম চুলের মুঠি ধরেছে, এরকম মনে করে ধর্মাচরণ করবে। আর সময় নেই, এখনি আরম্ভ কর। এই কথা বলা হয়েছে।

—কিন্তু মৃত্যুকে সর্বদা কিভাবে মনে রাখব?

মহারাজ : মৃত্যুকে আমরা পুজো করি নাকি? ভগবানকে পুজো করি, মৃত্যুকে পুজো করি না।

—না, মৃত্যুকে স্মরণ রাখতে বলছেন।

মহারাজ : স্মরণ রাখতে হবে কারণ, ঐ যে বললাম—"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।" মৃত্যুকে স্মরণ করলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার যে-পথ, সেটা মনে পড়বে। সেটাই হল ভগবৎ স্মৃতি।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী ঠাকুরের আরাত্রিক স্তবে বলছেন : "সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ বারি যথায়।"—এর মানে কি ঠাকুরকে আশ্রয় করলে আর বেশি কিছু করতে হবে না?

মহারাজ : এটা তো বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, তাঁর শ্রীচরণ-রূপ সম্পদকে ধারণ করলে ভবসমুদ্র গোষ্পদ-তুল্য হয়ে যায়।

—মানে, কি কম হয়ে যায়?

মহারাজ : কম হয়ে যায় কী? গোষ্পদ অর্থাৎ গরুর খুরে যে-গর্ত হয়, সেটা যেমন অনায়াসে পার হওয়া যায়—সেইরকম ভবসমুদ্র অনায়াসে পার হওয়া যায়।

—তাহলে কি অনায়াসে ঐ গোষ্পদ পার হয়ে যেতে পারব, যদি ঠাকুরকে গ্রহণ করি? অর্থাৎ, সাধনা কিছু করতে হবে না?

মহারাজ : তব শ্রীপদ সম্পদ—এইটা করতে হবে, তবে তো ভব গোষ্পদ হবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন—ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আরো কত কী হতে পারেন। মহারাজ, 'আরো কত কী' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

মহারাজ : অর্থাৎ তিনি মন ও বাক্যের অগোচর। যিনি মন ও বাক্যের অগোচর, তাঁকে বুঝবে কী করে? সাকার বলতে একটা বিশেষণ দেওয়া হল। নিরাকারও একটা বিশেষণ। আরো কত কী মানে—এছাড়াও আরো কত, যা আমরা ধারণা করতে পারি না।

—মহারাজ, ঈশ্বর তো বাক্য-মনের অতীত?

মহারাজ : বলছ ঈশ্বর; আবার বলছ, বাক্য-মনের অতীত! ঈশ্বর মানে কী? ঈশ্বর মানে সর্বনিয়ন্তা। ও তো বলাই হল। তাহলে বাক্য-মনের অতীত হল কোথায়?

—কিন্তু স্বামীজী যে বলছেন—'মনোবচনৈকাধার'!

মহারাজ : এর মানে, মন-বাক্যের একমাত্র আশ্রয়—আধার। তাঁকে মনন করতে হবে, তাঁর কথা চিন্তন করতে হবে। এই তো। একমাত্র আধার। একমাত্র আশ্রয়।

—'মনোবচনৈকাধার' মানে একমাত্র আধার?

মহারাজ : হ্যাঁ। তিনি একমাত্র আধার—এটা মনে রাখতে হবে। শ্রুতিতে আছে—"তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" (মুণ্ডকোপনিষদ্, ২।২।৫)—সেই এক আত্মাকে জান। আর অন্য সব কথা, অন্য সব চিন্তা ছেড়ে দাও। এই হল 'মনোবচনৈকাধার'। বরং যেখানে যেখানে বিভূতির ঐশ্বর্য, যেখানে যেখানে সৌন্দর্য, যেখানে প্রবল উত্থান—সেখানে সেখানে ভগবানের অংশ। পরশুরামের ভিতরে সেই বিভূতি আছে বলেই তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলা হয়। পুরাণের মতে, এঁরা অংশাবতার।

—রাম কি পূর্ণ অবতার?

মহারাজ : না, রামও অংশাবতার। তিনি চার ভাগে জন্মেছেন—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। কাজেই পূর্ণ কী করে হবেন? একমাত্র কৃষ্ণকেই ভাগবতে পূর্ণ অবতার বলা হয়েছে। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" অর্থাৎ এঁরা সব পুরুষের অংশ, কলা এইসব। আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং অবতার, স্বয়ং ভগবান। এ হল ভাগবতের কথা। আমরা বলি, যার যা ইষ্ট তাই তার কাছে পূর্ণ।

প্রশ্ন : মহারাজ, জগৎকারণ কাকে বলে?

মহারাজ : যেখান থেকে জগতের সৃষ্টি।

—তাকে কি প্রকৃতি বলব, মহারাজ?

মহারাজ : প্রকৃতি তো সাংখ্যের।

—ঈশ্বর বলতে পারি?

মহারাজ : তা, বলতে পার। শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে এরকম হয়—ঈশ্বর যখন সৃষ্টি-উন্মুখ, সেই সময়ের কথা।

প্রশ্ন : মহারাজ, কারণ-শরীরে আনন্দের অনুভব হয়?

মহারাজ : কারণে লয় হয় বলতে পার।

—তখন আনন্দ?

মহারাজ : হ্যাঁ, আনন্দ।

—ঠাকুর একদিন বলছেন—মহাকারণ তুরীয়, তা মুখে বলা যায় না।

মহারাজ : তুরীয় বলতে গেলে কারণাতীত। ঈশ্বর কেন কারণাতীত নন?—কারণ, জগতের উৎপত্তি হচ্ছে তাঁর থেকে।

—মহারাজ, মন যত শুদ্ধ হয়—তত সমাধির দিকে এগিয়ে যায়—তত আনন্দটা বাড়ে। আনন্দের অনুভবটা কি আমাদের মন শুদ্ধ হলে তাতে হয়?

মহারাজ : মনও লয় হয় যখন, তখন তার একটা বৃত্তি থাকে। সেটাকেই আমরা বলি—আনন্দাকারা বৃত্তি। সেই বৃত্তির যেখানে লয় হয় সেখানে তুরীয়।

প্রশ্ন : বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দিরের উত্তরের দিকে একটা গাছ নাকি খুব প্রাচীন। যখন জমি কেনা হয়েছিল, তখনকার। সেটা অশোক গাছ। এছাড়া—পূর্ণা, চন্দন, ঠোঙা বট আর নাগলিঙ্গম—এই চারটি গাছের বর্ণনা আছে স্বামী দিব্যাত্মানন্দের 'দিব্যপ্রসঙ্গে' বইতে। আচ্ছা মহারাজ, ট্রেনিং সেন্টারের কোণটায় পাঁচটি গাছ নিয়ে পঞ্চবটী করা হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে যে পঞ্চবটী আছে, যার নিচে ঠাকুর তপস্যা করেছেন—সেই গাছের ডাল দিয়ে নাকি এটা করা হয়েছে।

মহারাজ : হ্যাঁ, ওটা বিরজানন্দজীর সময় হয়েছে।

—কাল সকালবেলা দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হচ্ছে।

মহারাজ : যাবে যখন তখন মাস্টারমশায়ের দক্ষিণেশ্বর বর্ণনা যেটা, সেটা সঙ্গে নিয়ে যেও।

—'কথামৃত' নিয়েছি।

মহারাজ : না, দক্ষিণেশ্বরের বর্ণনা যেখানে আছে—প্রথম ভাগে, সেটা সঙ্গে নিয়ে মিলিয়ে দেখো।

প্রশ্ন : মহারাজ, মাঝে মাঝে এত শ্লোক বলেন, মনে রেখেছেন কী করে?

মহারাজ : যখন যেটা মনে আসে সেটা বলি। কতগুলো যেন মনের ভিতরে গাঁথা হয়ে যায়, সেজন্য মাঝে মাঝে বলি। ভাগবত পড়েছি, চর্চাও করেছি। ভাগবতের ভিতরে cream হচ্ছে একাদশ অধ্যায়।

প্রশ্ন : মহারাজ আপনাদের সময় মঠে একজন পণ্ডিত ছিলেন—কে তিনি?

মহারাজ : তারাসার পণ্ডিত—তারাসার ভট্টাচার্য। আমরা তাঁর কাছে পড়েছি।

প্রশ্ন : স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন, "আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম—এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামিক দেহ—এই একমাত্র আশা।" ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবেন?

মহারাজ : এটা বুঝতে পার যে, দেহটা ঠিক থাকলে খাটতে পার। আবার মস্তিষ্ক তার বুদ্ধি চালাতে পারে, কিন্তু কাজ করার শক্তি নেই। হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিভেদ, মুসলমানদের মধ্যে সেরকম নেই। ইসলামে সমাজদেহটা সাম্যের দিকে লক্ষিত। আবার হিন্দুদের মস্তিষ্ক মানে উচ্চ চিন্তা করার ক্ষমতা রয়েছে। তাকেই স্বামীজী বৈদান্তিক মস্তিষ্ক বলেছেন। উচ্চ চিন্তা আমাদের আছে কিন্তু বাস্তবে মহাভেদ আমাদের সমাজে। স্বামীজী চেয়েছেন দুটি ভাবের সমন্বয়ে গড়া সমাজ। তত্ত্বধারণের ক্ষমতা ও তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগে সমাজদেহ শক্তিশালী করা—এই হল স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা।

প্রশ্ন : মহারাজ, তত্ত্ব-চিন্তন কী?

মহারাজ : তত্ত্ব-চিন্তন মানে যাঁর নাম জপ করছ তাঁর স্বরূপ-চিন্তন।

—স্বরূপ বিষয়ে একটু বলুন মহারাজ।

মহারাজ : স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ। "যেই রাম যেই কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ"—একথা ঠাকুর নিজেই বলেছেন। আরো বলেছেন : "এঁর ভিতরে মা ছাড়া আর কিছু নেই।" আবার অখণ্ডের ঘর থেকে স্বামীজীকে নিয়ে এলেন যে-দেবশিশু—তাতেও তিনি তাঁর নিজের কথাই বলেছেন। অন্যত্র বলেছেন : "এঁর ভিতরে দুটি আছে—একটি ভক্ত, আরেকটি ভগবান। এঁর ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বেরিয়ে এল। দেখলাম সত্ত্বগুণের প্রকাশ।"—ইত্যাদি চিন্তা করা হল তত্ত্ব-চিন্তন।

॥ ৪২ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, জল্পনা আর কল্পনা কি একই কথা?

মহারাজ : কাপড় চোপড় কি এক কথা? এরকম জল্পনা-কল্পনা। জল্পনা আর কল্পনা একসঙ্গে ব্যবহার অনেক সময় করে। জল্পনা মানে চিন্তা করা।

প্রশ্ন : অন্বয় আর ব্যতিরেক সম্পর্কে বলবেন?

মহারাজ : অন্বয় হল—যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানে বহ্নি। ধূমের সঙ্গে অন্বয় আছে বহ্নির। ব্যতিরেক মানে—যেখানে যেখানে নেই সেখানে সেখানে নেই। যেমন, যেখানে যেখানে বহ্নি নেই সেখানে সেখানে ধূম নেই। এই হল ব্যতিরেক বিচার। "যন্নৈবং তন্নৈবম্।" বিচার দুরকমের—অন্বয়মুখী আর ব্যতিরেকমুখী।

প্রশ্ন : স্বামীজী ধ্যান করে জানতে পারলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর অণুব্রহ্মাণ্ড একই। এর অর্থ কী মহারাজ?

মহারাজ : মহতেও যা, অণুতেও তা।

—এর কী অর্থ মহারাজ?

মহারাজ : "যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"—একটা মাটির ঢেলাকে জানলে মাটির তৈরি সমস্ত জিনিসকে জানা যায়, তেমনি একটা বিশেষ জিনিসকে জানলে তার উপাদানরূপে সমস্ত জগৎকে জানা যায়। এক বিন্দুকে জানা গেলে ব্রহ্মকে জানা যায়।

—এটা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু ধ্যান করে জানার কী দরকার? স্বামীজীরই বা ধ্যান করে জানার কী প্রয়োজন ছিল?

মহারাজ : স্বামীজী ধ্যান করে জানলেন এইজন্য যে, এটা আমাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না। আমি অল্প পরিসর, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী; আমি অল্পজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। সুতরাং আমি এক কেমন করে হব? এই বিপরীত বুদ্ধিটা যায় না। সেটা ধ্যান করে তিনি বুঝলেন—কী করে এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডই বৃহৎ হল।

—অণু আর বৃহতের মধ্যে পার্থক্য যে নেই, এটা কোন্ অর্থে?

মহারাজ : পার্থক্য নেই মানে, তাঁর মধ্যে পার্থক্য নেই। ক্ষুদ্র আর বৃহতের মধ্যে পার্থক্য নেই বললে সত্যের অপলাপ হল। তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে ক্ষুদ্রের মধ্যেও যা বিশালের মধ্যেও তা।

—উপাদান হিসাবে?

মহারাজ : উপাদান হিসাবে নয়, স্বরূপ হিসাবে।

—মায়া আর অবিদ্যাকে বলতে পারি?

মহারাজ : "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ চানন্ত্যায় কল্প্যতে।।"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৫।৯)

সেই যে ক্ষুদ্র সে আবার অনন্ত হয়ে যায়।

—মহারাজ, সে কি চৈতন্য অর্থে, না জগতের যে মায়া সেই অর্থে?

মহারাজ : চৈতন্য কি আমাদের একটা ধর্ম? না আমরা চিৎস্বরূপ? তাহলে চৈতন্য আর আলাদা নয়। চৈতন্য হল চেতনের ধর্ম—প্রতীকস্বরূপ।

—অবিদ্যা আর মায়ার কী অর্থ হবে?

মহারাজ : আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমরা চৈতন্যস্বরূপ। আমরা চিৎস্বরূপ হলেও আমরা নিজেদের অচিৎ বলে মনে করছি। এ হল মায়া—'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি।'

—মহারাজ, মায়ার একত্ব ও বহুত্ব কি কল্পনা?

মহারাজ : নানা না থাকলেও—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' বলছেন, অথচ আমরা নানা দেখছি। এই হল মায়া।

—মায়া এক না বহু?

মহারাজ : যার কোন সত্তাই নেই তার আবার এক আর বহু কী?

—সে তো ঠিক, কিন্তু আমরা তো উপলব্ধি করি।

মহারাজ : মায়া মানে, আমরা নিজেদের অজ্ঞ বলে বোধ করছি। আমরা অজ্ঞ না হয়েও আমরা অজ্ঞ বলে বোধ করছি—এটাই মায়া।

—এটা তো প্রত্যেকেই বোধ করছে।

মহারাজ : প্রত্যেকেই বোধ করছে—প্রত্যেকে মানে কী? প্রত্যেকে মানে বহুত্ব। বহুত্ব হল আরোপিত। বহুত্ব বললে একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য

আছে। আমরা যদি এক স্বরূপই হই তাহলে পার্থক্য কী করে থাকে? পার্থক্য না থাকলে—ওটা কী করে যাবে? বুঝতে পারছ?

—বুঝতে পারছি না মহারাজ।

মহারাজ : যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভেদদৃষ্টি রয়েছে ততক্ষণ বহুত্ব দেখছি। তাই তার বিরোধিতা করে বলা হচ্ছে—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।'

—সেটা উপলব্ধির আগে কী করে বোঝা যাবে মহারাজ? উপলব্ধির আগে কি সেটা বোঝা যায়?

মহারাজ : উপলব্ধি মানে কী?

—অপরোক্ষানুভূতি—সাক্ষাৎকার। অপরোক্ষ অনুভূতির আগে—

মহারাজ : অপরোক্ষ মানে যেন প্রত্যক্ষের মতো—সাক্ষাৎ প্রকাশ, সন্দেহ-বিপর্যয়রহিত। যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সেরকম।

—তার আগেও কি এই বোধ হতে পারে?

মহারাজ : এই বোধ হওয়ার নামই তো সাক্ষাৎকার। তার আগে পরে কী করে হল? বোধ হওয়া মানেই সাক্ষাৎকার। ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন তাঁকে জানা যাবে না, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যাবে না। কাজেই ব্রহ্মকে জানা যায় না বলা হচ্ছে। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হয় না।

—তিনি যখন সাধারণ ভূমিতে নেমে আসেন?

মহারাজ : আবার নামবেন কোথায়! তাঁর আবার নামা-ওঠা আছে নাকি?

—নির্বিকল্প সমাধি আর ব্যুত্থান যে আছে।

মহারাজ : সে তো আমাদের দৃষ্টিতে। তিনি উঠছেন, তিনি নামছেন—আমাদের দৃষ্টিতে। তিনি ওঠেনও না, নামেনও না। 'নোদেতি নাস্তমেতি একা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা।' তাঁর উৎপত্তি নেই, নাশ নেই। উদয় নেই, অস্ত নেই।

—বলা হয় যে, তিনি নেমে এসে কথা বলতে পারেন?

মহারাজ : সেটা হল লৌকিক দৃষ্টিতে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নয়। বলছে, জ্ঞানী জ্ঞানের পর নেমে আসে। জ্ঞানের পর নামবে কোথায়? কাজেই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জ্ঞানীর নামা-ওঠা নেই। জ্ঞানের দৃষ্টিতে জ্ঞানের উৎপত্তি

নেই। উৎপাদ্য যে-বস্তু তার নাশ হবে। জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না।

প্রশ্ন : স্বামীজী বলেছেন, এই মঠ যেন বাবাজীদের ঠাকুরবাড়িতে পরিণত না হয়। ঠাকুরবাড়ি মানে কী?

মহারাজ : ঠাকুরবাড়ি মানে, তাতে কালচার নেই, কেবল অনুষ্ঠান আছে। খুব মালপো আছে। খুব ভোগরাগ হয়। ঠাকুরজীর মন্দির এই খুলছে তো এই বন্ধ হচ্ছে। এখন ঠাকুর কী করছেন? ঠাকুর ঘুমাচ্ছেন।

—ওখানে পাঠ হয়। এসবও তো আছে।

মহারাজ : তার ভিতরে যদি প্রাণ থাকে—তাহলে আছে। যদি আন্তরিকতা না থাকে, লোক-দেখানো থাকে, তাহলে তা না থাকাই ভাল।

—আন্তরিকতা থাকে না, সেই অর্থে ঠাকুরবাড়ি বলেছেন?

মহারাজ : স্বামীজী বলেছেন, আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি করবে না। যেমন দৃষ্টান্ত দিলেন—ঠাকুরকে অতগুলো পান দাও কেন? চারটে দিলেই তো হয়। শশী মহারাজ গর্জন করে বলছেন—'ষোলো, ষোলো'। (হাসি)

—তাহলে আন্তরিকতা। এর সঙ্গে সেবাটাও কি থাকবে—জনসেবামূলক কাজ?

মহারাজ : শুধু সেটা নয়, একটা আদর্শ ঠাকুর দিতে এসেছিলেন।

—যারা আশপাশে আছে তাদের জন্য কিছু করতে হবে।

মহারাজ : যারা ঠাকুরবাড়িতে আছে তাদের জন্যও কিছু করতে হবে। স্বামীজী বলেছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' মানে, দুদিকে দৃষ্টি থাকবে।

॥ ৪৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিনে স্বামীজী বলেছেন যে, পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে তাঁর এই ধারণা হল যে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ সম্ভব নয়। আর তার পরেই বলছেন যে, এই জগতে আরেকটি

নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে আমার জন্ম হয়নি। তাহলে আমাদের সংঘকেও যে সম্প্রদায় বলা হয়।

মহারাজ : বলা হয় অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। Non sectarian sect.

—এটা একটা স্ববিরোধী কথা হল না?

মহারাজ : তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে।

—সম্প্রদায়ই তো হল। অসুবিধাটা কোথায়?

মহারাজ : বলছেন, অসাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িক মানে sectarian। সাম্প্রদায়িকেরা বলে—আমার যে-সম্প্রদায় সেটাই একমাত্র সম্প্রদায়। অন্য যে-সম্প্রদায়, সেটা সম্প্রদায়ই নয়।

—কিন্তু সম্প্রদায় মানে তো তা নয় মহারাজ। যেকোন একটা ধর্মমতকে তো সম্প্রদায় বলা হয়েছে।

মহারাজ : কিন্তু সাম্প্রদায়িক কাকে বলে?

—গোঁড়ামিকেই সাম্প্রদায়িক বলে।

মহারাজ : কিন্তু গোঁড়ামি নেই যেখানে সেটা অসাম্প্রদায়িক, সম্প্রদায়হীন নয়।

প্রশ্ন : স্বামীজী আবার বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো আমাদের প্রভুর ভাবের ইয়ত্তা হয় না।

মহারাজ : সে তো আছে, তাতে কী হল?

—এটা কিভাবে আমরা বুঝব? ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় না—সেটাই তো আমরা জানি।

মহারাজ : এখানে অসম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানের যদি বা ইয়ত্তা হয়, তাহলেও ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা হয় না। অসম্ভব। এটা হল reduced to absurdity। এটার সম্ভাবনা নেই। সেটা যদি ঘটেও তাহলেও এটার সম্ভাবনা নেই।

—কিন্তু ঠাকুরকে তো সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়!

মহারাজ : আবার ঐ তোমাদের বেদান্তের সগুণ ব্রহ্ম! সগুণ ব্রহ্ম, মানেটা কী? ব্রহ্ম—আবার সগুণ, নির্গুণ, ত্রিগুণ আর দ্বিগুণ?

—সেভাবেই তো বুঝতে হচ্ছে, মহারাজ।

মহারাজ : তা বোঝ, তবে তার দ্বারা সীমিত করো না। ব্রহ্ম শব্দের অতীত—এই কথা মনে রেখো। এই ভাবেই বুঝতে হবে। যেভাবেই বোঝ, কিন্তু শব্দের দ্বারা তাঁকে পরিচ্ছিন্ন করতে যেও না।

—কিন্তু যখনি বলছেন 'প্রভু' তখনি তো পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে!

মহারাজ : বলে দিচ্ছেন—পরিচ্ছিন্ন হয় না। ব্রহ্ম কী তা মুখে বলা যায় না। বারবার বলেছেন।

—কিন্তু তাঁর যে সগুণ রূপটা—সেটা কি মিথ্যা?

মহারাজ : একটা বহুরূপীর লাল রংটা মিথ্যা, না হলুদ রংটা মিথ্যা?

—নীল, হলুদ—এই যে কথাগুলি বলছি, এতে তো সেটা সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ : তার মানে এই হচ্ছে, তিনি কী যে নন তা বলতে পারছি না। উপনিষদে কী বলা হয়েছে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এখানে এরকম বুঝতে হবে যে, তিনি লালও বটে, নীলও বটে, হলুদও বটে—তিনি কী নন তা বলতে পারছি না। কখনো কোন রংই থাকে না।

প্রশ্ন : স্বামীজী আরেক জায়গায় বলেছেন, শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই যিনি অন্যের ওপর শিশুর ন্যায় কর্তৃত্ব করেন। শিশুকে দেখে মনে হয় সে অপরের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু সে বাড়ির রাজা।

মহারাজ : হ্যাঁ। স্বামীজী যেমন শিশু। কল্পনা কর তো স্বামীজীকে—।

—স্বামীজী বলেছেন, আমার ধারণায় নেতৃত্বের এই মূল রহস্য।

মহারাজ : বুঝলাম। কিন্তু তিনি গালাগালি দিতেও কম যাননি।

—এটা কী করে হয় মহারাজ?

মহারাজ : তত্ত্ব আর অনুশীলন। শুদ্ধানন্দ স্বামীকে বলছেন : "তোর ন্যাড়া মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম দিয়ে ভাঙব।"

—মহারাজ, আপনি একটা পদ্ধতি জীবনে খুব প্রয়োগ করেছেন। আপনি কাউকে কিছু বলেন না, কিন্তু তাতেই control করেন, কাজ হয়।

মহারাজ : একদিন মা চটে গেছেন, ছেলেকে বলছেন—মা, এ দাও, ও দাও, সে দাও; তুই আমায় কী দিস? ছেলেটি খানিক চুপ করে থেকে বলল—ভালবাসা। তাৎপর্যটা নিতে হবে, আক্ষরিক অর্থে হয় না। ভালবাসা দিয়ে শাসন করা যায়।

খোকা মহারাজ খুব সরল ছিলেন। তিনি তখন কোষাধ্যক্ষ। তাঁর কাছে সই করাতে নিয়ে গেলে বলতেন : "কোথায় সই করতে হবে?" এখানে—বলে দিলে সই করে দিতেন।

প্রশ্ন : বেদান্ত ও তার উপকারিতা বিষয়ে স্বামীজী বলেছেন : চারপ্রকার মানুষ সমাজকে শোষণ করে—শক্তিশালী ব্যক্তি, বুদ্ধিমান, অর্থবান ও পুরোহিত সম্প্রদায়।

মহারাজ : ভল্টেয়র বলেছেন—যতক্ষণ না পৃথিবীর শেষ পুরোহিতের অস্ত্রাদি দ্বারা শেষ রাজার কণ্ঠ নিষ্পেষিত হচ্ছে, ততক্ষণ পৃথিবীতে শান্তি আসবে না।

—জেনেভা-তে থাকতেন। পাশের দেশে একটা বাড়ি ছিল। তিনি বলতেন, যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে তাদের এমন জায়গায় থাকা উচিত যে, সহজে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। ইউরোপে কোন ব্যক্তি সহজেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেতে পারে।

মহারাজ : অনেকের মতে, দেশদেশান্তরের সমস্ত সীমারেখা তুলে দেওয়া উচিত।

—বাহাই জাতির লোকেরা ঐভাবেই চিন্তা করে। এক ঈশ্বর, এক পৃথিবী, এক ধর্মগুরু।

মহারাজ : ভগবান একটি পৃথিবীই গড়েছিলেন। মানুষই তাকে খণ্ডিত করেছে।

—ঠাকুর তো বলেই গেছেন, দুই ভাই জমিতে দড়ি ফেলে বলছে—এই ভাগটা আমার, ঐ ভাগটা তোমার।

মহারাজ : তাই তো।

প্রশ্ন : গত সপ্তাহে কয়েকজন সাধু আলোচনা করছিলেন, সাধুজীবনে একান্ত করণীয় জিনিসগুলি কী? দশজনে দশরকমভাবে ব্যাখ্যা করেন। আমরা আপনার কাছ থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে চাই।

মহারাজ : প্রথমে ঐ ১০টি বিষয় সম্বন্ধে আমাকে জানতে হবে। (হাসি)

—একজন বলেছেন যে, সাধুজীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে নম্রতা। অপর একজনের মতে ভগবানলাভ, অন্যান্য আরো কয়েকজনের মতে ত্যাগ, স্বামীজীর আদর্শ, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ইত্যাদি।

মহারাজ : সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মত, অথবা প্রত্যেকের মত একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ। তুমি কী বল?

—আমি বলি, সব মত জুড়ে একটি। মহারাজ, সেটাই সবচেয়ে ভাল রাস্তা নয় কি?

মহারাজ : সবকটি যুক্ত করে আরো কিছু জুড়বে কি?

—আপনি কি বলেন?

মহারাজ : সব কয়টি গুণকে একত্র করলে সেটাই হবে একজন সাধুর আদর্শ। সব কয়টি গুণ ও সবকয়টি মতকে একত্র কর। যদি কোন একটিকে এর থেকে বাদ দাও তাহলে একজন সাধুর পক্ষে তা হবে একটি অসম্পূর্ণ আদর্শ।

প্রশ্ন : একদিন বুদ্ধ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ব্রহ্মানন্দজীর কাছ থেকে কী ধরনের আধ্যাত্মিক নির্দেশ আপনি পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—মহারাজ বলতেন, ব্রহ্মচর্য, সত্য—সত্য, ব্রহ্মচর্য। এই উপদেশ তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

মহারাজ : ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তিনি কি তোমার কাছে ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যা করেছিলেন?

—না।

মহারাজ : না! বলছ কী? সাধারণ সংযমের অর্থ ব্রহ্মচর্য নয়।

—আমাদের কিছু বলুন।

মহারাজ : আরে ব্রহ্মচর্য মানে কি শুধু সাধারণ সংযম? জগতে নপুংসকরা রয়েছে, তারা কি ব্রহ্মচারী?

—অবশ্যই নয়।

মহারাজ : তাহলে? "মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে নহী মিলে নন্দলালা।"

॥ ৪৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, সেদিন আপনি বলছিলেন—'বেদ বিদ্যালয়ের ছেলেদের মজা করে কিছু বললে তারা কিছু মনে করে না, শুধু হাসে। আর এটা ভেবো না, সাধুরা শুধুই ঠাট্টা, ইয়ার্কি, হাসাহাসি করে; অবশ্যই তার মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিকতাও আছে।'

'হিউমার ইন ক্রাইস্ট' বইতে আমি একটি কৌতুকও লক্ষ করিনি। সেখানে কোন রসাত্মক আলোচনা খুঁজে পাইনি। সেদিন আপনি কয়েকটি ছোট ছেলেকে বলছিলেন যে, সাধুরা শুধুমাত্র হাসিঠাট্টায় মগ্ন থাকে না, তাঁদের মধ্যে কিঞ্চিত আধ্যাত্মিকতা সর্বদাই বর্তমান থাকে। আপনি কি বিষয়টা একটু বিশদে ব্যাখ্যা করবেন?

মহারাজ : বেশি বাড়াতে যেও না। (হাসি) যদি তা কর তাহলে অনেক কিছু বাদ পড়তে পারে।

—আমরা আপনার কাছে শুনতে চাই।

মহারাজ : তুমি নিজেই এখন একজন ধর্মপ্রচারক। একজন ধর্মপ্রচারকের সামনে কী করে আমি ধর্মোপদেশ দেব? (সকলের হাসি)

—কিন্তু আপনার কাছে আমি একজন হাঁদা।

মহারাজ : হাঁদা? তাহলে আমরা একজন হাঁদা ধর্মপ্রচারককে বিদেশে পাঠিয়েছি?

—সত্যিসত্যিই আমরা জানতে চাই। এখন তাঁরা গল্পকে আশ্রয় করছেন। স্বামীজী বলেছেন, যদি খ্রিস্টানরা একটি গল্প বলে, তাহলে হিন্দুরা বলে ২০টি। তাই তাঁরাও এখন কিছু কৌতুক আনার চেষ্টা করছে ধর্মোপদেশের মধ্যে। তাই আমরা জানতে চাই কৌতুকের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া বিষয়টি কিরকম। কারণ, শাস্ত্রের মধ্যে আমরা হাস্যকৌতুকের উপস্থিতি লক্ষ করি। ওঁরা বলেন—তোমরা হাস, কিন্তু আমরা হাসাহাসি করি না।

মহারাজ : কারণ, তাঁদের মধ্যে হাসিঠাট্টার ব্যাপারটাই কম। যাঁদের মধ্যে যা আছে তাই তাঁরা দেখেন। যদি তুমি ঠিকভাবে দেখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবীকেই তোমার মধ্যে দেখতে পাবে। তোমার চোখই তোমার পৃথিবীকে সৃষ্টি করবে। অন্য লোকেদের জন্য পৃথিবী সেরকম হবে না। তাই না?

বাদশা আকবর একবার লায়লাকে দেখতে চেয়েছিলেন। অতএব লায়লাকে আকবরের কাছে নিয়ে আসা হল। দেখার পর তিনি মজনুকে বলছেন : এই কুৎসিত-দর্শন মেয়েটির মধ্যে কী আবিষ্কার করে তুমি আকৃষ্ট হও? মজনু বলল : জাঁহাপনা, মজনুর চোখ দিয়ে দেখুন এবং তখনি আপনি তার সৌন্দর্য অনুভব করতে পারবেন। অর্থাৎ সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। একই বস্তু একজনের চোখে সুন্দর কিন্তু আরেকজনের কাছে অসুন্দর। মানুষ পৃথিবীকে সুন্দর দেখে যখন সে সুখে থাকে। কিন্তু যখন সে অসুখী হয় তখন পৃথিবীকে তার ধ্বংসস্তূপ মনে হয় এবং মনে করে এটা নিশ্চয়ই শয়তানের দ্বারা সৃষ্ট। সেইজন্য যে যেভাবে দেখে পৃথিবীটা ঠিক সেরকম নয়। প্রত্যেকে তার নিজের নিজের চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে দর্শন করে।

ধর, আলো-আঁধারিতে একজন মানুষ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বলছে—এটি একটি গাছ, কেউ বলছে—ইনি একজন যোগী। অন্য একজন বলছে—এ একজন মাতাল, আবার কেউ বলছে—চোর। একই বস্তু কিন্তু বিভিন্ন লোক বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করছে—যার কাছে যেমনভাবে তা দৃশ্যমান হচ্ছে। পৃথিবী আসলে একটি দৃশ্যমান বস্তু, বিভিন্নরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। আসলে এই সমস্ত কিছুর সমষ্টি ও তার থেকেও কিছু বেশি হচ্ছে এই জগৎ।

—একেই বলে অনুভূতি। কী অপূর্ব ব্যাখ্যা!

মহারাজ : এটা কি প্রশংসা না অন্য কিছু?

—প্রশংসা। আমি আপনার বইয়ের একজন একনিষ্ঠ পাঠক। বাস্তবিকই এটি একটি দারুণ সুন্দর উপস্থাপনা।

মহারাজ : কেউ কেউ বলে, সবকিছুই ছাপার অক্ষরে না থাকাই শ্রেয়।

—কে এরকম বলে?

মহারাজ : সেটা আমি জানি না। কিন্তু কেউ না কেউ বলেই।

—স্বামীজী শ্রীমকে বলেছিলেন : 'কথামৃত' লিখে আপনি মনে করবেন না সবাই আপনাকে প্রশংসা করবে। কেউ কেউ অভিশাপ দেবেন এই বলে যে, আমার স্বামী প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। তিনি 'কথামৃত' পাঠ করার পর সাধু হয়ে গেছেন, তাই আমি তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছি।

মহারাজ : একটি ঘটনার কথা বলছি। এটি কোন কাল্পনিক ঘটনা বা গল্প নয়। একজন ভদ্রলোক বলছেন—মিশন আমার ছেলেকে নষ্ট করছে। আরেকজন আমাকে বলেছিলেন—ছেলেটিকে বোঝান যে, গৃহীর জীবন সাধুজীবন অপেক্ষা উন্নততর। আমি তাঁকে বলেছিলাম—বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন। একই বস্তু হয়তো কোন একজনের পক্ষে ভাল, কিন্তু অন্য একজনের জন্য হয়তো আলাদা। কিন্তু তিনি আমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তিনি সেই একই কথা বলে আমার বিরক্তি উৎপাদন করতে থাকেন যে, ছেলেটিকে বলুন—সাধুজীবন জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, গৃহিজীবনই আদর্শ জীবন। মাঝরাত্রি পার হলে আমি বললাম—একথা বলতে গেলে প্রথমে আমাকেই সাধুজীবন পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় আমার কথার কোন মূল্য থাকবে না। তখন তিনি চুপ করলেন।

—আপনি আরেকটি জিনিস করতে পারতেন। আলমবাজার মঠে একজন পণ্ডিত এসেছিলেন স্বামীজীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার জন্য। স্বামীজী তখন গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন : "আপনার কাছে কি কাগজ, পেনসিল আছে?" তিনি বলেন : "হ্যাঁ, আছে।" স্বামীজী তখন সেই কাগজের ওপর লেখেন : "আমি পরাজিত।" কাগজটি সেই ব্যক্তিকে দিয়ে স্বামীজী বলেন : "আপনি এখন বিদায় নিন।"

মহারাজ : একজন গৃহী একথা বলতে পারেন যে, গৃহিজীবন সাধুজীবনের তুলনায় শ্রেয়। কিন্তু কোন সন্ন্যাসীকে যদি একথা বলতে বলা হয়,

তাহলে তাকে আগে সাধুজীবন পরিত্যাগ করতে হবে। তবেই সে একথা বলতে পারবে।

—আমাদের একজন বন্ধু অদ্বৈত আশ্রমে সাধু হিসাবে যোগদান করতে এসেছিল। তার মা-বাবা গম্ভীরানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করেন ছেলেকে বাড়ি ফিরে যেতে বলার জন্য। মহারাজ তাঁদের বলেন : "একজন সাধু হয়ে আমি আপনাদের ছেলেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলতে পারি না। তবে যদি সে আপনাদের সঙ্গে ফিরে যায় তাহলে আমরা কিছু মনে করব না।"

মহারাজ : আমি যে-ছেলেটির কথা বললাম তার ক্ষেত্রে হয়েছিল কী—সে সাধুও হয়নি গৃহীও হয়নি! (হাসি) তাঁরা ভেবেছিলেন, আমি তাঁদের ছেলেকে বিপথগামী করেছি। তাই তাঁরা ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে অন্য একজন সাধুর তত্ত্বাবধানে রাখেন এই আশায় যে, তিনি হয়তো অন্যরকম হবেন। কিন্তু সেই সাধুও ছেলেটিকে সাধু হওয়ার পরামর্শ দেন। তখন তার বাবা ছেলেকে নিয়ে কী করবেন সেই ভাবনায় খুবই মুশকিলে পড়েছিলেন। ছেলেটি সাধুসঙ্গ পছন্দ করে অথচ সব সাধুরই একই বক্তব্য। তাই কী করা যায়! ফলস্বরূপ সে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিন্তু সাধু বা গৃহী কোনটাই না হয়ে।

আরেকটা বলি শোন। একদিন আমি যাচ্ছি মঠ বাড়ির দিকে। মাঝে একটা বেড়া ছিল। বেড়ার ঝাঁপ সরিয়ে যেতে হতো। তা আমার পিছনে একটু দূরে এক পাগল আসছে। পাগল যেমন একটা বুঁচকি নিয়ে বেড়ায়, সেরকম করে। সে ঝাঁপটা সরিয়ে পার হতে পারছে না, অসুবিধা হচ্ছে। গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) ওপর থেকে দেখছেন। দেখে বললেন : তুমি দেখলে না যে, তোমার পিছনে একজন আসছে? তার অসুবিধা হতে পারে? আমি বললাম—হ্যাঁ মহারাজ, আমার অন্যায় হয়েছে। কারণ, সে পাগল হতে পারে, কিন্তু তার অসুবিধা হলে তো আমাকে সেটা দেখতে হবে।

—এটি একটি নতুন ঘটনা। আমরা শুনিনি আগে।

॥ ৪৫ ॥

প্রশ্ন : একটি ছোট্ট ঘটনার কথা জানা যায়, যেখানে শরৎ মহারাজ রেগে গিয়েছিলেন। স্বামীজী বলতেন, তাঁর বেলে মাছের রক্ত। মহারাজ, ঘটনাটি বলুন না—

মহারাজ : ঘটনাটি শ্রীশ্রীমায়ের অন্তিম সংস্কারের সময়ের। সবেমাত্র দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছে। ভক্তেরা চিতাভস্ম থেকে শ্রীশ্রীমায়ের দেহাবশেষ সংগ্রহে উদ্গ্রীব। শরৎ মহারাজ এটা দেখেন। আমি কখনোই তাঁকে এমন চিৎকার করতে শুনিনি। তিনি চিৎকার করে বলছেন : "যারা এই দেহাবশেষ সংগ্রহ করছে, তারা যদি প্রত্যহ যথাযথভাবে তার পূজার্চনা না করে তাহলে তাদের সর্বনাশ হবে—সর্বনাশ হবে।" তিনি এত জোরে বলেছিলেন যে, ভক্তেরা ভয়ে সেই দেহাবশেষ যথাস্থানে প্রত্যার্পণ করে।

—সেদিন উদ্বোধন থেকে বেলুড় মঠে পদযাত্রায় কি আপনি ছিলেন, না আপনি বেলুড় মঠেই ছিলেন?

মহারাজ : না, আমি পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলাম। শরৎ মহারাজও খালি পায়ে এসেছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর পায়ে ফোসকা পড়েছিল। সেটা একটা দারুণ গরমের দিন ছিল (জুলাই)। প্রখর সূর্যের তাপে রাস্তা এত গরম হয়ে গিয়েছিল যে, অনেকেরই পায়ে ফোসকা পড়েছিল।

—উদ্বোধন থেকে বেলুড় মঠের মধ্যে কোন স্থানে কি থামা হয়েছিল? মায়ের শরীর মাঝখানে কি কোথাও রাখা হয়েছিল?

মহারাজ : না।

—কেমন করে, কোথায় গঙ্গা পার করা হল?

মহারাজ : মায়ের শরীর প্রথমে কুটিঘাটে আনা হল—সেখানে নৌকা প্রস্তুত ছিল। বেলুড় মঠের নিজস্ব নৌকা। মায়ের দেহ তাতে রাখা হল। সাধুরা নিজেরা সেই নৌকা বাইল। বাকি সাধুভক্তরা অন্য একটি বড় নৌকায় গঙ্গাপার হল। স্বামী শঙ্করানন্দ সমস্ত অনুষ্ঠানটি দেখাশোনা করেন।

—সেই একদিনই মাত্র শরৎ মহারাজকে রাগতে দেখেছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, ওটি একটি বলার মতো ঘটনাই বটে। মহাসম্মেলনের (১৯২৬) সময়ও তিনি উচ্চকণ্ঠে সামান্য উষ্মা প্রকাশ করেন। আর কখনো তিনি এভাবে উষ্মা প্রকাশ করেননি। আরেকটি ঘটনা বলি—একবার জয়রামবাটী থেকে ফেরার পথে আমাকে এক রাতের জন্য চাঁপাডাঙায় থাকতে হয়েছিল এবং কোনভাবে আমার জপের মালা হারিয়ে ফেলেছিলাম। সকালে মার্টিন রেলে ফিরছিলাম। জপ করার জন্য খুঁজতে গিয়ে টের পাই সেটি হারিয়েছি। ফলে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। পরের স্টেশনে নেমে চাঁপাডাঙায় হেঁটে ফিরে যাই এবং সেখানেও না পেয়ে সোজা উদ্বোধনে চলে আসি। মালায় জপ না হওয়ায় সারাদিন খাওয়াদাওয়া নেই আর হেঁটে চলেছি। খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। ফিরে এসে শরৎ মহারাজকে সব বললাম। শুনে তিনি বললেন : "বাঁদর। মালা হারিয়ে গেছে তো কী হয়েছে! মালা কী এতই জরুরি? এই সাতু, ওকে খেতে দে তাড়াতাড়ি।" তারপর আবার নতুন মালা দিলেন।

—আপনি কতবার রাগ করেছেন?

মহারাজ : আমার রাগ হয় কিন্তু আমি গোপন রাখি। (হাসি) আমি জনসমক্ষে প্রকাশ করি না।

—আমি একটি ঘটনা জানি যখন শরৎ মহারাজ খুব রেগে গিয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটে আলমবাজার মঠে। পুরোহিত কাদাপায়ে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেছিল। শরৎ মহারাজ কাদাপায়ের ছাপ দেখতে পান। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন : কে এটা করেছে? তারপর যখন পুরোহিত সামনে আসে তিনি তৎক্ষণাৎ শান্তভাব ধারণ করে তাকে বলেন : ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।

মহারাজ : মহারাজ খুব বেশি হলে বাঁদর বলতেন।

—ঠাকুরের অন্য সন্তানরাও তো খুব বকতেন শুনেছি।

মহারাজ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি শুনেছি, সন্তোষানন্দজী বলেছিলেন—একবার ঠাকুরের তিথিপূজার দিন ভোগের জন্য মাছ রান্না হবে, আর সেটার দায়িত্বে রয়েছেন ভরত মহারাজ। দেখা গেল সে-মাছ হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছে না। ঠাকুরের কয়েকজন সন্তান বসে আছেন মঠবাড়ির গঙ্গার দিকের বারান্দায়। শরৎ মহারাজ বললেন : "যা হওয়ার হয়ে গেছে, এক্ষুনি জাল ফেলে মাছ ধরে ভোগের ব্যবস্থা কর।" তিনি একটুও উত্তেজিত হলেন না।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমি গোপীনাথ কবিরাজের তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত পড়েছি। তাতে মন্ত্রচৈতন্যের ব্যাপারে তিনি এক বিরাট আলোচনা করেছেন। অন্য গ্রন্থও দেখেছি। মন্ত্রচৈতন্য কী তা আমরা জানতে চাই।

মহারাজ : যে-মন্ত্র তাৎক্ষণিক ফল প্রদান করবে।

—কেমন করে?

মহারাজ : মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে। তাতেই কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্মেষ ঘটবে। মন্ত্র চৈতন্যস্বরূপে বিরাজ করে।

—স্বামীজী বলেছেন, আজ আমি স্বর্ণাক্ষরে মন্ত্রদর্শন করেছি।

মহারাজ : আমি জানি না কোন্ ভাষা—বাংলা না হিন্দি! (হাসি)

—সেখানে কোন একটি প্রক্রিয়া আছে কি?

মহারাজ : প্রক্রিয়া? না কোন চেতন প্রক্রিয়া নেই। যদি তুমি প্রকৃত আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে মন্ত্রজপ কর, তাহলে মন্ত্রের চৈতন্য হয়। সেটি তখন কার্যকরী হয়।

প্রশ্ন : হৃদয়কে কী করে মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যায়?

মহারাজ : যদি তোমার হৃদয় থাকে তবেই তুমি জানবে কী করে তা প্রতিষ্ঠা করা যায়। (হাসি) বেশিরভাগ লোকই হৃদয়হীন।

প্রশ্ন : একজন পশ্চিমী যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে—বেদান্ত জানতে গেলে আমার কোন্ বইয়ের প্রয়োজন?

মহারাজ : স্বামীজীর বই।

—আপনার পছন্দের কি কোন ক্রমতালিকা আছে?

মহারাজ : বেদান্ত বিষয়ে স্বামীজীর অনেকগুলি বক্তৃতা আছে। কোন বিশেষ পছন্দ কিছু নয়। আমি যখন কলেজের ছাত্র তখন শোভনলাল

দাশগুপ্ত নামে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, রামকৃষ্ণ মিশন কী? এটি কি কোন সমাজসেবামূলক অথবা হোমিওপ্যাথি বেদান্ত? বোঝ কথা! সমাজসেবা ও হোমিওপ্যাথি বেদান্ত!

প্রশ্ন : আপনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিভাবে? তিনি কি আপনাদের শিক্ষক ছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, তিনি আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি মুক্তি পেতে আগ্রহী কিনা। উত্তরে বলি—না, সেরকম তো মনে হয় না। তিনি বললেন—তোমার মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। বললাম, আমি আগ্রহী নই। যদি তাই হতো তাহলে বেদান্ত বোঝার জন্য আমি আপনার কাছে আসতাম না।

সত্যি সত্যি সেই সময়টি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। ঠিক মনে নেই কোন্ বছর। মনে হয় আমি তখন ফিলজফি অনার্সের ছাত্র। আমাদের ক্লাসে ৬ জন ছাত্র ছিল। সেইজন্য অধ্যাপকদের সঙ্গে আমাদের খুব নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তিনি বলতেন—কমবয়সে তিনি 'কথামৃত' পড়েছেন, এখন মনে করেন তিনি সেই অবস্থা থেকে উন্নততর হয়েছেন।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন, জীবনের শেষভাগে স্বামীজী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' পড়েছিলেন। কেউ নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "আপনি বর্ণপরিচয় পড়ছেন কেন?" উত্তরে তিনি বলেন : "প্রথম জীবনে আমি এই বইটি পড়েছিলাম আর এখন এই বই পড়ার মাধ্যমে এর লেখককে জানার চেষ্টা করছি।"

মহারাজ : হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। আমি বিদ্যাসাগর স্কুলে পড়েছি। তোমরা জান বিদ্যাসাগর স্কুলের বিষয়ে। শ্যামবাজারে। মাস্টারমশাই এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ কয়েকজন শিষ্য এখানে পড়াশোনা করেছেন—বাবুরাম মহারাজ, আরো কয়েকজন; পূর্ণও বিদ্যাসাগরের স্কুলে পড়েছেন।

॥ ৪৬ ॥

প্রশ্ন : স্বামী নিখিলানন্দ স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে একবার কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন যে, স্বামীজী একজন বিরাট বক্তা ছিলেন। শুদ্ধানন্দজী উত্তরে বলেন, হ্যাঁ! যিনি তিনমাস বিদ্যালয়ের চাকরিটি চালিয়ে যেতে পারেননি, তিনি আবার বিরাট বক্তা, মহান শিক্ষক! নিখিলানন্দজী বললেন, স্বামীজীর কাজ ছাত্রচরানো নয়। বারো বছর স্কুল চালালে রাখাল হয়।

মহারাজ : জীবনে স্বামীজীর কতই না অভিজ্ঞতা হয়েছিল! শুনেছি, বিদ্যাসাগরের স্কুল থেকে যখন শুনলেন—তাঁকে আর আসতে হবে না—তিনি কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। শুধু বলেছিলেন : "আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারি। কেন তাঁরা পছন্দ করেননি কে জানে!"

—শুনেছি, এর জন্য দায়ী বিদ্যাসাগরের জামাই। স্বামীজীর দৃঢ় ও স্বাধীনচেতা মনোভাব তিনি পছন্দ করেননি। স্বামীজীর বিরুদ্ধে চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা।

মহারাজ : বিদ্যাসাগরের জামাইকে আমি দেখেছি। তিনি হয়তো প্রতিযোগিতার গন্ধ পেয়েছিলেন। বিদ্যালয়ে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রতিযোগীকে সহ্য করতে পারতেন না। কী অবস্থা! স্বামীজী শিক্ষক হিসাবে কোন বিদ্যালয়ে আর চাকরিই পেলেন না!

—সেসময় শ্রীম বলেছিলেন : "আমি কি তোমার জন্য কয়েকজন ছাত্র জোগাড় করে দেব যাতে তুমি তাদের বাড়িতে পড়িয়ে অর্থোপার্জন করতে পার?" স্বামীজী বলেন : "না।"

মহারাজ : স্বামীজী অফিসে অফিসে ঘুরেছেন কাজের সন্ধানে। কিন্তু কেউই সাড়া দেননি, সবাই ফিরিয়ে দেন। কী করুণ অবস্থা! সেইসময়ে তিনি একজন স্নাতক। তখনকার দিনে গ্র্যাজুয়েট খুব একটা দেখা যেত না, আর স্বামীজীর মতো একজন মেধাবী বুদ্ধিমান ব্যক্তিও চাকরি পাচ্ছেন না। এ এক দৈবলীলা। আসলে তিনি কেরানি হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি।

—মহারাজ, আজ এপর্যন্তই থাক; সময় হয়ে গেছে।

মহারাজ : সময় হয়ে গেছে? তুমি কি তা ফিরিয়ে আনতে পারবে না?

—তেমন অতিমানবকে কোথায় পাব?

মহারাজ : যখন আমি বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দিতাম, তখন বলতাম—কোন পিরিয়ডের আগে বা পরে আমাকে ক্লাস দেবেন না। কারণ, আমি পিরিয়ড শেষ হলেও থামতে পারতাম না। তাই সাধারণত আমাকে শেষ পিরিয়ড দেওয়া হতো এবং প্রায়ই আমি পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলেও ক্লাস চালিয়ে যেতাম।

প্রশ্ন : মহারাজ, লিঙ্কনের সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। তিনি নাকি দেখতে খুব কদর্য ছিলেন। তিনি ও ডগলাস একসময় প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি বিতর্ক ছিল। ডগলাস বলতেন : "লিঙ্কন একজন দুমুখো মানুষ। তাই তাঁকে ভোট দেবেন না।" উত্তরে লিঙ্কন বলতেন : "ডগলাসের বক্তব্য অনুসারে আমার দুটি মুখ। কিন্তু আমার যদি অতিরিক্ত আরেকটি মুখ সত্যিই থাকত তাহলে কি এই বিশ্রী মুখটা আমি নিয়ে বেরোতাম?"

মহারাজ : বার্নাড শ-র গল্প জান তো? একজন মহিলা চিত্রতারকা এ্যালেন টেরী বার্নাড শ-কে প্রস্তাব দেন : "যদি আপনি আমাকে বিবাহ করেন, তাহলে আমাদের সন্তান হবে আমার মতো সুন্দর আর আপনার মতো বুদ্ধিমান।" তখন শ বলেন : "হ্যাঁ, সবই তো ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাপারটা যদি উলটো হয়?" (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : আচ্ছা মহারাজ, আপনি স্বামীজীকে না দেখলেও তো স্বামীজীর শিষ্যদের দেখেছেন।

মহারাজ : সে অনেকদিন আগের কথা।

—সেই কথা আমরা শুনতে চাই।

মহারাজ : একবার শুদ্ধানন্দজী মহারাজ আমাকে লেখেন—আমরা কি তোমাকে তপস্যা থেকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানাতে পারি? তাঁর চিঠি পেয়ে যেভাবে গিয়েছিলাম সেই একইভাবে ফিরেও এলাম।

—মহারাজ, আপনি তো কিছুদিন কনখল সেবাশ্রমে তপস্যায় ছিলেন—স্বামী কল্যাণানন্দ মহারাজকে কেমন দেখেছেন?

মহারাজ : বিচিত্র মানুষ। যখন তিনি মুসৌরী বা অন্য কোথাও যেতেন তখন আশ্রম পরিচালনার খরচ হিসাবে একটি পাইপয়সাও দিয়ে যেতেন না। একজন ভাণ্ডারি ছিলেন—স্বামী আত্মানন্দ। তাঁর কাছেই টাকা পয়সা রাখা থাকত। সাধুদের প্রতিদিন তাঁর কাছে ভিক্ষা করতে হতো আশ্রম চালানোর জন্য। আরেকটি মজার ব্যাপার—আশ্রমে একটি রাইফেল ছিল আত্মরক্ষার জন্য। সেটি কল্যাণানন্দজীর ঘরে রাখা থাকত।

—সম্ভবত সেসময় আশপাশে অনেক বন্যপ্রাণীর আনাগোনা ছিল।

মহারাজ : জন্তু-জানোয়ার নয়; ওখানে খুব ডাকাতি হতো। একদিন কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে খুব গোলমালের আওয়াজ আসছিল। আমরা ভাবলাম, হয়তো ডাকাত পড়েছে। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বন্দুকটা চাইলেন কী হয়েছে দেখতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোন উত্তর এল না। কল্যাণানন্দজী দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যেই রয়েছেন। কোন উত্তর দিচ্ছেন না। তখন নিশ্চয়ানন্দজী একটি বড় লাঠি জোগাড় করে দেখতে গেলেন কী হয়েছে। গিয়ে দেখেন, ঝাড়ুদাররা মদ খেয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করছে! স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে দেখে তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। তিনিও ওদের খুব বকাবকি করলেন। অতঃপর তারা শান্ত হলে তিনি ফিরে এলেন। কিন্তু পরদিন সকালে কল্যাণানন্দজী অনেক বেলাতেও দরজা খুলছেন না দেখে সকলে ডাকাডাকি করতে লাগল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল : "মহারাজ, আপনি বাইরে বেরচ্ছেন না কেন?" মহারাজ বললেন : "আমি বেরতে পারছি না।" কেন পারছেন না তা তিনি বললেন না। তখন একজন সাধু দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে স্কাইলাইট দিয়ে দেখেন যে, তিনি ভিতরেই আছেন। তাহলে হয়েছেটা কী? কল্যাণানন্দজী বললেন : "আমি দরজা খুলতে পারছি না।" আসলে যখন খুব গোলমাল হচ্ছিল তখন তিনি ভয় পেয়ে একটি লোহার সিন্দুক টেনে এনে দরজায় ঠেস দিয়ে রেখেছিলেন আর এখন সেটি নড়াতে পারছেন না। লোকজন তখন স্কাইলাইটের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে সেই সিন্দুক সরিয়ে দিতে তিনি বাইরে আসতে পারলেন।

॥ ৪৭ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের বাবা। একথার অর্থ কী?

মহারাজ : বাবা না থাকলে ছেলে কোত্থেকে আসবে? ঠাকুর যদি না থাকেন তাহলে ভগবান কোত্থেকে আসবেন? ঠাকুরের কাছ থেকেই তো শিখবে ভগবানের কথা। কাজেই ভগবানের বাপ হলেন ঠাকুর। তুমি হিসাব মিলিয়ে নাও না। পছন্দ হচ্ছে না? (সকলের হাসি)

—হ্যাঁ, পছন্দ হচ্ছে মহারাজ। ভাগবতে বলা হয়েছে : 'এতে চাংশ কলা কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ম্।' অবতারেরা সেই পুরুষের কলা বা অংশ। আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। অর্থাৎ, ঐ কৃষ্ণ থেকে অন্য সব অবতাররা এসেছেন। তাই কি, মহারাজ?

মহারাজ : কৃষ্ণ থেকে এসেছেন নয়; কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান। আর যাঁরা এসেছেন তাঁরা কেউ কলা, কেউ অংশ।

—এখানে অংশ বললেন। এর অংশ, এর কলা—এই এর বলতে কার?

মহারাজ : এর কোথায়? পুংসঃ—পুরুষের।

—এই পুরুষ কে?

মহারাজ : 'পুরুষ এব ইদং সর্বম্।' দুটো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'পূর্ণ অনেন সর্বং ইতি পুরুষ', আর 'পুরি শেতে ইতি পুরুষ'।

—দুটোই পুরুষ। আজ বছরের শেষ সংক্রান্তি। কাল থেকে নতুন বছর শুরু।

মহারাজ : এইজন্য পুরুষ দিয়ে শেষ করলে!

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন যে, ঠাঁইনাড়া হতে হবে। মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হবে। পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই কি একথা বলা?

মহারাজ : হ্যাঁ, যারা উত্তরকাশীতে থাকে তাদের তপস্যা করতে হলে অন্য জায়গাতে যেতে হবে। সেখানে হবে না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের কথা কিছু বলুন।

মহারাজ : একবার বাংলাদেশে গিয়েছি। এক জায়গায় লোকে গাড়ি থামিয়ে দিল, দিয়ে গাড়ির বনেটের ওপর উঠে বসে পড়ল! এ এক মুশকিল ব্যাপার। আমরা গাড়ির ভিতরে। কী করব ভাবছি। তা কী মনে করে আবার নেমে গেল। আমাদের ছেড়ে দিল।

—হরতাল ছিল মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, তা এসবে তাল তো পাওয়া যায় না!

—কোথায় হয়েছিল মহারাজ? সিলেটে?

মহারাজ : সিলেটে তো হয়েইছে। ঢাকা থেকে যাচ্ছিলাম চিটাগাং-এ। সেখানে গাড়ির ওপরে উঠে বসে পড়ল। গাড়ি চালালে যদি পড়ে যায়, তাহলে তো হয়েছে আর কী!

—বাংলাদেশে তো অনেকবার গেছেন?

মহারাজ : অনেক গেছি। বাংলাদেশে যত বক্তৃতা দিতে হয়েছে, সেগুলো জড়ো করলে একটা বড় বই হয়ে যেত।

—বই একটা বেরিয়েছিল উদ্বোধন থেকে। ওখানকার ভাষায় আপনি বলেছিলেন।

মহারাজ : সিলেটের কথা কিছু কিছু জানি। কইতাম পারি, কইতে পারি, কতি পারি।

—কতি পারি, কাদের ভাষা?

মহারাজ : যশোরের, খুলনারও।

—ঢাকার ভাষা তো আপনি ভালই জানেন। ঢাকায় তো আপনি ছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, ঢাকায় ছিলাম। প্রথমে গেলাম—হাপের খেলার জায়গায়। আমি প্রথমে গিয়েছি, ভাবছি—'হাপের খেলা' কিরে বাবা! (সকলের হাসি) তারপরে বেরিয়ে দেখি, সাপুড়েরা যাচ্ছে, সাপের খেলা।

—সাপের খেলা?

মহারাজ : হ্যাঁ, হাপের খেলা। (সকলের হাসি) আরেকজন লোক বলছে : কী কমু মহারাজ, হালার কী কমু মহারাজ। আমি ভাবি, 'হালা হালা' করছে কেন? (সকলের হাসি) স্কুলের একটি ছেলে শিক্ষকের কাছে

নালিশ করছে : মাস্টের মাস্টের! এই হালা আমারে হালা কয়। (সকলের হাসি) তা মাস্টার বলছে : কিরে হালা? তুই এ হালারে হালা কস? (সকলের উচ্চস্বরে হাসি)

—বাংলাদেশে দীক্ষাও তো খুব হয়েছে।

মহারাজ : তা হয়েছে।

—মহারাজ, সিলেটের ভাষাটা কিরকম?

মহারাজ : ঐ যে বললাম—বৈকাল্লায় হামিরায় হামিরায় বালুতলে হালার পো হালায় যেন মত্তে মাদাই যেলা সম্ভুত্থান সম্ভুত্থান।

—কিছুই বুঝলাম না, মহারাজ। এবার বাংলা করে বলুন।

মহারাজ : বৈকাল ন্যায় হামিরাই—হামিরাই বালুতলে হালার পো হালায়। গতকাল হালার বয়রা। বয়রা মানে বলদ।

—বলদ?

মহারাজ : বলদ না মোষ কী হবে জানি না। মাদাই যেলা—যেরকম মাতামাতি করছিল, সম্ভুত্থান সম্ভুত্থান—তুমুল কাণ্ড তুমুল কাণ্ড। (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, সব শিয়ালের এক রা। এর মানেটা কী?

মহারাজ : তার মানে যত আধ্যাত্মিক অনুভবসম্পন্ন পুরুষ, তাঁরা সকলেই তত্ত্বকে একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

—কিন্তু বাস্তবে তো দেখছি তাঁদের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

মহারাজ : সেটা বোঝার পার্থক্য। তত্ত্বের পার্থক্য নয়। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত—সর্বত্র সেই ঈশ্বরকে দেখা। এবিষয়ে কোন প্রভেদ আছে?

—কিন্তু বুদ্ধ কোথায় একথা বলেছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ বুদ্ধ বলেছেন—বাসনা ত্যাগ।

—বুদ্ধ উপায় সম্বন্ধে বললেন, কিন্তু উপেয় সম্বন্ধে কিছু বলেননি। যে-উপায় দ্বারা সবকিছু লাভ করা যাবে, সেসম্বন্ধে কি ঠাকুর বলছেন—সব শিয়ালের এক রা?

মহারাজ : যদি শিয়াল আওয়াজ না করে, তাহলে?

—তাহলে তো কিছুই বোঝা গেল না মহারাজ।

মহারাজ : তা 'রা' তো কিছু থাকবে। তুমি বুঝতে পারলে না 'রা'?

—রা করল না শিয়াল, আর আমরা বুঝব যে, ওরা করেনি।

মহারাজ : কী মুশকিল! চুপ করে রইল তো। গ্রামে কখনো বাস করনি তো, তাই বুঝলে না।

—তাদেরও তো সেরকম।

মহারাজ : ঐখানে মিল আছে তো?

—কোথায় মহারাজ?

মহারাজ : ঐ যে বললাম—সর্বত্র সেই এক ঈশ্বর দর্শন।

—ঠাকুর বলছিলেন, দর্শন তো একই, কিন্তু বলাটা অন্যরকম হচ্ছে।

মহারাজ : তা হোক না। 'রা' নিয়ে কথা।

—আমরা যা শুনছি, সেটা নিয়েই তো আমরা বিচার করব। তিনি কী দর্শন করলেন, সেটা তো আমরা জানি না।

মহারাজ : কী বলেছেন তা তো বিচার করবে? বলেছেন, সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সকলেই বলেছেন।

—বুদ্ধ এত করে বললেন : 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়', কিন্তু ঈশ্বরের কথায় তিনি চুপ।

মহারাজ : তিনি উপায়ের ওপর জোর দিয়েছেন, উপেয় এমনিই হয়।

—মহারাজ, 'রা'টা কি তত্ত্বকে বোঝাচ্ছে, নাকি ব্যাখ্যা?

মহারাজ : 'রা' মানে শব্দ। তাঁদের উপদেশ। তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ।

—কিন্তু উপদেশ তো ভিন্ন।

মহারাজ : সেগুলি এক জায়গায় নিয়ে গেছে তো।

—এক জায়গায় মানে কোন্ জায়গায়?

মহারাজ : ঐ—সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন।

—কিভাবে ঈশ্বরদর্শন হতে পারে, সে-ব্যাপারে কি তাঁরা একমত?

মহারাজ : হ্যাঁ। 'রা' বলতে ঐটাই বোঝাচ্ছে। ঠাকুর 'রা' বলতে তাই বোঝাচ্ছেন।

—শঙ্কর, রামানুজ বা মধ্ব তো এক কথা বলছেন না। ভিন্নতা রয়েছে তাঁদের তত্ত্বতে।

মহারাজ : তাঁরা সকলে কী বলেছেন—কী বুঝবে?

—সে তো জানি। আমরা জানি না অনেক। কিন্তু এই চর্চাটা আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য মহারাজ।

মহারাজ : তত্ত্ব সম্বন্ধে সকলে একই কথা বলেন। সকলের একই সিদ্ধান্ত। এই ঠাকুরের কথা।

॥ ৪৮ ॥

প্রশ্ন : কোন কোন ধর্মে সন্ন্যাস স্বীকার করা হয়নি বটে, কিন্তু দানের কথা আছে। ত্যাগের কথা আছে।

মহারাজ : দান আছে, ত্যাগ নয়।

—সে কী মহারাজ! দান করতে গেলে ত্যাগ তো করতেই হয়।

মহারাজ : ত্যাগ মানে আকর্ষণ ত্যাগ।

—কিন্তু তার জন্য অন্তত যে বাহ্য ত্যাগটা করল, তাতেও তো দান আছে।

মহারাজ : তাই তো। ত্যাগ হল, কিন্তু আকর্ষণ গেল না!

—মনে আকর্ষণ থাকতে পারে। কিন্তু বাহ্য ত্যাগটাও কি কম ত্যাগ?

মহারাজ : ওঃ! এইটুকু হলেই হয়ে গেল? তা এইটুকুতে হবে?

—তাহলে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে মিলটা কোথায়?

মহারাজ : ঐ যে বললাম—সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখা।

—বুদ্ধ তো সেবিষয়ে কিছু বলেননি—

মহারাজ : বুদ্ধ বলুন আর নাই বলুন—তাঁদের সিদ্ধান্ত তো এক ছিল।

—হ্যাঁ, এখন ঠাকুরের কথাতে স্বীকার করে নিই যে, তাঁদের একই সিদ্ধান্ত ছিল।

মহারাজ : তাহলে আর কেন তর্ক করছ?

—কিন্তু ঠাকুরের কথা যারা স্বীকার করবে না?

মহারাজ : তর্ক দুরকমের—স্বমত প্রতিষ্ঠা আর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা। তত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক হতে পারে দুই কারণে। এক হতে পারে সিদ্ধান্তকে খোঁজার জন্য, আর এক হতে পারে বুদ্ধির দ্বারা সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তর্কসংগ্রহটা পড়ে এস। এমন কূটকচাল যে জপধ্যান উড়ে যায়! আমাদের তারাসার পণ্ডিত বলতেন : সন্ধ্যা করার সময় বসেছি, বসে শ্লোক আওড়াচ্ছি—তর্কের শ্লোক। লোকে মনে করছে, খুব সন্ধ্যা করছি। "বাচ বিভ্রাটনং এতাদৃশ—" ইত্যাদি।

—সেইজন্যই বোধহয় বলে, বেশি পড়া ভাল নয়।

মহারাজ : "নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।" তর্ক অনেক সময় বুদ্ধিকে মলিন করে দেয়। ছিদ্রান্বেষণ হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণ নিয়ে ব্যাপ্তি পঞ্চক হল। তা ব্যাপ্তির এক-একটা লক্ষণ খোঁজে, আর তার দোষ বার করে। তাতে আরেকটা বিশেষণ দেয়। কোন কিছু বাড়াবাড়ি করা ঠিক না। মুশকিল হচ্ছে, এমন কোন উপায় আছে কি যার দ্বারা বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিনা ধরা যাবে?

—হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে সমস্যা। আমরা কোন্‌টাকে যে বাড়াবাড়ি বলব—তার তো কোন নির্দিষ্ট সীমা করা যাচ্ছে না!

মহারাজ : বিচারের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে বিচারের শক্তির তারতম্য আছে। সবসময় নিজের দোষ দেখবে। অন্যের গুণ দেখবে। এই তো মায়ের শিক্ষা।

—মহারাজ, স্বামীজী বলেছেন, সবসময় একটা উচ্চভাব নিজের মধ্যে রাখবে যে, আমি বড়। আত্মবিশ্বাস হারাবে না।

মহারাজ : 'আমি বড়' কথাটার মানে কী? অপরের চেয়ে বড়? না। অপরের চেয়ে বড় হতে স্বামীজী বলেননি? স্বরূপ—তা তার রূপই নেই, তা স্বরূপ কী করে হবে? রূপ থাকলে তো তার স্বরূপ হবে।

—তত্ত্বত?

মহারাজ : হ্যাঁ, তত্ত্বত। তা, তত্ত্ব কেউ বুঝতে পারে না। কে বুঝবে? তিনি ছাড়া আর একজন কেউ থাকলে তবে তাঁর তত্ত্বকে বুঝবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন—যার শেষজন্ম, সে এখানে আসবে। যে ঈশ্বরকে একবার ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবে। কথাটা একটু বুঝিয়ে দিন।

মহারাজ : এ তো বিশ্বাসের কথা—যুক্তির কথা নয়। 'এখানে' মানে ঠাকুরের কাছে শুধু নয়—ঠাকুরের ভাব নিতে হবে। ঠাকুরের ভাব না নিলে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ঠাকুর এই বলছেন। এই কথাটায় বিশ্বাস করে নিলে আর কোন হাঙ্গাম নেই। কিন্তু যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত হবে না কিছু।

—আরেক জায়গায় আছে মহারাজ, ঠাকুর বলছেন—যারা এখানকার তাদের এখানে আসতেই হবে।

মহারাজ : তা তো বটেই। এখানকার মানে, এ-ভাব নিয়ে যারা এসেছে অর্থাৎ ঠাকুরের ভাবের মানুষ—চিহ্নিত। কিন্তু যাদের শেষজন্ম, তাদের এখানে আসতেই হবে মানে এই ভাব নিতেই হবে। এই হচ্ছে বর্তমান যুগধর্ম, এই ধর্মকে গ্রহণ করতেই হবে। এই আদর্শকে নিতেই হবে।

—তারা কি গৃহী নাকি সন্ন্যাসী হয়ে আসবে?

মহারাজ : গৃহীও আসবে, সন্ন্যাসীও আসবে। ঠাকুরের ভক্ত যারা তারা কেবল সন্ন্যাসীও নয়, গৃহীও নয়।

প্রশ্ন : আচ্ছা মহারাজ, মা যে বলছেন—নিজের দোষ দেখবে আর স্বামীজী বলছেন—নিজেকে সর্বদা শক্তিমান ভাববে, দীনহীন ভাববে না; এই কথা-দুটোর মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে?

মহারাজ : তা, স্বামীজী কি বলছেন, ভাববে তোমার কোন দোষ নেই? ভাল করে বিচার কর।

—না, তা বলছেন না।

মহারাজ : তিনি বলছেন, তোমার ভিতরে সমস্ত শক্তি আছে। তুমি ইচ্ছা করলে সেই শক্তি ব্যবহার করে নিজেকে পূর্ণ করতে পার। এই তো স্বামীজীর কথা।

—একটা চিরাচরিত কথা শুনে আসছি যে, ভক্তেরা ভাববে—আমি অধম, আমি অধম।

মহারাজ : চৈতন্যদেবের কথায় আছে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি।"

(শিক্ষাষ্টকম্, শ্লোক-৩)

তুমি নিচু হয়ে থাকবে। মানে বিনয়ী হবে, সহিষ্ণু হবে—নিজেকে অপদার্থ বোধ করা নয়। আসলে অহঙ্কার দূর করতে হবে। স্বামীজী বলছেন : তোমার ভিতরে সমস্ত সম্ভাবনা আছে, সেটি প্রকাশ করতে হবে। আর মায়ের বক্তব্য হল যে, অহঙ্কার করো না। নিজের দোষটা দেখে নিজের অহঙ্কারটা খর্ব কর।

—মহারাজ, ঠাকুরও তো মাঝে মাঝে বলছেন—আমি তোমাদের দাসের দাস, রেণুর রেণু।

মহারাজ : তা তো বলতেন। এ হল দীনতা। আবার বলছেন নিজেকে দেখিয়ে, এর ভিতর সব শক্তি এসেছে।

—এ-দুটো কী করে একই সঙ্গে বোঝা যাবে?

মহারাজ : যার যেরকম প্রয়োজন, তাকে সেরকম বলা হচ্ছে। যে-উপদেশ যার পক্ষে কাজে লাগবে। যেমন নিরঞ্জন মহারাজকে বলছেন : তুই এরকম উগ্র হবি কেন? নৌকাটা ডুবিয়ে দিবি? নৌকায় যত লোক আছে, তাদের সবাই কি দোষী? আবার যোগীন মহারাজকে বলছেন : এত নিচু হয়ে থাকবি কেন? গুরুনিন্দা শুনেও কোন প্রতিবাদ করবি না?

—নিজের ক্ষেত্রে কি এইভাবে বোঝা যায়—আমার পক্ষে কোন্‌টা প্রয়োজন?

মহারাজ : যখন যাকে উপদেশ দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে বোঝা যায়। এই তো স্বামীজী বলছেন, ঠাকুর বলেছেন বিচার করতে। তোমরা বলবে, বিচার কি করা যায়? তা করা যদি না যায় তো তাঁরা করতে বলছেন কেন? নিশ্চয়ই করা যায়।

—নিরঞ্জন মহারাজের মধ্যে উগ্র ভাব ছিল, তাঁকে তাঁর বিপরীতটা করতে বলছেন। আবার দীন-হীন ভাব ছিল যোগীন মহারাজের। তাঁকে উলটোটা

বললেন। আসলে, আমাদের স্বভাবটা তো মিশ্র ধরনের। কখন যে কিসের প্রাবল্য থাকে, বোঝা যায় না।

মহারাজ : সেজন্য প্রবল লোকের কাছে নিচু হয়ে থাকবে, যেখানে দুর্বল পাবে সেখানে চেপে ধরবে! (সকলের হাসি)

—এই কি হল সিদ্ধান্ত?

মহারাজ : সিদ্ধান্ত না হলেও অপসিদ্ধান্ত তো হল! (সকলের হাসি)

—মহারাজ, ঠাকুর বলে দিচ্ছেন, যার যা দরকার সেটি। কিন্তু আমাদের হচ্ছে মুশকিল। আমরা কোন্‌টা করব?

মহারাজ : এজন্যই তো বিচার করতে বলছেন।

—কিন্তু তিনি যে মাস্টারমশায়কে বলছেন—বিচার করবে না!

মহারাজ : এও তো বলেছেন, আমি যা বলব—তাই মেনে নিবি না। বিচার করে যাচিয়ে বাজিয়ে নিবি। মাস্টারমশায়কে বলছেন—বল, আর বিচার করবে না। তিন সত্য করিয়ে নিচ্ছেন। আসলে মাস্টারমশায় একটু দুর্বল প্রকৃতির তো, চেপে ধরেছেন তাই। (সকলের হাসি)

—রামবাবু বলছেন, তর্কটর্ক থাক। তখন ঠাকুর বকে দিচ্ছেন, ওকি কথা? ওগুলোরও দরকার আছে।

মহারাজ : তাই তো। স্বামীজীকে লাগিয়ে দিয়েছেন। সাধন করতে করতে ক্রমে সব বুঝবে। তিনি ভিতরে থেকে তোমাদের সৎ বুদ্ধি দেবেন। এইজন্য তিনি গুরু। আসল কথা—সচ্চিদানন্দ যিনি, শুদ্ধ মনও তিনি। কাজেই তাঁর থেকেই সমস্ত নির্দেশ পাওয়া যায়।

—মানুষ-গুরু তাহলে কী, মহারাজ?

মহারাজ : মানুষ-গুরু হচ্ছেন সেই সচ্চিদানন্দ গুরুর বাহ্য প্রতিমা। মানুষ-গুরুকে আমরা কাছে পাই, সচ্চিদানন্দ গুরুকে দেখতে পাই না। কাজেই এই সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই না। মানুষ-গুরু হলে তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি আছেন কিনা।

—কিন্তু মানুষ বলে যে তাঁকে ধারণা হয়—সেটা তো ঠিক নয়!

মহারাজ : মানুষ হলেও তিনি আমাকে পথ দেখাতে পারেন। এটা তো মনে হয়? তার জন্য তাঁকে সাহায্যকারী বলে মনে হয়।

—মানুষ-গুরুর মধ্য দিয়ে সচ্চিদানন্দ আমাকে উপদেশ করছেন বা নির্দেশ করছেন, না কি আমার মধ্যে তিনি রয়েছেন মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, তোমার মধ্যেই তিনি রয়েছেন।

—কিন্তু মানুষ-গুরুর মধ্যেই তো সচ্চিদানন্দ প্রকাশিত।

মহারাজ : তা আছেন। কিন্তু তাঁকে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ না। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেতে হলে প্রথমে নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হয়। সচ্চিদানন্দ গুরু ভিতরে আছেন। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারছি না। সেজন্য বাহ্য গুরু দরকার—একজনকে ধরে এক পা এক পা করে এগনো যায়। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। সচ্চিদানন্দ যিনি, শেষপর্যন্ত শুদ্ধ মনও তিনি।

॥ ৪৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর একজায়গায় বলছেন, ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে স্থির হয়ে থাকে। ভক্ত স্থির হয়ে থাকে বলতে ঠাকুর কী বোঝাচ্ছেন?

মহারাজ : স্থির হয়ে থাকে মানে—তাতে নিষ্ঠা করে থাকে, অচঞ্চল হয়ে থাকে।

—আরেকটি বলছেন যে, ভক্তের ধারণাশক্তি হয়।

মহারাজ : তত্ত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া—নিঃসন্দেহ হওয়া। এই হল ধারণা। Understanding যাকে বল—তাও হতে পারে। শুধু শুনলে হবে না, ধারণা করা চাই। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। শুনতে হবে, সেসম্বন্ধে মনন-বিচার করতে হবে এবং তার পরে বিচারের দ্বারা যে-সিদ্ধান্ত হল, তাতে দৃঢ় হয়ে থাকতে হবে।

—ধারণা বলতে এখানে তিনটের মধ্যে কোন একটা, না তিনটেই?

মহারাজ : ধারণা মানেই নিঃসন্দেহ হওয়া।

—তা নিদিধ্যাসনের পরেই নিঃসন্দেহ হবে, সেটা বলছেন? নাকি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—

মহারাজ : হ্যাঁ। শ্রবণ, তারপরে মনন, তারপরে ধারণা।

প্রশ্ন : মহারাজ, শাস্ত্রে গুরুসেবার কথা খুব বলা আছে। তা আমাদের সংঘ এখন এত বড় হয়েছে যে, আমরা সকলে গুরুকে কাছে পাচ্ছি না সবসময়।

মহারাজ : ভিতরের গুরুকে তো পাবে।

—তাঁকে কিভাবে সেবা করা যাবে?

মহারাজ : সেবা করা যায় তাঁর নির্দেশ নিখুঁতভাবে পালন করে—তাঁর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে। এই হল ঠিক ঠিক সেবা।

—এগুলো গুরুসেবার মধ্যে পড়বে?

মহারাজ : নিশ্চয়। গুরুর পা টিপে একেবারে ভেঙে দিলাম—তা করলে হবে না। (সকলের হাসি) সবরকমই হয়। বাহ্য সেবাও হয়, আন্তর সেবাও হয়।

—সংঘের যে-কাজ আমরা করি, সেটা সংঘের সেবা। সেগুলো কি গুরুসেবার মধ্যে পড়বে?

মহারাজ : সব গোলমাল করে ফেলছ তুমি। গুরুসেবা থেকে এলে সংঘের সেবায়!

—না, জিজ্ঞাসা করছি। আমরা যারা গুরুসেবা করতে পারছি না—গুরুর কাছে থেকে তাঁর সেবার সুযোগ পাচ্ছি না, তারা সংঘের কাজ বা সেবা করলে সেটা কি গুরুসেবার মধ্যে পড়বে?

মহারাজ : গৌণভাবে পড়বে।

—কিভাবে মহারাজ?

মহারাজ : গুরু আর ইষ্ট এক। সংঘ আর ইষ্ট এক। কাজেই এই হিসাবে গুরু ও ইষ্ট, গুরু ও সংঘ এক হয়ে যাচ্ছে। এমনটা বলতে পার। গৌণভাবে হবে। গুরুর নির্দেশকে শ্রদ্ধা সহকারে পালন করা—এটা গুরুসেবা হবে।

—আসলে বাহ্যভাবে কিছু সেবা না করলে ঠিক মন ভরে না আর কী!

মহারাজ : তা তো বটেই। শরৎ মহারাজ থাকতেন উদ্বোধনে। এখানে (মঠ) মাঝে মাঝে আসতেন। যখন আসতেন তখন তাঁকে সবাই সেবা করার জন্য ব্যস্ত হতো। তা তাঁকে সেবা করার সুযোগ ওদের সঙ্গে আমার হতো না। তিনি যখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করতেন, সেইসময় হতো। অনেকক্ষণ ম্যাসাজ করছি, শেষে বলছেন : আর তো পারি না রে বাবা! (সকলের হাসি) এবার ঠেলা বুঝেছ তো সেবার?

—যাহোক, সামান্য হলেও তো করেছেন মহারাজের সেবা।

মহারাজ : ঐটুকুই।

—একবার নাকি শঙ্করানন্দ মহারাজ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন : সেবক তো নয়, উৎপাত।

মহারাজ : তা বলতেন। তাঁকে যারা সেবা করত তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। কাজেই উৎপাত ওঁরও যেমন, আর যারা সেবক তাদেরও ভয়। (সকলের হাসি)

—মহাপুরুষ মহারাজের অনেক সেবা করেছেন, মহারাজ?

মহারাজ : ওকে কি আর সেবা বলে? তবে এক হিসাবে বলতে পার। হাত-পা টিপেছি। ঘর মুছেছি। ওষুধ আনতে গেছি, ডাক্তার আনতে গেছি। এগুলোকে সেবা যদি বল, বলতে পার। তবে আমি সেবা করেছি ভাবলে তো গর্ব করা হবে। গর্ব নয়, সৌভাগ্য। উমেশ মহারাজ তাঁর সেবক ছিলেন, তা চলেই গেলেন।

— কেন, মহারাজ?

মহারাজ : নিজের খেয়াল হল, চলে গেলেন।

—মহারাজ, শরৎ মহারাজ যখন উদ্বোধনে ছিলেন, আপনি গিয়ে ওরকম সেবা করেছেন কখনো?

মহারাজ : না। ওরকম অবকাশ পাওয়া যেত না। তিনি এমনিতে খুব বেশি সেবা নিতেন না। সুযোগ পাওয়া যেত না। ঐ মঠে এলে খাওয়া-

দাওয়ার পর। মঠে আসতেন মিটিং করতে। ব্যস্ত থাকতেন। কাজেই যখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করতেন, সেইসময় গিয়ে ধরতাম।

—উনি এলে কোন্ ঘরে থাকতেন?

মহারাজ : ঐ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের কোণে।

—মহাপুরুষ মহারাজের যে-ঘর তার পাশে?

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজের না, স্বামীজীর ঘরের পাশে। মহাপুরুষ মহারাজের ঘর তো এখন অফিসঘরের ওপরে। আর তাছাড়া ঘর এমন যে, বাথরুম করতে হলে সেই ছাদ ডিঙিয়ে যেতে হতো—খুব অসুবিধা।

—হরি মহারাজ সেবকদের বলতেন, তোরা আমার শরীরটার সেবা করিস, আমি তোদের মনের সেবা করি।

মহারাজ : কিন্তু সে-সেবার ঠেলা সামলানো কঠিন। ভয়ে সব সন্ত্রস্ত! রাগলেই পালিয়ে যেত। মঠের ম্যানেজার ছিলেন প্রিয়দা মহারাজ। ওঠা-বসার সময় তাঁর হাড় মটমট করত।

—শব্দ হতো?

মহারাজ : হ্যাঁ। একদিন হরি মহারাজ এমন ধমক দিলেন—সব শব্দ সেরে গেল। (সকলের হাসি)

—আপনিও এক-একবার ওরকম দিলে ভাল হয়। আমাদের অনেক কিছু সেরে যাবে।

মহারাজ : বাবা, বুড়ো মানুষ আমি। আমাকে ধাক্কা দিলে পড়ে যাব। আমি ধমক দিতে যাব? (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : স্বামীজী বলছেন বেদ পড়তে। কারণ, বেদ পড়লে কুসংস্কারগুলো যাবে।

মহারাজ : বেদ সম্বন্ধে কুসংস্কারগুলো।

—বেদ সম্বন্ধে কুসংস্কারগুলো? এর মানে?

মহারাজ : 'বেদ বেদ' আমরা বলি, কী আছে না আছে আমরা জানি না। শুদ্ধানন্দ স্বামীকে একজন বলছে—'বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত ঘুরে মরে অন্ধকারে।' শুদ্ধানন্দজী বললেন : তা বেদ-বেদান্তে কী আছে তাই

জানে না। বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত—বলে দিলে। আবার গীতাতে ভগবান বলেছেন :

"ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।" (১৮।৬৭)

—কেন একথা বলছেন? সকলে কি ভগবানের কথা শুনতে পাবে না?

মহারাজ : তাতে কাজ হবে না। উপকার হবে না। তারা উলটে কদর্থ করবে। বাইবেলে আছে—Do not cast pearls before swine—বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো চলবে না। ছড়ালে তাতে কাজ হবে না কিছু।

—কিন্তু, তাহলে তারা জানবে কী করে? তাদের কাছে পৌঁছাবে না তো।

মহারাজ : যারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন নয়, তাদের কাছে পৌঁছে লাভ তো নেই। তারা তো শ্রদ্ধাবান নয়, তারা তো নেবে না।

—শ্রদ্ধা জন্মানোর জন্যই তো ব্যবস্থা এই সমস্ত।

মহারাজ : শ্রদ্ধা জন্মাবে না। বলা হচ্ছে, শ্রদ্ধা না হলে পড়ার প্রবৃত্তি হবে না। প্রবৃত্তি না হলে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে এবং তারা বলবে—এই তো তোমাদের ভগবানের লীলা।

—কিন্তু স্বামীজী বলছেন, শাস্ত্র সব মঠে, মন্দিরে, বনে লুকানো ছিল; এগুলো সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সকলকেই শোনাতে হবে।

মহারাজ : কিন্তু ভগবান আবার বলছেন, সকলকে শোনানো যাবে না বা উচিত নয়। গীতাতে বলছেন। কাকে শোনানো যাবে না—না, যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন নয়, যে তপশ্চর্যা করেনি, যে শুনতে আগ্রহশীল নয়। তাকে শোনানো যাবে না। সবগুলি দেখে তারপরে তো বলবে। খালি শোনানো নিষেধ করা হয়েছে—একথা নয়। এই standard-এর লোককে শুনিয়ে লাভ নেই। আমাদের কলেজে তখন বাইবেল compulsory ছিল। যিনি পড়াতেন—মাস্টারমশাই, তিনি একেবারে অশ্রদ্ধাশীল। বাইবেলের ওপর একটুও শ্রদ্ধা নেই। আর ঠাকুরের কৃপায় আমাদের বাইবেলের ওপরেও শ্রদ্ধা আছে। কাজেই তাঁর ব্যঙ্গ দেখে আমার খারাপ লাগত। এখন বোঝ, এরকম অধিকারীর হাতে পড়লে কী অবস্থা হয়।

—বাঙালি মাস্টারমশাই পড়াতেন?

মহারাজ : বাঙালি তো বটেই।

—কোন সাহেব পড়াতেন না?

মহারাজ : আমাদের ওখানে (সংস্কৃত কলেজ) সাহেব ঢুকতেই পারত না। সাহেব গেলে তো গঙ্গাজল ছড়াতে হতো! (সকলের হাসি)

—হিন্দু কলেজ মানে প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহেব অধ্যাপক ছিল।

মহারাজ : প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল। Principal-ই ছিল সাহেব।

—ওরা তো মহারাজ, বাইবেল হাতে হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মহারাজ : প্রচার করত যারা, তারা হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধ করত। অথচ হিন্দুধর্মের কিছু জানে না। যাদের কাছে বলে, তারাও হিন্দুধর্মের কিছুই জানে না। কিন্তু তারা মনে করে—আমরা তো হিন্দু। ওরা ম্লেচ্ছ।

—গোঁড়ামিটা আবার আছে, আমরা হিন্দু আর ওরা ম্লেচ্ছ!

মহারাজ : খ্রিস্টানরা দ্বারে দ্বারে চলে যায়, ঘরে ঘরে চলে যায়। তবে চলে গেলে তো হবে না, জীবনের ভিতর দিয়ে তো যেতে হবে।

—মিশন থেকে এখন বই দেওয়া হচ্ছে। অনেক বই free দেওয়া হচ্ছে।

মহারাজ : আমাদের যা আয় হচ্ছে তার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে subsidised করা হচ্ছে। তবে subsidised করার সময় লক্ষ রাখতে হয় যাতে ক্ষতি না হয়।

—সম্প্রতি স্বামীজীর ওপরে কয়েকটা বই, ছবি বার করা হয়েছে। সেগুলো খুব কাজে লাগছে।

মহারাজ : না, না, আমাদের একটা principle আছে। ঐরকম বিলি করা নয়। লোকে free বইগুলো নিয়ে ফেলে দেবে। প্রচার হোক, কিন্তু প্রচার করতে গেলে তার পটভূমিকা দরকার। তা না হলে প্রচার হয় না। শুধু বই দিয়ে দিলে প্রচার হয় না। পটভূমিকা দরকার হয়।

—অন্তত, যেখানে বিলি করা হচ্ছে বা অল্প দামে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে একটা meeting ডেকে কিছু বললে কিছু কাজ হবে।

মহারাজ : পাদরিরা বলেও। বলে যে, আমাদের যিশুর কথা জান? একজন কুয়ায় পড়েছিল। তা রাম গেলেন, কিছু করতে পারলেন না। কৃষ্ণ গেলেন, কিছু করতে পারলেন না। যিশু গিয়ে তাকে টেনে তুললেন। (সকলের হাসি)

॥ ৫০ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের একটা প্রশ্ন আছে।

মহারাজ : হ্যাঁ, বল।

প্রশ্ন : এবছরটা তো রিলিফ-এর শতবর্ষ। সারগাছির কাছে মহুলায় প্রথম রিলিফ হয়েছিল ১৫ মে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। তারপর একশো বছর কেটে গেছে। আচ্ছা মহারাজ, এরপর তো কলকাতায় প্লেগ রিলিফ হয়েছিল। আর ইদানীংকালে লাটুরে।

মহারাজ : ফেমিন রিলিফ, কলেরা রিলিফও হয়েছে। এছাড়া বন্যাত্রাণ তো লেগেই আছে।

—মহারাজ, আরেকটা হয়েছিল—মুঙ্গের রিলিফ। অখণ্ডানন্দজী আপনাকে সেখানে যাওয়ার জন্য বলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। তবে সেটা মুঙ্গের নয়, বিহার ভূমিকম্প রিলিফ। মুঙ্গের ছাড়াও রিলিফ হয়েছিল অনেক জায়গায়।

—কলেরা রিলিফ কে করেছিলেন মহারাজ?

মহারাজ : সে তো গঙ্গাধর মহারাজ করেছিলেন।

—পাঞ্জাবে কি রিলিফ হয়েছিল?

মহারাজ : ওখানে প্লেগ রিলিফ হয়েছিল।

—কবে?

মহারাজ : কবে আমাকে জিজ্ঞেস করছ? সকালে কী খাই বিকালেই মনে থাকে না!

—মহারাজ, উদ্বাস্তুত্রাণও তো হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ, উদ্বাস্তুত্রাণও হয়েছিল। দু-জায়গায়—দিল্লিতে ও পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-পাকিস্তান সীমান্তে। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যখন উদ্বাস্তুরা এল, তখন।

আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়—১৯৭১-এ যখন বাংলাদেশ হল তখন আরেকটা রিলিফ হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে বাঙালরা এল। তখন চেক পোস্ট ছিল না। যে যেখান দিয়ে পেরেছে, এসেছে। হাঁটতে হাঁটতে এসেছে। মাথায় একটা করে পুঁটলি। যাকিছু সম্পত্তি সমস্ত ওটাতে রাখা ছিল। দেখতাম, তাদের বগলে একটা মাদুর, আর হাঁটতে হাঁটতে আসছে। দেখে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হয়েছিল। ভাবলাম, বাবা! এত লোক যাবে কোথায়?

—মহারাজ, পাঞ্জাবে যে রিলিফ হয়েছিল, শুনেছি জওহরলাল নেহরুও নাকি রিলিফ করেছিলেন?

মহারাজ : জওহরলাল নেহরু রিলিফ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে রাজেন্দ্রপ্রসাদ করেছিলেন।

—এটা কি দেশভাগের সময়? নাকি, ১৯৪৭-এর পরে?

মহারাজ : ১৯৩৫-এ বিহারের ভূমিকম্পে রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজে রিলিফ করেছিলেন। উনি একটা মিটিং-এ বলেন : আমি নিজেকে ধন্য মনে করি, কারণ আমি ছাত্রাবস্থায় রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে রিলিফ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

—যখন একথা বলেছিলেন, তখন কি উনি ভারতের প্রেসিডেন্ট?

মহারাজ : হ্যাঁ। কথাটা রাজকোটে বলেছিলেন।

—হেডকোয়ার্টার্সে আপনি তো দীর্ঘকাল রিলিফ দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। আপনার সময়ে কী কী রিলিফ হয়েছিল?

মহারাজ : সব কী মনে আছে! সুরাটে হয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম। বোম্বের সম্বুদ্ধানন্দ স্বামী সেটা পরিচালনা করেছিলেন। আর কচ্ছের ভূমিকম্প-ত্রাণে আমি দেখাশোনা করেছিলাম। আমি করেছিলাম বললেই 'আমি'টা এত বড় হয়ে গেল! (মহারাজ হাতদুটো প্রসারিত করে দেখালেন)

—মেদিনীপুরে কী রিলিফ হয়েছিল?

মহারাজ : মেদিনীপুর জেলায় একটা বাঁধে বিরাট খাদ হয়ে গিয়েছিল। এক জায়গায় পাড় ভেঙে গিয়েছিল। আমাদের নৌকোর মধ্যে এক

হাজার মণ চাল যাচ্ছিল। নৌকোটা ভর্তি। খাদ থেকে মাঝে জল যাচ্ছে। যে-জায়গাটা ভেঙে গেছে, সেখান দিয়ে নৌকো পার করতে হবে। কিন্তু মাল-বোঝাই নৌকো পার করা সোজা নাকি! নৌকো খালি করতে হবে। কোনরকমে নৌকো থেকে চাল খালাস করে খাদের ওপারে গিয়ে নৌকো আবার বোঝাই করতে হবে। সাহায্য করার মতো কোন লোক নেই। বাইরের ননী মহারাজ, ভূতেশানন্দ, বিকাশ মহারাজ ও আরো কয়েকজন ছিল। চালের বস্তা নৌকো থেকে পিঠে করে নিয়ে এসে ওপারে নৌকো বোঝাই করা। ভাঙনের ভেতর দিয়ে নৌকো pass করাতে হবে। এটা ১৯২৬-এর কথা।

—মহারাজ, বর্মাতে বড় রিলিফ হয়েছিল?

মহারাজ : বর্মাতে নয়, ডিমাপুরে। বর্মা থেকে উদ্বাস্তুরা এসেছিল।

—তখন রিলিফে কী কী দেওয়া হতো?

মহারাজ : চাল, ডাল, কাপড়। কোন কোন রিলিফে কম্বল। তবে সব ক্ষেত্রে কম্বল দেওয়া সম্ভব হতো না। তখন আমাদের সব জায়গায় কম্বল দেওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। কোথাও কোথাও বাসনপত্র দেওয়া হয়েছিল।

—মহারাজ, এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাইরে মিশন থেকে কোন রিলিফ হয়েছে?

মহারাজ : সেরকম মনে পড়ছে না।

—কেন মহারাজ, এই তো মস্কোয় আমরা রিলিফ করলাম। গর্বাচেভ সরকারের সময়। দুধ, বেবি ফুড পাঠানো হয়েছিল।

মহারাজ : সে তো তোমরা নিজেদের হাতে করনি। জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছ।

—মহারাজ, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা—এসব জায়গায় রিলিফ হয়নি?

মহারাজ : নেপালে হয়েছে কিনা সে তো জানি না। তবে বাংলাদেশে হয়েছে।

—মহারাজ, নেপালে যখন ভূমিকম্প হল, তখন লখনৌ থেকে রিলিফ করা হয়েছিল শুনেছি।

মহারাজ : ও, তাই নাকি? তবে শ্রীলঙ্কায় অনেকবার রিলিফ হয়েছে। এগুলো তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

—ডিমাপুরের রিলিফ দেশবিভাগের আগে হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ। উদ্বাস্তুরা বর্মা থেকে আসছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মণিপুরে বোমা পড়ল। কলকাতায়ও বোমা পড়ল।

—শিলং থেকে আপনাকে রিলিফটা করতে হল?

মহারাজ : সেখানে তখন বাইরের লোকজনদের যেতে দিত না। উত্তেজনা-প্রবণ অঞ্চল কিনা। যুদ্ধের ঘাঁটি ওখানে একটা আছে। ডিমাপুর মানে প্রান্তিক এলাকা। রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার আছে। তারপরে তো ট্রাকে করে যাওয়া। ওখানে কোন ভারতীয়কে যেতে দেবে না। লাটসাহেব ছিল রবার্ট রিড। আমি তখন শিলঙে। তাঁর স্ত্রী আমাকে ফোন করলেন : "মহারাজ, আপনি একবার আসতে পারেন?" গেলাম। একজন সরকারি ডাক্তার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তাঁকে তো আমরা খুব খাতির করি, কিন্তু তিনি সেখানে ঘরে ঢুকতে পারলেন না—বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি ভিতরে গেলাম। লেডি রিড বললেন : "মহারাজ, এ তো বড় সংবেদনশীল এলাকা, কাজেই আমি বাইরের কোন লোককে বলতে পারি না। আপনি যদি রিলিফের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে আমি রাজি আছি।" তা, আমি তো সেসময় সুযোগ খুঁজছিলাম। বললাম : হ্যাঁ, করব। তারপর মঠকে জানালাম কর্মী পাঠাতে। মাধবানন্দ স্বামীর কাছে যাকে যাকে চাইলাম—পাঠালেন। হেম মহারাজকেও পাঠালেন। তারপর লেডি রিডকে বললাম : আমি যদি শিলঙে থাকতে পারি তবে যোগাযোগ করতে সুবিধা হয়। বললেন : "সর্বনাশ! আপনাকে ঐ এলাকাতেই থাকতে হবে। আমরা আর কাউকে বিশ্বাস করি না।"

—আপনি ডিমাপুরে ছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। ক্যাম্প মানে একটা স্কুলবাড়ি—সেটা আমাদের দিয়েছিল। সে এক বিচিত্র রিলিফ। উদ্বাস্তুরা আসছে, তাদের খাওয়ানো, ক্যাম্পে বসানো, কোথায় যাবে তার জন্য রেলওয়ে টিকিট করে দেওয়া—এইসব।

—খরচ কি সব সরকারই দিয়েছিল?

মহারাজ : সরকারেরই দেওয়ার কথা। দিয়েছিল। আমরা অতিরিক্ত কিছু দিয়েছিলাম মাত্র।

—সেসময় চাঁদা আদায় করেছিলেন?

মহারাজ : না, মঠ থেকেই দিয়েছিল। আমরা সেসময় কোথা থেকে চাঁদা আদায় করব? কাপড়, দুধ—এইসব দেওয়া হয়েছিল। কনডেন্সড মিল্কের কৌটা—গোটা গোটা। আরো খুচরো কিছু জিনিস দেওয়া হয়েছিল।

—যারা উদ্বাস্তু ছিল, তারা কি সবাই ভারতীয়?

মহারাজ : বেশির ভাগই। কিছু কিছু বর্মীও ছিল।

—ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালি বেশি, না অন্যান্য রাজ্যের লোকও ছিল?

মহারাজ : না, বাঙালি শুধু নয়, অন্যান্য রাজ্যের লোকও ছিল। পাঞ্জাবি অনেক ছিল। বেশির ভাগ যারা বর্মায় settle করেছিল। পুণ্যানন্দ স্বামী সেসময় আশ্রম বন্ধ করে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন। তবে উনি রিলিফের কাজে ছিলেন না। ঐ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এসেছিলেন।

—আচ্ছা, আপনাদের কিট-ব্যাগে কী কী ছিল?

মহারাজ : রিলিফ-কর্মীদের প্রত্যেককে একটা করে কিট-ব্যাগ—ব্যাগ মানে কাপড়ের ব্যাগ—দেওয়া হয়েছিল। তাতে চিঁড়ে, একটা করে কনডেন্সড মিল্ক, মোমবাতি, দেশলাই আর লাঠি। তাদের বলে দিয়েছিলাম—তোমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তাকে লক্ষ করে হাঁটবে। কারণ, ওদিকে বোমা পড়ছে। আমরা গোলঘাটে গিয়ে দেখা করব। গোলঘাট ডিমাপুর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। ওদের এভাবে পাঠিয়ে দিলাম। আমি থেকে গেলাম। বলেছিলাম—ব্রহ্মচারীরা কেউ থাকবে না। সন্ন্যাসীরা ইচ্ছা করলে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। তাদের ইচ্ছা।

—শেষপর্যন্ত কজন ছিল, মহারাজ?

মহারাজ : পাঁচ-ছজন।

—কদিন চলেছিল?

মহারাজ : তা মনে নেই। তবে দু-তিন মাসের বেশি হবে।

—আপনি যখন বললেন, চলে যেতেও পার তখন কজন চলে গিয়েছিলেন, মহারাজ?

মহারাজ : কেউ যায়নি। একটা লজ্জা আছে তো!

—আন্তরিকতাও ছিল। আর আপনার সঙ্গে কাজ করার একটা আনন্দ আছে। তবে আপনি একদিন বলেছিলেন—আর সহ্য করা যায় না। চারদিকে তখন দুর্গন্ধ!

মহারাজ : হ্যাঁ, যখন বর্ষা এল এক-হাঁটু কাদা, তার ভিতর মানুষের পায়খানা।

—মশাও ছিল খুব?

মহারাজ : মশা-টশার কথা তখন ভাবার সময় ছিল না। এত দুর্গন্ধ, কোথাও থাকা যায় না। যারা ওখান দিয়ে যেত, দূর থেকে নাক বন্ধ করে আমাদের বলত : আপনারা এখানে আছেন কী করে? তা, আমি বলতাম : তোমরা এস। তোমরাও থাকতে পারবে। আসলে আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তবে খাওয়ার সময় চারিদিকে ফিনাইল ছড়িয়ে দিয়ে তারপর খেতাম। ফিনাইলের গন্ধেও খাওয়া যায় না। তা ঐরকম করেই খেতাম। জীবনে অত কষ্ট পরে আর কখনো করিনি।

—পরিষ্কার খাওয়ার জল পাওয়া যেত?

মহারাজ : খাওয়ার জল পুকুর থেকে আনতে হতো। তারপর কলেরা হচ্ছে চারিদিকে। কলেরা রোগীরা আসছে। একদিন দেখলাম, এক কলেরার রোগী রাস্তার ধারে শুয়ে আছে। মুমূর্ষু। তার গায়ে ধবধবে মশারি। বোঝা গেল, বেশ অবস্থাপন্ন। কোন অফিসার হবে। তাকে ক্যাম্পে আনা হল। তখনো 'জল' 'জল' করছে। এক উদ্বাস্তুকে বললাম : জল দাও। তা সে বলল : ওর কাছেই যাব না। বললাম : বটে! তোমাকে এখান থেকে বিদায় করব। তখন আর কী করে, জল দিল। সেই রোগীকে মেন ক্যাম্পে নেওয়া হল। সেসময় বহু লোক মারা গিয়েছিল।

—সে-রোগী বেঁচেছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ, সে বেঁচেছিল। সরকার থেকে ডাক্তার পাঠিয়েছিল। আমরা ওষুধ দিতাম।

—উদ্বাস্তুদের কি রান্না করা খাবার দেওয়া হতো, না শুকনো?

মহারাজ : ক্যান্টিন করে সেখান থেকে খাবার দেওয়া হতো। তারা ক্যান্টিনে যেত। আমরা টিকিট দিতাম। টিকিট দেখিয়ে খেত। ভাত-ডাল দেওয়া হতো, তরকারি কিছু ছিল না। ওরা টিকিটগুলো ওখানে দিত, আর ক্যান্টিনের লোকেরা টিকিটগুলো আমাদের কাছে নিয়ে আসত। আমরা পরীক্ষা করে পাঠিয়ে দিতাম টাকা দেওয়ার জন্য।

—ক্যান্টিন কি আপনারা চালাতেন, না মিলিটারিরা চালাত?

মহারাজ : না, আমরাই চালাতাম। সরকার টাকা দিত।

—দিনে কবার খেতে দেওয়া হতো?

মহারাজ : একবার। ওরা এল, খাবার দেওয়া হল। তারপর টিকিট ইস্যু করে দিলাম। ট্রেনে করে চলে গেল। স্পেশাল ট্রেন সব, খুব কষ্ট ছিল।

—খুব ভাল রিলিফ হয়েছিল মহারাজ। আমরা জানতাম না এসব ঘটনা।

মহারাজ : হ্যাঁ। ভাল রিলিফ হয়েছিল। খুব কষ্টকর অবস্থা ছিল। প্রথম যখন গেলাম—থাকব কোথায়, খাব কোথায় কিছুই ঠিক ছিল না।

—মহারাজ, ওখানে ইলেক্ট্রিসিটি ছিল?

মহারাজ : না, না। আমাদের কিছু হ্যারিকেন ছিল। তারপর যখন অন্ধকারে কাদার মধ্যে আসতে গিয়ে কিছু লোক পড়ে গেল, কিছু লোক মারা গেল—তখন আমরা কয়েকটা পেট্রোম্যাক্স কিনে আনলাম। কিন্তু মিলিটারি কমানড্যান্ট একদিন বললেন : "অত আলো জ্বেলে আপনারা জাপানিদের ডাকছেন?" আমি বললাম : কী করব বলুন, রোগীরা মারা যাচ্ছে। শুনে আর কিছু বললেন না। তখন তো সব ব্ল্যাক-আউট চলছে। তবুও চারিদিকে আলো লাগিয়ে দিলাম।

—সরকার থেকে আপনাদের কোন লোকজন দিয়েছিল?

মহারাজ : লোকজন কিছু নয়। শুধু ওদের ক্যাম্প-কমানড্যান্ট সাহেব ছিল।

—ক্যাম্পে যেসব মানুষ মারা যেত তাদের কী করতেন?

মহারাজ : সে বড় মর্মান্তিক! গর্ত করে তার মধ্যে সকলকে একসঙ্গে কবর দেওয়া হতো। ঐ পরিস্থিতিতে আর কিছু করা সম্ভবও ছিল না।

—এসব কি আমাদের সাধুরাই করতেন?

মহারাজ : না, গভর্নমেন্টের মুর্দাফরাশরা করত। একদিন এক শরণার্থী এল। বাঙালি মেয়ে। তার স্বামী মারা গেছে। সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল : "মহারাজ, স্বামীর মৃতদেহ কবর না দিয়ে যেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়।" আমি বললাম : আচ্ছা, চেষ্টা করব। আমাদের চিফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন এক সাহেব। তাঁর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল শিলঙে। তাঁকে বললাম : দেখুন, এ-লোকটিকে আমরা পোড়ানোর ব্যবস্থা করব। আপনাকে পোড়ানোর অনুমতি দিতে হবে। তিনি বললেন : "খুব কঠিন।" তারপর ভেবে-চিন্তে বললেন : "আপনাকে অনুমতি দেব, তবে বিশেষভাবে। আপনাকে দেখতে হবে যাতে মৃতদেহটি পুরোপুরি পোড়ানো হয়। আধ-পোড়া থাকলে চলবে না।" আমি বললাম : তা আমি দেখব। তারপর মুর্দাফরাশ দিয়ে পোড়ানোর ব্যবস্থা করলাম। বনের মধ্যে তো কাঠের অভাব নেই। সে কী করুণ দৃশ্য! তখনো তার বাবা-মা আসেনি। যে-লোকটি মারা গেছে, তার স্ত্রী আর সে আগে ক্যাম্পে এসেছিল। সেখানেই মারা গেল ম্যালেরিয়াতে। তার পরের দিন বাবা-মা এল। আমি দুশ্চিন্তা করছি, কী করে তাদের face করব? ওমা! দেখি, যেন ওদের কিছুই হয়নি! মানে, এত কষ্ট পেয়েছে যে, ওদের মন পাথর হয়ে গেছে! মানুষের দুঃখ-কষ্ট যা দেখেছি, তাতে অনেকদিন মনে হয়েছে যে, পাগল হয়ে যাব। আর দুর্গন্ধ! যেখানেই যাচ্ছি, সমস্ত গা দুর্গন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই তো অবস্থা। তার ওপর ঐ কাদার মধ্যে দিয়ে রোগীদের নিয়ে আসতে হবে—চলতে পারছে না, ধরে ধরে নিয়ে এসে ক্যাম্পে বসানো হতো।

—মহারাজ, আমাদের মিশনের রিলিফের কথা হচ্ছিল। আরো কিছু ঘটনা শোনার ইচ্ছা হচ্ছে।

মহারাজ : তা বটে। আমরা রিলিফ করলাম আর তোমরা শুধু গল্পই শুনবে! শোন তাহলে—

তখনকার একটা ঘটনা। বর্মা থেকে উদ্বাস্তুরা আসছে। একটা পরিবার, খুব বড়লোক, আমাদের সেবাশ্রমের প্রেসিডেন্ট ছিল। সম্পত্তি evacuate করে চলে আসার ইচ্ছা তাদের ছিল না। কারণ, সমস্ত সম্পত্তি সেখানে—এখানে কিছু নেই। বর্মার গভর্নর তাদের ডেকে বলেছিল : "তোমরা যদি এখান থেকে না যাও, তাহলে তোমাদের security-র ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।" অর্থাৎ পরোক্ষে বলা হল যে, তোমরা চলে যাও। বড়লোকদের ওখানে রাখার ইচ্ছে ছিল না। এসব শুনে শেষ মুহূর্তে ওরা ঠিক করে, evacuate করে চলে যাবে। তাদের অনেক সম্পত্তি ছিল। ট্রাকে করে জিনিসপত্র সব বোঝাই করে তারা রওনা হয়। আসতে আসতে রাস্তায় দেখে একটা ব্রিজ ভাঙা। তখন ট্রাক পড়ে রইল। সেখান থেকে হাঁটতে শুরু করল। এরকমভাবে হাঁটতে তারা কখনো অভ্যস্ত নয়। রাস্তায় ভদ্রলোকের কলেরা হল এবং মারা গেল। তার স্ত্রী একটি বাচ্চা নিয়ে চলতে থাকল। কী করবে! তারপর আমাদের এখানে যখন পৌঁছাল, তখন তাদের অবস্থা দেখে আমাদের চোখে জল এল। এত বড়লোক, অথচ রাস্তার ভিখারির মতো আসছে। তা আমাদের কতগুলি জামা বাচ্চাটিকে দিলাম। তারা তখন বলাবলি করছে—দেখ, আর শীতে কষ্ট হবে না! লোকেরা বলছে : "মহারাজ, এত লোক মারা যাচ্ছে, কোন প্রতিকার কি হয় না?" আমাদের উত্তর দেওয়ার মতো কোন কথা মুখে নেই। কী বলব? এই তো বড়লোকদের কথা, তাহলে গরিব লোকদের কথা তো বুঝতেই পারছ। পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, পকেটে সম্বল নেই। রাস্তায় জলও ছিল না। যেসব জলের উৎস ছিল, সেগুলো ফৌজিরা দেখাশোনা করছিল। কারণ, জলে বিষক্রিয়া হয়ে গেলে সবাই মারা যাবে। কলেরায় মহামারী হয়েছিল। রাস্তার আশপাশের গ্রামে গিয়ে বলত : জল দাও। তারা বলত : টাকা দাও। পকেটে যার টাকা ছিল ঐরকম করে এক গ্লাস জলের দাম ৫/১০টাকা করে দিয়ে জল খেত। যাদের ছিল না তারা না খেয়ে মরেছে। এরকম করে ইম্ফলে এসে পৌঁছায়। গ্রামের মধ্য দিয়ে দুটো রাস্তা করেছিল—ব্ল্যাক রোড আর

হোয়াইট রোড। সাহেবদের জন্য হোয়াইট রোড, আর অন্যদের জন্য ব্ল্যাক রোড। সাহেবদের হোয়াইট রোডে খাবার-দাবার, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ছিল। ব্ল্যাক রোডে কিছু ছিল না। এইরকম অবস্থায় তারা এসে পৌঁছেছিল। আমাদের পুণ্যানন্দ স্বামী হোয়াইট রোড দিয়ে এসেছিলেন। সকলে তাঁকে মানত, খুব প্রভাব ছিল তাঁর।

উদ্বাস্তুরা ক্যাম্পে পৌঁছে বলত : "বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাব। কত দাম দিতে হবে?" আমরা বলতাম : দাম দিতে হবে না। বলত : "আমরা তো রাস্তায় কোথাও এরকম পাইনি!" রাস্তায় কলেরা, ম্যালেরিয়ায় অনেকে মারা গেছে। মানুষজনকে ট্রাকে করে আনত—নামিয়ে দিত। তারা ক্যান্টিনে খেত, আমরা তাদের ট্রেনে করে পাঠিয়ে দিতাম। আমরা টিকিট করে দিতাম, তারা ট্রেনে যেত। এইভাবেই চলত। মানুষগুলো একেবারে নিঃস্ব। পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই। তা আমরা যতটা সম্ভব কাপড়-চোপড় দিতাম, খেতে দিতাম। তারপর মাল বোঝাই করার মতো করে তাদের ট্রেনে উঠিয়ে দেওয়া হতো। কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করলে বলত : "পাতা নেহি।" তারা এদেশে থাকেনি কখনো। কাজেই কোথায় যাবে জানে না। আমরা দেখতাম, birth-place কোন্ জায়গায়। যদি দেখতাম পাঞ্জাব—তখন সেখানকার কোন শহরের টিকিট করে দিতাম।

এখনো মনে পড়ে, একটা ছোট ছেলে—তার বড় বড় চোখ—আমাকে এসে বলল : "আমার মাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা যদি থাকতে দাও, মাকে খুঁজে পাই।" বললাম : থাক। কিন্তু সে তার মাকে পেল না। দু-তিনদিন পরে চলে গেল। এরকম অবস্থা। আমাদের প্রধান কমানড্যান্টকে বললাম, আমাদের যদি ইম্ফলে একটা ক্যাম্প করতে দেওয়া হয়, তাহলে পরিবারগুলোকে এক করে পাঠাতে পারি। কারণ, পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, কঠিন কাজ। কিছু করতে পারলেন না। অত লোক আসছে। তাদের জন্য গর্ত করে পায়খানার ব্যবস্থা ছিল। দুশো সুইপার সব পায়খানা সাফ করত। তারপর প্রশ্ন উঠল—ওদের কে খেতে দেবে? ওরা একদিন বলল, আমরা চললাম। আমি বললাম :

সর্বনাশ! আমি তোমাদের খাবার ব্যবস্থা করব। তাদের খাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তারপর ওখানে থাকতে থাকতে আমার জ্বর হল। আমি গৌহাটিতে এসে কয়েকদিন থাকলাম। তখন দেখি, সেই সুইপারের দল সেখানে চলে এসেছে। আমাকে দেখে বলল : "মহারাজ, আমরা চলে এসেছি। ওখানে বোমা পড়ছে।" তাই ওরা চলে এসেছে। তা কী করব? তখন গায়ে জ্বর নিয়েই আমি ফিরে গেলাম। কিছু লোক জোগাড় করলাম যারা মুর্দাফরাশের কাজ জানে। কিন্তু তাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তারপর বর্ষা নামল। প্রবল বর্ষায় সব কাদা হয়ে গেল। আমরা বড় বড় গর্ত করে রেখেছিলাম বোমা পড়লে বাঁচার জন্য। গর্তগুলো জলে ভরে গেল। ক্যাম্প-কমানড্যান্ট তা দেখে বললেন : "আপনারা কি সুইমিং পুল কাটিয়েছেন?" আমি বললাম : কী করব! তখন তো বৃষ্টি ছিল না, তাই গর্ত করা হয়েছিল। সেই গর্তে এখন জল জমে কাদা হয়ে গেছে। এর কোন প্রতিকার করাও সম্ভব ছিল না। লোক আসছে, চলতে পারছে না। কাদায় পড়ছে, আর পড়ে মারা যাচ্ছে। তা আমরা যতজনকে পারি, হাত ধরে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে আসতাম। ক্যাম্প শুকনো ছিল। যারা খুবই অসুস্থ, তাদের আমরা ওষুধ দিতাম। কিন্তু মুশকিল হল, দেখভাল করার জন্য সরকারি প্রশাসন বলে কিছু ছিল না। সর্বত্র মিলিটারিতে ভর্তি। আমাদের দেখে বলত : "আপনারা জাপানি?" তখন বলতাম : জাপানি হলে কি আপনারা এখানে থাকতে দিতেন? যাহোক, এইভাবে কত লোক মারা গেল। একদিন ১২০০ লোক ট্রাকে করে এল, তার মধ্যে ৯০০ জনই মারা গেল। আসলে তারা মরণাপন্ন হয়েই এসেছিল। এসব দেখেশুনে মনে হতো—পাগল হয়ে যাব। সহ্য করা যেত না। সমস্ত দিন ক্যাম্পের কাজ করে সন্ধ্যার পর আমাদের কোয়ার্টারে গিয়ে বসতাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কোথা থেকে কান্নার শব্দ আসছে। কী বলব! এখনো মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। আর তার সঙ্গে সেই কাদা। আর কী দুর্গন্ধ! এত দুর্গন্ধ যে, মানুষ দূর থেকেও তা সহ্য করতে পারে না।

প্রশ্ন : মহারাজ, ক্যান্টিনে প্রতিদিন কতজন করে লোক খেত?

মহারাজ : অনেক। যত লোক আসত, তাদের তো অন্য কোন খাওয়ার জায়গা নেই—ক্যান্টিনেই খেত। ক্যান্টিন-ওয়ালারা করত কী, আমরা যে-সংখ্যা লিখে দিতাম, ওটাকে tamper করত। আমরা ৮ লিখলে, ক্যান্টিন-এর লোকেরা বাঁদিকে ১ বসিয়ে ১৮ করে জমা দিত। আমি ক্যাম্প-কমানড্যান্ট সাহেবকে বললাম : কী করা যায়? উনি বললেন : নির্দয়ভাবে বাতিল করুন। তা করা হলও একবার। কিন্তু বাতিল করলে ওরা খাবে কী? তারপর আমরা ঐ অঙ্কটি কথায় লিখে দিতাম।

—মহারাজ, এই যে এত লোক এসেছিল, ওদের জন্য সরকার থেকে কিছু করেনি?

মহারাজ : কিচ্ছু না। তবে ক্যান্টিনগুলোকে আমরা লিখে দিলে ওরা টাকা দিত। একটা জায়গায় তো এত লোকের জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই অনেক জায়গাতে ক্যান্টিন ছিল।

—আচ্ছা মহারাজ, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে করেছিল?

মহারাজ : তাদের পুনর্বাসনের খবর তো আমি জানি না। সহজে ব্যবস্থা হয়েছিল বলেও মনে হয় না। আমরা ওখান থেকে পাঠিয়ে দিতাম। তারপর তারা কোথায় যাবে, তারাও জানত না।

—মহারাজ, কত লক্ষ শরণার্থী এইভাবে ওখানে এসেছিল?

মহারাজ : মোট সংখ্যা তো বলতে পারব না। তবে হাজার খানেক লোক প্রত্যেক দিন আসত। তাদের ট্রাকে করে নিয়ে আসত একেবারে ছাগল-গরুর মতো। এনে, আমাদের ক্যাম্পে নামিয়ে দিত।

—এরকম তো কয়েক মাস ধরেই চলেছিল।

মহারাজ : হ্যাঁ। তারপর শোন—আমাদের সাধুরা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে অসুস্থ হতে লাগল। যারা অসুস্থ হচ্ছে, তাদের বললাম চলে যেতে। মঠ থেকেও আর লোক পাঠাতে পারত না। এরকম করে শেষপর্যন্ত আমরা দুজন ওখানে ছিলাম। আমি আর গঙ্গাধর মহারাজ বলে আমাদের এক বন্ধু। আমরাই যতটা পারতাম করতাম।

—এই রিলিফে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে এখন একমাত্র আপনিই আছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। এখনো আমি বেঁচে আছি।

—ঐ গঙ্গাধর মহারাজ কি শেষে কামারপুকুরে ছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। একটা ঘটনা বলি—একদিন একটা বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, আমরা তাকে ক্যাম্পে বসিয়ে কিছু খেতে দিয়েছি। সবাই বলল, সে অনাথ। বললাম : না, ও অনাথ নয়। হারিয়ে গেছে। তারপরে দুপুরের পর বিকেলবেলায় একজন এসে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল। যাহোক, সে তো তার মেয়েকে পেয়েছিল। আরেকজন তার মাকে খুঁজে দিতে বলল। সে আর মাকে খুঁজে পেল না। সেসব স্মৃতি এখনো খুব জ্বলজ্বল করছে।

—মহারাজ, এরপর তো পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। বর্মার এই উদ্বাস্তুদের সাথে পরে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছিল? তাদের মনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছেন?

মহারাজ : না, আর সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি।

—বর্মাতে কি অনেক গুজরাটি ছিল?

মহারাজ : গুজরাটি, পাঞ্জাবি, দক্ষিণী ও আরো অনেক জাতি ছিল, মেলানো মেশানো। সৈনিক ছিল—গোর্খা। তারা বলত : "আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। আমাদের কোন ব্যবস্থা করে দেয়নি। হাঁটতে হাঁটতে এসেছি। হাঁটার জন্য কোন সুবিধা করে দেয়নি।" ঐ যে আগেই বললাম—দুটো রাস্তা ছিল। হোয়াইট রোডে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল। সাহেবরা সেই পথ দিয়ে এসেছিল। আর ব্ল্যাক রোডে কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সাধারণেরা সে-রাস্তা দিয়ে আসে।

—মহারাজ, 'আমি সুভাষ বলছি' বলে একটা বই আছে। তাতে লিখেছে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করে নেতাজীর ফৌজদের মারার জন্য এরকম ব্যবস্থা করেছিল। নেতাজীর ফৌজরা তখন যুদ্ধ করছিল। তাদের জব্দ করার জন্যই নাকি এমন ব্যবস্থা।

মহারাজ : জব্দ করা? এমন কথা তো শুনিনি। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চেয়েছিল, এরা সবাই সেই স্থান ত্যাগ করে চলে আসুক। 'পলিসি' যাকে বলে। যাতে জাপানিরা এসে ওখানে কোন সাহায্য না পায়। বর্মী ছাড়া আর সবাই ও স্থান ছেড়ে এসেছিল। বর্মীদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে ভারতীয়দের যোগাযোগ ছিল, কেউ কেউ ভারতীয়দের বিয়ে করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে চলে এসেছে, আবার কিছু লোক আসেনি।

প্রশ্ন : কচ্ছে রিলিফ হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ, কচ্ছের ভূমিকম্পে রিলিফ হয়েছিল।

—আপনি কি ওটা পরিচালনা করেছিলেন?

মহারাজ : আরম্ভ করেছিলাম, তারপর সম্বুদ্ধানন্দ স্বামী সেটার দায়িত্ব নিলেন।

—কোন্ সময়ে ওটা হয়েছিল, মহারাজ?

মহারাজ : সাল-তারিখ মনে নেই।

—আপনি তখন রাজকোটে ছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, রাজকোটে। ১৯৫০-এর পরে।

—১৯৫৬-এ পাঞ্জাবেও তো ভূমিকম্প রিলিফ হয়েছিল।

মহারাজ : তা হয়েছিল। অনেকদিন চলেওছিল।

—অনেক লোক মারা গিয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কী জান—যারা বেঁচে ছিল, তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত। তাদের বিশ্বাস, যারা বাড়ি চাপা পড়ে মরেছে, তারা নাকি ভূত হয়েছে! সেখান থেকে তারা নাকি বলছে—কাড়ো, কাড়ো। 'কাড়ো' মানে—আমাদের এখান থেকে বের কর।

—দু-একদিনের মধ্যেই আপনারা সেখানে গিয়েছিলেন?

মহারাজ : অল্প কয়েকদিনের ভিতরে গিয়েছিলাম। তখন বাড়ি-ঘর সমস্ত পড়ে রয়েছে। মানুষের খুবই দুরবস্থা।

—গভর্নমেন্ট আর্মি ছিল?

মহারাজ : না।

—তাহলে মানুষজন উদ্ধার করল কারা? বার করা, সৎকার করা?

মহারাজ : সৎকার তাদের করতে হয়নি। বাড়িতে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু বাইরে ছিল। রাস্তার ধারে মাটি খুঁড়ে তাদের সৎকার করা হয়েছিল।

—কী রিলিফ করলেন মহারাজ?

মহারাজ : প্রাথমিক রিলিফ যেমন হয়। তারপরে বাড়ি-ঘর করে দেওয়া।

—শুনেছি, 'রামকৃষ্ণ পল্লি' বলে একটি পল্লি নাকি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল ওখানে? এখনো আছে?

মহারাজ : হ্যাঁ আছে। এছাড়া পুনর্বাসন করার জন্য একটা গ্রাম নেওয়া হয়েছিল। তারা সব গুজরাটি। বলল : নতুন গ্রামে এলেও পুরনো গ্রাম ছাড়ব না। আমরা বললাম : না, তা হবে না। আমরা একটা গ্রাম করে, রাস্তা তৈরি করে তাতে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু হল না।

—ওদের বাড়ি হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ, হয়েছিল। বাড়ির জিনিস দিয়ে সাহায্য করা, বাড়ি করতে সাহায্য করা—এইসব করা হয়েছিল।

—কিরকম বাড়ি মহারাজ?

মহারাজ : ঐ গুজরাটি বাড়ি যেমন হয়। মাটির বাড়ি, ওপরে টিনের চাল। একটা গ্রামে বাড়ি করেছিলাম পাথর দিয়ে।

—পণ্ডিত নেহরু এই বাড়িগুলো উদ্বোধন করতে এসেছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। আমরা একটা অস্থায়ী আস্তানা করেছিলাম। একটা করে ঘর, তাতে একটা করে দরজা-জানালা ছিল। একটা লম্বা ব্যারাক-এর মতো। দেখে তিনি বললেন : "It is not fit for human habitation." আমি বললাম : "It is not meant for that. It's a temporary shelter." তিনি ভেবেছেন, একটা করে প্যালেস করে দেওয়া হবে। তাঁদের তো এবিষয়ে কোন ধারণা ছিল না।

—বাড়ি করার টাকা কোত্থেকে পেলেন?
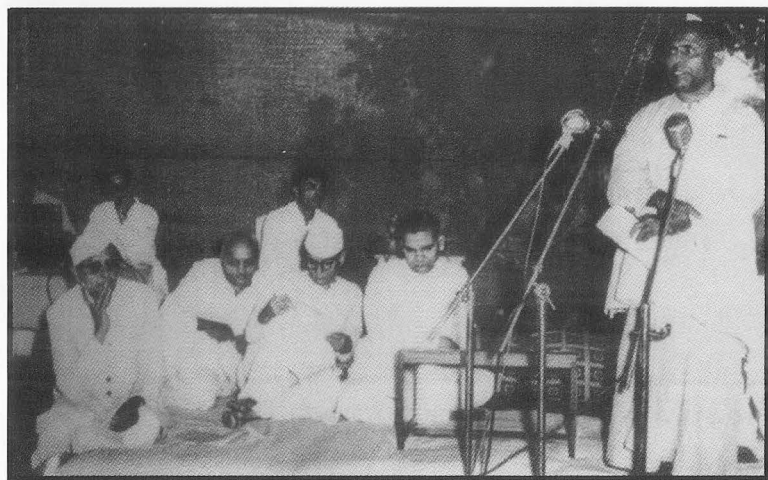
মহারাজ : যেখান থেকে পাই—'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।'

—সরকার থেকে দেয়নি?

মহারাজ : আমরা চাইনি।

—বেলুড় মঠ?

মহারাজ : আরে, বেলুড় মঠে তখন এত অর্থ কোথায়? অন্য কোথাও সাহায্য করার মতো তাদের সামর্থ্যও ছিল না। পরবর্তী সময়ে আমি যখন মঠে রিলিফের কাজ দেখতাম, তখন প্রত্যেক রিলিফে মাত্র ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হতো। তবে সেসময় মাধবানন্দজী মহারাজ আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন।

—লোক পাঠিয়েছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলেন। সে বর্মা রিলিফের সময়। আমি যাকে যাকে চেয়েছিলাম, সবাইকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বেশি লোক নিতে পারিনি। কারণ, ওখানে মিলিটারির নিষেধ ছিল।

—মেদিনীপুরের রিলিফ তো আপনি করেছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। তবে আমাদের মুশকিল কী ছিল জান? এত গাড়ি, আসবাবপত্র—এসব তখন ছিল না। হেঁটে হেঁটে যেতে হতো। কখনো কখনো নিজেদেরই মাল বইতে হতো। মেদিনীপুরে আমাদের কয়েকটি রিলিফ সেন্টারও ছিল, যেমন চণ্ডীপুরে।

—মেদিনীপুরে রিলিফ-এর কথা কিছু বলুন মহারাজ।

মহারাজ : আমাদের রিলিফ-এর প্রথম হাতেখড়ি হল মেদিনীপুরে। কাঁথিতে নয়, চণ্ডীপুরে। তারপর বারবার হয়েছে। মেদিনীপুর আমাদের রিলিফ-এর আঁতুড়ঘর।

—চণ্ডীপুরে কি বন্যাত্রাণ করেছিলেন?

মহারাজ : মেদিনীপুরে বেশি বন্যাত্রাণই হতো। তার আগে বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষত্রাণ হয়েছিল। সুয্যি মহারাজের (স্বামী নির্বাণানন্দ) সেখানেই প্রথম ত্রাণকাজ। তারপর আরায় (পূর্ণিয়ায়) কলেরা রিলিফ। গ্রামবাসীরা

বলত : একটা সাধু দাও বাবা, যাতে গ্রামবাসীরা বেঁচে যায়। আমার যাওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু যাওয়া হয়নি। শুদ্ধানন্দ স্বামী বললেন : "দেখ, আমরা সূচ হয়ে ঢুকি, ফাল হয়ে বেরই। ওখানে গেলে আমাদের খুব চাপ হয়ে যাবে। কারণ, যেখানে রিলিফ করতে যাবে, সেখানেই একটা আশ্রম হয়ে যাবে।" তাই হয়েছেও অনেক জায়গায়।

—রিলিফ করে centre হয়েছে আর কোথায় কোথায়?

মহারাজ : সারগাছিতে হয়েছে, চণ্ডীপুরে হয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া থেকে চণ্ডীপুর centre হয়েছে।

—সেটা কিরকম?

মহারাজ : ভাইদের মধ্যে একজন সাধু হয়েছিল। তার ভাইরা বিরক্ত ছিল। কারণ, তার ইচ্ছা—তার ভাগের অংশটা মঠের নামে লিখে দেওয়া হোক। অন্য ভাইরা তার বিরোধিতা করল। কারণ, তাতে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে যাবে। এরপর যখন আশ্রম হল, তারা মামলা জুড়ে দিল। তারা বলত : "আমরা শরৎ মহারাজকে কোর্টে দাঁড় করাব, তারপর থামব।" তা পারেনি।

—কাঁথিতে আপনি রিলিফ করেছিলেন?

মহারাজ : দুর্ভিক্ষত্রাণ। তখন যিনি মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ভক্ত লোক। তাঁকে সুদ্ধ আমাদের ঘেরাও করেছিল সেখানকার লোকেরা। আর দলে দলে লোক আসছে। একদল বলছে : মাথাপিছু দু-কেজি—; আরেক দল বলছে : দিতে হবে, দিতে হবে। তারপর দলের লোকেরা মন্ত্রীকে বলল : স্যার, আপনি কিছু বলে দিন, তাহলে এরা চলে যায়। উনি বললেন : "আমি বলব না। তাদের লিডারের সাথে কথা তো হয়ে গেছে। আবার কী বলব?" তারা আবার বলছে : "দিতে হবে, দিতে হবে।"

—মন্ত্রী কে ছিলেন?

মহারাজ : নামটা এখন ভুলে গেছি। পূর্ববঙ্গে আমাদের দাঙ্গা রিলিফ হয়েছিল। সেখানেও কর্মীদের ঘেরাও করে রেখেছিল। তারপর খবর পেয়ে পুলিসের সাহায্যে তাদের উদ্ধার করা হয়। কত রকমের রিলিফ যে হয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না।

—দু-একটা বলুন না মহারাজ।

মহারাজ : যেমন, লাহোরে প্লেগ রিলিফ। শরৎ মহারাজ তখন সেক্রেটারি। বললেন : "দেখো বাপু, প্লেগ রিলিফ হল বিপজ্জনক। আমি তোমাদের সেখানে যেতেও বলব না; আবার যেও না, সেটাও বলব না। শুভ কাজ। তোমরা যেতে চাও যাও।" তা গেল আমাদের কয়েকজন।

—তখন নাকি প্রসাদের পঙ্‌ক্তিতে জিজ্ঞাসা করা হতো—কারা রিলিফে যেতে চাও?

মহারাজ : কারা যাবে—এরকম জিজ্ঞাসা সাধারণত করা হতো না। তাদের পাঠানো হতো। কলেরা রিলিফের সময় বলা হয়েছিল, কারা স্বেচ্ছায় যেতে চাও? কলেরা অনেক জায়গায় হয়েছিল। আমি যখন ঢাকায় তখন পূর্ববঙ্গের কোন এক জায়গায় হয়েছিল। কোথায় হয়েছিল এখন ভুলে গেছি। গোপেশ মহারাজও (স্বামী সারদেশানন্দ) গিয়েছিলেন। আর ঢাকা ইউনিভার্সিটির provost ছিলেন রমেশ মজুমদার। তিনি বলেছিলেন : কয়েকটি ছেলেকে দিতে পারি। খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তাদের অভিভাবকরা আমাকে কী বলবে, জানি না। যাই হোক, কয়েকটি ছেলেকে তিনি পাঠিয়েও ছিলেন। আমরা আগে তাদের কলেরার টিকা নিয়ে আসতে বললাম। তবে বাইরের ছেলেরা আমাদের সঙ্গে তাল দিয়ে পারে না। অত কষ্ট করা তাদের অভ্যাস নেই। না থাকে খাবার ব্যবস্থা, না থাকে থাকার ব্যবস্থা। এইরকম সব জায়গায় রিলিফ হতো।

—প্লেগ বা কলেরা রিলিফ করতে গিয়ে আমাদের কোন সাধু আক্রান্ত হয়েছে, এমন কোন ঘটনা ঘটেছে নাকি?

মহারাজ : না, সেরকম হয়নি। সাধুদের অত সহজে ধরতে পারে না!

—বাংলাদেশে আর কোন রিলিফ আপনি করেছিলেন?

মহারাজ : না, আমি থাকতে আর হয়নি। ঢাকায় আমি তো অল্পদিন ছিলাম। কলেরা রিলিফ হয়েছিল। সেই জায়গায় আমি যাইনি। আমি ব্যবস্থা করেছিলাম।

—নোয়াখালির দুর্ভিক্ষত্রাণ কি গোপেশ মহারাজ করেছিলেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। এছাড়া তিনি ঢাকায় কলেরা রিলিফেও ছিলেন। রিলিফের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টদায়ক ছিল ডিমাপুরের (বর্মার) রিলিফ। তারপর বাংলাদেশের উদ্বাস্তু-ত্রাণ। হাসনাবাদ, টাকি, বসিরহাট—ঐসব অঞ্চলে সেটা করেছিলাম। সেখানে দেখি সকলের মাথায় একটি করে পুঁটলি, বগলে মাদুর। এই নিয়ে সব দল বেঁধে আসছে। দেখে আতঙ্ক হল। এত লোক সব যাবে কোথায়! যে যেখানে পারল ঢুকে পড়ল। লোকের বাড়ি, বারান্দায় শুয়ে পড়ল। একটা আমবাগান ছিল। সেখানে অনেকে ঢুকল। আমরা কয়েকটি ত্রাণকেন্দ্র করেছিলাম। আমার সঙ্গো ছিল বিমান (মহারাজ)। উদ্বাস্তুদের সঙ্গো বসে বসে সেও কাঁদে, উদ্বাস্তুরাও কাঁদে। এত কাঁদলে রিলিফ হবে কী করে?

—কোথায় ক্যাম্প হয়েছিল?

মহারাজ : বসিরহাটে। ওখানকার এক আমবাগানে। এরকম কয়েকটা জায়গায় হয়েছিল।

—কী জিনিস দেওয়া হয়েছিল?

মহারাজ : নানারকম জিনিস। খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় এইসব।

—থালা-বাসন?

মহারাজ : হ্যাঁ, থালা-বাসনও দেওয়া হয়েছিল।

—সেখান থেকে দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থাও কি আমাদের মিশন করেছিল?

মহারাজ : না, না, আমরা করিনি, গভর্নমেন্ট করেছিল। আমরা শুধু কয়েকটি জায়গায় ক্যাম্প করেছিলাম। ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন এই রিলিফ দেখতে। আমি ভাবলাম, তাঁর সঙ্গো থাকা দরকার। কিন্তু কংগ্রেসিরা তাঁকে এমন ঘিরে রাখল যে, কাছে যাওয়ার উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ থেকে চলে এলাম।

—অনেকদিন ধরে রিলিফ হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—লক্ষ লক্ষ লোক এসেছিল?

মহারাজ : দেখে ভয় হতো। এত লোক যাবে কোথায়? যেখানে যত ফাঁকা জায়গা ছিল সেখানে ওরা ঢুকে গেছে। শুধু ফাঁকা জায়গায় নয়, যেখানে যত পেরেছে ঢুকেছে।

—আমরাও দেখেছি। আমাদের স্কুলে যে-মাঠ ছিল, বিরাট ফুটবল মাঠ—ওটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অনেক মাচা বানানো হয়েছিল। ত্রিপল টাঙানো হয়েছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও গভর্নমেন্টের লোকেরা এসেছিল। চার-পাঁচ মাস ধরে রিলিফ চলেছিল। কাদা-জল-বৃষ্টির সময়ও ওরা ওখানে ছিল। আচ্ছা, গাইঘাটাতে কি রিলিফ হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল, সেসময়ও নাকি রিলিফ হয়েছিল?

মহারাজ : সে-দৃশ্য দেখে আতঙ্ক হতো। রোগা রোগা সব লোক, মাথায় পুঁটলি, বগলে মাদুর বা চাটাই—এই নিয়ে আসছে। সহায়-সম্বল নেই। জঙ্গল দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে এসেছে।

—কেন, ভাল রাস্তা দিয়ে আসতে দেয়নি?

মহারাজ : রাস্তাই ছিল না, তা আর ভাল রাস্তা! পথ একটা ছিল হাসনাবাদ দিয়ে।

—আপনি তখন ক্যাম্পে ছিলেন?

মহারাজ : না, কাছাকাছি গিয়ে থাকতাম। উদ্বাস্তুরা যেখানে খুশি সেখানে নোংরা করত। যেখানে খুশি শুয়ে পড়ত। এছাড়া, গাইঘাটাতে ঘূর্ণিঝড় রিলিফ হয়েছে। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় করিমগঞ্জে রিলিফ হয়েছিল। সত্যেন মহারাজ (স্বামী সত্তানন্দ) ইনচার্জ ছিলেন। ট্রেনিং সেন্টার থেকে ব্রহ্মচারীরা গিয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার! ঐ যে লোকগুলো আসত তারা খুব দুর্বল। লড়াই করার মতো শক্তি ছিল না, মনোবলও ছিল না।

—লড়াই করার শক্তি থাকলে ওরা তো পালিয়ে আসত না। এত লোক!

মহারাজ : হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিক।

—তারা সবাই মিলে যদি বুখে দাঁড়াত, কাউকেই আসতে হতো না। যারা এসেছে তাদের খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা দেখে ৮০% মুসলিম-প্রভাবিত মনে হতো।

মহারাজ : চারিদিকে এত রিলিফ হচ্ছে, আর কত করা যায়? রিলিফ আর রিলিফ। এমন অবস্থায় তারা আসে যে, তাদের আর রিলিফ করা যায় না। নামেতেই রিলিফ। এই চাল-ডাল দেওয়া—এটুকুই।

—এরই মধ্যে একটা অংশ, যারা দণ্ডকারণ্যে গেছে, তারা জমিজমা ইত্যাদি নিয়ে বেশ অবস্থাপন্ন হয়েছে।

মহারাজ : দণ্ডকারণ্যের কথা আর বলো না। পামানজোড়ে আমি অনেকবার গিয়েছিলাম। সেখানে যারা বাসা বেঁধে ছিল, কিছুদিন পর তাদের কাছে একদল লোক এসে বলল : তোমরা এখানে কী করছ? আমাদের সঙ্গে চলে এস। সুন্দরবনের ওখানে তোমাদের ব্যবস্থা করে দেব। গরু ও টিন গভর্নমেন্ট দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ওগুলো বিক্রি করে চলে গেল। গিয়ে দেখে জায়গা-জমি কিছুই নেই, যারা বলেছিল তাদেরও দেখা নেই! তখন তারা বলল : কোথায় যাব? গভর্নমেন্ট জানাল : আমরা দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা থাকলে না, চলে গেলে। আমরা আবার কোথা থেকে দেব? তারা বলল : এখন আমাদের উপায় কী? যাই হোক গভর্নমেন্ট তারপর আবার কিছু কিছু দিল তাদের।

॥ ৫১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনাদের সময় মঠের সবরকম কাজ তো সাধু-ব্রহ্মচারীরাই করতেন, তাই না?

মহারাজ : আমরা প্রথম থেকে শুনে আসছি, ঠাকুরের অন্ন বসে বসে খেতে নেই। কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। অনেকেই তো মনে হয় কাজ কিছু করে না। এ তো মুশকিল! যে যতটুকু পারবে করবে—এরকমই জানি। আমাদের কেষ্টলাল মহারাজ বুড়োবয়সে কুটনো কুটতেন। এখন কুটনো কোটে কাজের লোকে। সাধুরা তবে কী করে?

—কিছুটা সাধুরাও করেন, মহারাজ।

মহারাজ : ও, কিছুটা করে!

—ব্রহ্মচারীরাও করে।

মহারাজ : কিছুটা করলেই হল। যার যতটুকু সামর্থ্য সে ততটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট। আমি বলছি না, তাকে প্রাণপাত করতে হবে—কিছু না কিছু করা দরকার। এই যে আমার মতো বসে বসে খাওয়া—এ ঠিক নয়! (হাসি)

প্রশ্ন : তোতাপুরী ছিলেন বেদান্তবাদী সাধু। তা তিনি আবার সেই অগ্নি, ধুনি—এইসব জ্বালাতেন। অগ্নির সেবা করতেন। সেটি কিরকম করে হয়, মহারাজ?

মহারাজ : নাগা তো। নাগারা অগ্নির সেবা করে।

—নাগা, সন্ন্যাসী তো? দশনামী সাধু তো?

মহারাজ : নাগা হলেও দশনামীর ভিতরে। তারা অগ্নির সেবা করে। আমি তখন মন্দিরে পুজো করি। একটি সাধু ক্ষণে ক্ষণে বলে : অগ্নি মাতা হ্যায়, অগ্নি পিতা হ্যায়। কমবয়সি নাগা। মাথায় জটা। আমি ভাবলাম, এ হয়তো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হবে। কারণ কথামৃতে পড়েছি, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা উন্মাদবৎ হন—পাগলের মতো দেখতে কিন্তু পাগল নয়। আমি তার পিছনে যেতাম।

—গিয়ে কী দেখলেন, মহারাজ?

মহারাজ : এখন মনে হয়, সে পাগল।

—মহারাজ, নাগা সম্প্রদায়ের শুরু হল কী করে? মধুসূদন সরস্বতী কি শুরু করেছিলেন?

মহারাজ : না, মধুসূদন নন। আকবরের সময়ের কথা।

—হ্যাঁ, আকবরের সময়ে। মধুসূদন নাকি এটার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

মহারাজ : কিছু ধর্মপ্রাণ হিন্দু-ব্রাহ্মণ আকবরের কাছে নালিশ করল যে, তাদের মন্দিরে মৌলবিরা বড় উৎপাত করছে। আকবর বললেন : দেখ, আমরা তো মৌলবিদের কিছু বলতে পারি না। তোমরা এক কাজ কর

না। ঐরকম একটা সম্প্রদায় তৈরি কর। করলে তারা তোমাদের রক্ষা করবে। তখন এই নাগা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল।

—মহারাজ, নাগাদের মধ্যেও নাকি অব্রাহ্মণরা সাধু হতে পারে না।

মহারাজ : অব্রাহ্মণরা খালি দণ্ডী হতে পারে না। সাধুশ্রেষ্ঠ, পরমহংস—সে তো অব্রাহ্মণও হতে পারে।

—মহারাজ, শুনেছি পরমহংস যিনি হবেন, তিনি নাকি ঐ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের মধ্যেই হবেন। শূদ্রকে কি তারা সন্ন্যাস দেবে?

মহারাজ : শূদ্রদের তো আগে আশ্রমী বলেই ধরা হতো না। ত্রৈবর্ণী যারা তারাই আশ্রমভুক্ত হতো। শূদ্রদের অচ্ছুতের ভিতর রাখত। এখন মুশকিল হয়েছে, বৃহদারণ্যকে তো তোমরা পড়েছ—'অরে ত্বাশূদ্র।' 'শূদ্র' বলে সম্বোধন করেছেন রাজাকে! তাহলে এ কিরকম হল? রাজা শূদ্র হবে কেন? আসলে, ওখানে শূদ্র মানে জাতি শূদ্র নয়, "শুচাগ্র বৃত্তি ইতি শূদ্র।" মানে, যে হিংসা করছে তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে শূদ্র বলে।

—আচার্য শঙ্করের 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ'—এরকম একটা খুব গর্বের ব্যাপার ছিল।

মহারাজ : ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম তো! হয়তো সেইজন্যই।

—কিন্তু সন্ন্যাস নিলেন, এত সব প্রচার করলেন, আত্মজ্ঞানের কথা বললেন, তাতেও কি সেই সংস্কার যায়নি?

মহারাজ : আত্মার কথা যেখানে বললেন, সেখানে আর বর্ণ নেই, আশ্রম নেই, কিছু নেই। কাজেই সেটার সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে না।

—কেন? সেইখানেই তো বিরোধ করছেন। মানে, আত্মজ্ঞান লাভে তিনি বিরোধ করছেন।

মহারাজ : আত্মজ্ঞানে তো বিরোধ তিনি দেখছেন না, সকলের ভিতর এক আত্মা, তাতে দোষ নেই তো।

—হ্যাঁ, সেইজন্য বৃহদারণ্যকে আছে—'ৰাহ্মণানাম্ এব অধিকার।' 'এব' কথাটা যোগ করেছেন।

মহারাজ : "ত্রৈবর্ণিকানামেব এবংবিধ অধিকার।" ত্রৈবর্ণিক।

—কিন্তু ঐ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ত্রৈবর্ণিক পর্যন্ত যাননি।

মহারাজ : খালি ব্রাহ্মণ নয়—ত্রৈবর্ণিক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এদের বেদের অধিকার আছে।

—ঐ শেষটায় মহারাজ, একটা খুব সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন শঙ্করাচার্য, যেখানে মহাভারত থেকে তিনি একটা শ্লোক উদ্ধার করে অপশূদ্র অধিকরণ শেষ করে দিয়েছেন। শঙ্করাচার্য ভাষ্যে বলছেন যে, চারবর্ণের সকল লোককেই বেদ শোনাবে। এই বলে তিনি থেমে গেলেন। তাঁর কথাটা কী হবে তাহলে?

মহারাজ : তা বটে। আবার বলছে—তারা তো সাক্ষাৎভাবে শূদ্রদের বেদ উপদেশ দিতে পারে না। কাজেই পুরাণের দ্বারা বেদের তাৎপর্যকে বলবে। বেদই একমাত্র শাস্ত্র, আর কিছু নয়। আর অন্যগুলি সব স্মৃতি। বেদের কথা স্মরণ করে যুগোপযোগী করে যা বলা হয়েছে তাই স্মৃতি।

—মহারাজ, বললেন যে, আত্মজ্ঞানের কথা যখন শঙ্কর বলছেন, সেখানে আত্মায়, আত্মজ্ঞানে কোন ধরনের ভেদ নেই। কিন্তু তিনি তো আচার্য, তাই যে-তত্ত্ব তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন সেটা যদি তাঁর জীবনেও না করে দেখান তাহলে কি সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়?

মহারাজ : জীবনে তিনি কি আর পৈতে ধারণ করেছেন?

—না, পৈতে ধারণ করেননি, কিন্তু অন্য লেখাতে যখন শূদ্রের সম্পর্কে এরকম প্রসঙ্গ এনেছেন, তখন সরাসরি তাদের বেদে অধিকার নেই বলেছেন।

মহারাজ : আসল কথা হচ্ছে, শূদ্র মানে অনাচারী। তাদের বেদ শুনিয়ে কী লাভ? আত্মা তাদের ভিতরে আছে ঠিকই। কিন্তু আত্মা থাকলে কী হবে, তা শূদ্রত্বের আবরণ নিয়ে রয়েছে। উপাধি নিয়ে রয়েছে। কাজেই সেখানে আত্মা থাকায় কোন দোষ হচ্ছে না।

—হ্যাঁ, আমরাও তো সেটাই বলছি। কিন্তু আচার্য যখন সেটাকে ব্যাখ্যা করছেন, তখন তো সঙ্গতি থাকছে না।

মহারাজ : তাহলে শোন। আত্মা থাকলেও আত্মা দুষ্ট হন না।

—শুধু ব্রাহ্মণত্ব কেন, অন্য কোন উপাধি দ্বারাও তো আত্মা দুষ্ট হতে পারে না। শুধু শূদ্রের ক্ষেত্রে কেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, আত্মা কখনো দুষ্ট হতে পারে না।

—ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার, ব্রাহ্মণত্বের অভিমানও তো একরকম উপাধি।

মহারাজ : আরে! ব্রাহ্মণত্ব যেমন উপাধি, শূদ্রত্বও তেমনই উপাধি।

—সেজন্য দুটোকেই তো সমান বলতে হবে। ঠিক কিনা, মহারাজ? উপাধির ক্ষেত্রে তা শুধু শূদ্রেরই হবে, ব্রাহ্মণের নয়—এটা কিরকম হল?

মহারাজ : দুটো সমান হল না। দেখছ না, উপাধিতে ভেদ হল?

—উপাধিতে ভেদ হল। কিন্তু দুটোই যে আবরণমুক্ত করা যাবে না, এরকম তো নয়।

মহারাজ : একথা কেউ বলেনি।

—না, শূদ্রের ক্ষেত্রে যখন অধিকার নেই, তার আবরণটাকে সে কিভাবে দূর করবে?

মহারাজ : না, না। সে তো পুরাণের ভিতর দিয়ে শুনবে। তাতে তো বাধা নেই। তবে অসুবিধা হচ্ছে, যেখানে বলেছে—কানে সীসা ঢেলে দেবে। এইসব বিধানগুলো একটা সমস্যা বটে।

—স্বামীজী যখন পর্যটন করছেন, তখন প্রমদাদাস মিত্রকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে এইরকম একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন।

মহারাজ : স্বামীজী বলেছেন, হাজার হোক ঐ বামুন তো, ঐজন্য ঐসব গোলমাল। আবার বামুন মানে নববিধি।

—কিন্তু বর্তমান যুগে কিভাবে এটাকে আমরা গ্রহণ করব বা ব্যাখ্যা করব, মহারাজ?

মহারাজ : বর্তমান যুগে বেদ আছে কিনা?

—যারা বিশ্বাস করে চর্চা করে তাদের কাছেই আছে, অন্যদের কাছে নেই।

মহারাজ : না, ওকথা নয়। ভেবে বল, বর্তমান যুগে বেদ আছে কিনা?

—নিশ্চয় আছে, মহারাজ।

মহারাজ : তা যদি থাকে তবে বর্তমানকে আলাদা করছ কেন?

—না, এটাকে ব্যাখ্যা করে বলছি যে, এখন তো এরকম বলা যাবে না।

মহারাজ : এখন কেউ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' না বলে যদি বলে—'আমি ব্রহ্ম', তাতে কি কোন তফাত হল? হল কি?

—না, মহারাজ।

মহারাজ : তবে? এই তিড়িং মিড়িং—অং বং সংস্কৃত না বললে কি হবে না?

—কিন্তু বর্তমান কালে গুরুর মুখ থেকে তো শুনতে পাচ্ছে না তারা। তাদের তো সেই সুযোগটাই নেই।

মহারাজ : আরে! সুযোগ আবার কী? নিজের মধ্যেকার ব্রহ্মটার কথা টের পাচ্ছে তো?

—হ্যাঁ, মহারাজ। এখন চার বর্ণের লোকই শুনতে পাচ্ছে। এটা স্বামীজীর কৃপায় সম্ভব হয়েছে।

মহারাজ : কথাটা হচ্ছে, সংস্কৃত করে নাই বা শুনল। তাতে কী আসে যায়? এখন—এই যে আগে বলা হয়েছিল শূদ্রের মন্দিরে যাওয়ার অধিকার নেই, ঠিক আছে। কিন্তু অধিকার যখন দিল, কজন মন্দিরে যাচ্ছে? এত সব অধিকার অনধিকার—এগুলো তো সব লড়াই করার জন্য। আবার পুরাণেতে দেখাচ্ছেন—সুত বক্তা, ঋষিরা শ্রোতা। সুতের আসন ঋষিদের ওপরে—পুরাণে আছে। সুত চঞ্চল হচ্ছেন, কী করে আমি ঋষিদের থেকে উচ্চাসনে বসব? তখন এরকম বলছেন যে, ওটা তোমার জন্য তো করা হয়নি। এটা তো ব্যাসের আসন। তুমি সেই ব্যাসের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের উপদেশ দেবে। এখানে তো পুরাণই ব্রাহ্মণদের অধিকার, গর্ব ইত্যাদি চূর্ণ করে দিয়েছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, একটু কথা হবে। একেবারে চুপ থাকব না। সেই আমরা যে-গল্প শুনছিলাম পুরনো দিনের—

মহারাজ : ধুর, ধুর।

—সেই গল্পটা অন্তত শেষ করে দিন। আরেকটু বাকি আছে, মহারাজ। শিলং, চেরাপুঞ্জি পর্বটা হয়ে গেছে। তারপর যে রাজকোট যাবেন, সেখান থেকে একটু বলুন না। ঐ পর্যায়টা বললেই শেষ হয়ে যাবে।

মহারাজ : রাজকোট? এই এখানে (বেলুড়) গাড়িতে চড়লাম, রাজকোটে নামলাম। ব্যস্, হয়ে গেল। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, চেরাপুঞ্জি থেকে চলে এলেন কেন? ডাকল নাকি? কেন ডাকল?

মহারাজ : চেরাপুঞ্জি থেকে চলে এলাম, কারণ ওখানে সাড়ে নয়বছর ছিলাম। তখন মাধবানন্দ স্বামী জেনারেল সেক্রেটারি। আটবছর থাকার পর তাঁকে বললাম : আমাদের একটা নিয়ম ছিল যে, মোহন্ত এক জায়গায় আটবছরের বেশি থাকবে না।

—ছিল নাকি এইরকম নিয়ম, মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, আগে ছিল। আরো আগে নিয়ম ছিল—ওয়ার্কার থাকবে তিনবছর আর মোহন্ত পাঁচবছর। তারপরে সেটা চলল না। তখন বদল করে হল—ওয়ার্কার পাঁচবছর, মোহন্ত আটবছর। তো, আমি আটবছর হতে জানিয়ে দিলাম, শিলং-চেরাপুঞ্জি জায়গাটা আকর্ষণীয়। এখানে অন্যেরাও হয়তো আসতে চাইবে। কাজেই আপনি আমাকে বদলি করতে পারেন। তিনি বললেন : আচ্ছা দেখি। আমার সেখানে বিরক্তি হয়নি। অবশ্য বিরক্তি কোথাও বিশেষ হয়নি। তারপর দেড়বছর কেটে গেল। সাড়ে নয়বছরের মাথায় মাধবানন্দ স্বামী বললেন : দেখ, রাজকোটে আমাদের লোকের অভাব হচ্ছে। তুমি রাজকোটে যাবে? আমি ভাবলাম, আমি যমালয়েও যেতে রাজি আছি। (হাসি) বলিনি এটা। যাই হোক, বললাম : যাব। তাঁরা আমার পরিবর্তে লোক পাঠাতে দেরি করলেন। নয়বছরের মাথায় কথা হল, আরো আধবছর কেটে গেল। তারপর একজন এল। তখন আমি রাজকোটে চলে গেলাম। মানে, বেলুড় মঠ হয়ে তারপর রাজকোটে গেলাম। মঠে এসে জিজ্ঞাসা করলাম : রাজকোটে কী সমস্যা বলুন তো! কারণ, সমস্যা ছাড়া তো আমাকে ডাকবেন না!

বললেন : সমস্যাটা এই—ওখানকার অবস্থা কিছু বুঝতে পারছি না। ভয়ানক সব চিঠি আসছে। তুমি ফাইল পড়ে দেখ। ভাবলাম—ফাইল পড়ে তো কাজ হবে না। যা হয় হবে। এই ভেবে চলে গেলাম।

—মঠের সাধুরা ভয়-টয় দেখাননি?

মহারাজ : খুউব। দারুণভাবে। বললেন, তুমি কোন্ সাহসে রাজকোটে যাচ্ছ? ওখানে তো ভীষণ খারাপ অবস্থা! দারুণ দেনা! আমি বললাম, আমার সাহস কিছু নেই। তবে একজনকে তো যেতে হবেই। তাই আমি যাচ্ছি। আর ওখানে গিয়ে আমি কতটা কী করতে পারব, তাও জানি না। যতটুকু পারব, করব। এই কথা। সোজাসুজি কথা। আর নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ) সোজাসুজি কথা ভালবাসতেন। যাই হোক, সেখানে গিয়ে দেখলাম, রাজকোটের দেনা রয়েছে তখনকার দিনে ৭৫ হাজার টাকা! এখন হয়তো ৭৫ হাজার টাকাটা তেমন বেশি কিছু না। কিন্তু তখনকার দিনে ৭৫ হাজার টাকা দেনা শোধ করা মানে দারুণ সমস্যা! তারপরে তো গেছি। লোক আসছে। বলছে, আপনাদের অনেকগুলো লোহার খাট আছে। এগুলোর কত দাম? বিক্রি করবেন? আমি বললাম, বিক্রি করার কথা তো হয়নি কিছু। বলল, আমরা তো শুনেছি আশ্রম উঠে যাবে! আমি বললাম, আমি তো তা শুনিনি। আমরা যেখানে যাই, সেখান থেকে সহজে উঠি না। (সকলের হাসি) তারপর তারা আর কিছু বলল না। গুজরাটি তো! ব্যবসা করতে আসে। ভাবছে, এই সময়ে একটা দাঁও মেরে খাটগুলো যদি নিতে পারি। তারপর দেখলাম, অথৈ জল। সেখানে পরামর্শ দিতেন জ—স্বামী। তিনি তো আমাকে গোবেচারি পেয়েছেন। বলছেন : জানেন এখানকার অবস্থা? আমি বললাম, জানতে চেষ্টা করছি। একটা কাঠের টুকরো পড়ে আছে এক জায়গায়। দেখিয়ে বললেন : জানেন এটার কত দাম? আমি বললাম, দাম আমি জানি না। বললেন : এই সব দামি জিনিস। বললাম, তা হবে। ঐসময় একজন দশ হাজার টাকা ধার দিলেন। তা দিয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলো মেটানো গেল। আর সে-সময় উৎসব ছিল ওখানে। সে-উৎসবে কিছু টাকা

বাইরের লোকরাই তুলেছিল। কিছু টাকা বেঁচেছিল, সেই টাকাটা হাতে পেলাম। ১২০০ টাকার মতো। তো যাই হোক, ঐ টাকাটা দিয়ে তখনকার যা ঋণ সেগুলো কিছু কিছু শোধ করা হল। মাঝখান থেকে আবার একজন শেঠ পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিল আমার পূর্ববর্তী স্বামীজীকে। সে মনে করল, আগের মহারাজ তো চলে গেছে। তাহলে আমার পাঁচ হাজার টাকা তো মার যাবে! সে তাই একজন মহারাজকে খোঁচাতে লাগল—আমার পাঁচ হাজার টাকাটা দিন। তিনি আবার আমাকে খোঁচাতে আরম্ভ করলেন। তা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া হল। দশ হাজার টাকার ভিতর পাঁচ হাজার টাকা গেল। তারপর আমি আবার চাঁদা আদায় করতে পারতাম না। ঐ অভ্যাসটা কিছুতেই হয়নি শেষপর্যন্ত। এখনো আদায় করতে পারি না।

—এমনিই যা আসে, এখন আর চাঁদা আদায় করতে হয় না, মহারাজ।

মহারাজ : তা যা বলেছ। এখানে তো মঠ থেকে খাওয়া পাই। (হাসি)

—আজকে এই পর্যন্তই থাক মহারাজ। কাল থেকে না হয় আবার চাঁদা আদায় শুরু করবেন।

মহারাজ : না, না। চাঁদা আদায় পারব না, বাবা! আমি বলেছিলাম, আমি তিনটি কাজ করতে পারব না। এক হচ্ছে চাঁদা তোলা, দুই হচ্ছে ছেলে পড়ানো, আর তৃতীয়—ওষুধ দেওয়া। এই তিনটি কাজ আমি পারব না। তা একজন সাধু বললেন : এই তিনটি কাজই তো মিশনের আছে। এই তিনটে কাজ না পারলে করবে কী? সত্যিই, শেষপর্যন্ত ঐ তিনটে কাজের সবগুলোই আমায় করতে হয়েছে। চেরাপুঞ্জিতে স্কুল ছিল। শিলং যেতাম চাঁদা আদায় করতে। পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে ওষুধের বাক্স নিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতে হয়েছে কত। আবার মাস্টারের অভাবে ছাত্র পড়ানো তো একটা বড় কাজ ছিল আমার। রাজকোটে ছাত্রাবাস ছিল। সেখানকার ছেলেদেরও পড়াতে হতো। ঠাকুর ঘাড় ধরে সবরকম কাজই করিয়ে নিয়েছেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি রাজকোটে গেলেন। জ—স্বামী আপনাকে খুব পরামর্শ দিতেন। আশ্রম বিক্রি হয়ে যাবে বলে শেঠরা আসতে লাগল। তারপর কী হল?

মহারাজ : আশ্রম বিক্রি আর হল না। তবে প্রভুর কৃপায় এরকম দু-একজন এল যারা চাঁদা আদায়ে খুব পটু। কাজে কাজেই টাকার অভাব আর হল না।

—সাধুদের মধ্যে, না ভক্তদের মধ্যে?

মহারাজ : সাধুদের মধ্যে। ভূতেশানন্দ সেখানে গেল, কিন্তু fail করল। মানে সে টাকা রোজগার করতে পারে না। রাজকোটে গাছ নেই, জল নেই, মাটি নেই। সেখানে মাটি কিনতে হয়। দূরে কোথাও গিয়ে দু-একটা গাছ দেখা যায়। একটা মরুভূমির সমতুল্য স্থান। আস্তে আস্তে সেখানে সবই হল। এই হল রাজকোটের বর্ণনা।

—ছাত্রাবাসের বাড়িটি আপনার সময়ে হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ, আমি থাকা সত্ত্বেও হয়েছিল! (হাসি)

—ডিস্পেনসারির বাড়িটি কি আপনার সময়ে হল?

মহারাজ : সে-বাড়ি এখন ভাঙা হয়ে গেছে। এখন ডিস্পেনসারি অনেক দূরে চলে গেছে।

—পাশের জমি কেনা হয়েছিল ডিস্পেনসারির জন্য, সেটা আপনার সময়?

মহারাজ : ঐ তো বললাম, আমি থাকা সত্ত্বেও হয়েছিল।

প্রশ্ন : গুজরাটে যখন ছিলেন, তখনকার রাজাদের সঙ্গে কি পরিচয় ছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ, খুব।

—কোথাকার মহারাজ?

মহারাজ : মোরভি, জামনগর, পোরবন্দরের নবাবের সাথে। জুনাগড়ের দেওয়ানের সাথে পরিচয় ছিল। তারপর ভাবনগর—কত নগর বলব!

—কারো বাড়িতে গিয়েছেন মহারাজ? বা রাজপ্রাসাদে?

মহারাজ : হ্যাঁ। কারো কারো বাড়িতে খেয়েছিও।

—বক্তৃতা দিয়েছেন?

মহারাজ : বাড়িতে বক্তৃতা দিইনি। তবে নানা কথাবার্তা হয়েছে।

—দু-একটা বিশেষ ঘটনা বলুন না, রাজাদের সাথে ব্যাপার কিনা!

মহারাজ : বলছি, বলছি। জামনগরের মহারাজা। তার বাড়িতে নেমন্তন্নে গিয়েছি। একসঙ্গে খেতে বসেছি। তা আমরা খাচ্ছি নিরামিষ, আর তারা দিব্যি সবকিছু খাচ্ছে। আর বারবার বলছে—ডাক্তার আমাকে খেতে দেয় না, খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে! আর এই বড় বড় মাছের টুকরো একটার পর একটা খাচ্ছে।

—তাঁরাই আপনাদের নিরামিষ খেতে দিয়েছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। তা সাধুকে কি আমিষ খেতে দেবে?

—শুধু রাজারাই কি আমিষ খেতেন, না অন্য লোকেরাও খেত?

মহারাজ : ছুপাকে ছুপাকে কৌন নাহি খাতা? কাশীতে হয়েছিল একবার এরকম ঘটনা। একজন আরেকজনকে বলছে : কী খেতে-টেতে ইচ্ছা হয় বল। তা, সে বলছে : মহারাজ, যো বাঙালি লোগ খাতা হ্যায়, ও জ্যারাসা লেনা। বাঙালি লোগ খাতা হ্যায়! ক্যায়া? মছলি? আপলোগ মছলি খাতা হ্যায়? তা বলছে : ছুপাকে ছুপাকে কৌন নাহি খাতা? একজন ছিলেন পণ্ডিতজী বলে। তাঁর একটা স্বভাব ছিল—গোটা মাছটা মুখে পুরে দিয়ে কাঁটাগুলো বের করে আনত। তবে এ আমরা পারব না।

—মহারাজ, আর কোন রাজার সাথে দেখা হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ। একজন রাজা বলেছে, স্বামীজীকো বোলনা উনে তো মেরে পাস আতে হ্যায় স্রিফ রূপিয়া কে লিয়ে। আমি বললাম—তাকে বলে দিও, রূপিয়া বিনা উসকে পাস হ্যায় ক্যা?

—ঐ রাজাই মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, জামনগরের রাজা।

—আর কোন্ কোন্ জায়গায় যেতেন মহারাজ?

মহারাজ : টাকার জন্য সব জায়গায় যেতাম। ভাবনগরের মহারাজা বলত : এখানে আশ্রম করুন। আমি সব দেব। তা আমার কী আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ভাবনগরে আশ্রম করব!

—মহারাজ, ভালই তো প্রস্তাব। ভাবনগরে আশ্রম হতো।

মহারাজ : তা, ভাল হতো বৈকি! কিন্তু আমাকেও তো মঠে থাকতে হবে!

—রাজকোট আশ্রমে কি রাজারা আসতেন?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—ওখানে অনেক রাজা ছিলেন?

মহারাজ : প্রায় দুশো এস্টেট ছিল।

—সবাই জমিদার?

মহারাজ : জমিদার, তাও বড় জমিদার সবাই নয়। ছোট ছোট জমিদারও ছিল। একটা বিচিত্র ব্যাপার এই যে, সেখানে সব কুঁড়েঘর আর তার মাঝে রাজাদের একটা প্রাসাদ। খুব দৃষ্টিকটু লাগত। ঐ প্রাসাদে বসে প্রজাদের শোষণ করত।

—স্বাধীনতার পরেও কি কয়েক বছর ওগুলো ছিল?

মহারাজ : স্বাধীনতার আগে থেকেই British Resident তাদের নিয়ন্ত্রণ করত।

—তারপর ভারত-ভূখণ্ডের মধ্যে এসে গেল?

মহারাজ : হ্যাঁ, স্বাধীনতার পর এস্টেটগুলো বল্লভভাই প্যাটেল ঠান্ডা করে দিলেন। সব এস্টেটকে মিশিয়ে দিলেন।

—সরকার থেকে রাজন্য ভাতা দিত?

মহারাজ : কিছু একটা বেতন মতো ছিল।

—রাজকোটের ভক্তরা বলত না মন্দির তৈরি করতে?

মহারাজ : বললে তো টাকা দিতে হবে। আমার কাছে ছিল মাত্র দু-লাখ টাকা—মন্দিরের জন্য। রেখে দিলাম। তার বেশি আমার তো বুকের ছাতি নেই। আমার পরে যিনি গেলেন তিনি তো কয়েক লাখ টাকার মন্দির করে দিলেন।

—আপনি চাইলেও দিত।

মহারাজ : আমি বেশি চাইতাম না।

—মন্দির করার প্রস্তাব আপনি আসার পরেই হল?

মহারাজ : নতুন মন্দির হল আমার পরে। আমি থাকলে হতো না।

—কিছু বলতে পারা যায় না, মহারাজ।

মহারাজ : এখন তো আর বলতে পারা যাবে না। আমি আগের কথা বলছি। অত লাখ টাকার মন্দির করার মতো বুকের ছাতি আমার নেই।

—টাকার দামও তো কমে গেছে। টাকার জন্য বোম্বের দিকে আসতে হতো?

মহারাজ : হ্যাঁ। বোম্বেতে আসতে হতো।

প্রশ্ন : বোম্বে দিয়ে যাতায়াত করলে তো সুবিধা হতো?

মহারাজ : বোম্বে দিয়ে আসার ব্যাপারে তো সুবিধা-অসুবিধার কথা নেই। বোম্বে তো আমাদের যেতেই হবে। ওটা তো আমাদের দরজা। তাই ওখান দিয়ে যেতেই হবে।

—ট্রেনেই যাতায়াত করতেন, না প্লেনেও যাতায়াত করেছেন তখন?

মহারাজ : প্লেন তখন আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। ট্রেনেই এবং ট্রেনের একেবারে থার্ড ক্লাসে। তখন ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস আর থার্ড ক্লাস—চারটে ক্লাস ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে নিচু ক্লাসে আমরা যাতায়াত করতাম।

—কেউ কখনো টিকিট কেটে দিত না? অত সব শেঠরা ছিল?

মহারাজ : শেঠরা কি আমাকে তাদের সম-পর্যায়ের মনে করত? মনে করত—তারা শেঠ, আর আমরা ভিখারি।

—একবার তো প্লেনে গিয়েছিলেন।

মহারাজ : একবার কেন, দুবার গিয়েছি। আরেকবার এসেছি প্লেনে। শরীর খারাপ ছিল। জরুরি কাজ ছিল বলে শরীর খারাপ নিয়েই প্লেনে করে এসেছিলাম।

—মঠে এসেছিলেন?

মহারাজ : হুঁ।

—অসুস্থ হয়ে একবার কি অপারেশন করতে হয়েছিল?

মহারাজ : হ্যাঁ। দু-মাস ছিলাম বোধ হয়। না, এক-মাস ছিলাম! না, দু-মাস ছিলাম।

—কী অপারেশন মহারাজ?

মহারাজ : গল-ব্লাডার অপারেশন।

—মহারাজ, চাঁদা আদায়ের একটা ঘটনা বলুন—

মহারাজ : চাঁদা আদায় করতে অনেক রকম দুর্ভোগ ভুগেছি।

—সে কী মহারাজ? কাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন?

মহারাজ : এক শেঠকে। যেখানে যেতাম, সেই শেঠ যেত সঙ্গে। তাকে দেখলে বলত : আপ আয়ে হ্যায়। ইসি লিয়ে তো দেনাহি পড়েগা কুছ না কুছ। স্বামীজী আনেসে এক পয়সা ভি নেহি দিয়া যায়ে। আরেক জায়গায় গেলাম। সেখানকার শেঠ বলছে : স্বামীজী কো তো আপ জানতা হ্যায়। স্বামীজী হোস্টেলমে অচ্ছুৎ কো ভি রাখতে হ্যায়। যে-শেঠ আমায় নিয়ে গিয়েছে, সে ঘাবড়ে গিয়ে বলল : হ্যাঁ স্বামীজী? আমি বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয়ই রাখব। যদি অচ্ছুৎ কেউ আসে আমি নিশ্চয় রাখব। যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে এখন কেউ নেই। কিন্তু এলে আমি নিশ্চয়ই রাখব।

—তা, ঐ শেঠ চাঁদা দিলেন?

মহারাজ : না।

—অচ্ছুৎ বলতে কাদের মনে করা হতো?

মহারাজ : আমাদের এখানে হাঁড়ি, মুচি ইত্যাদির মতো। একজন ছিল মেথর। মেথরের ছেলে। তা অন্য যারা অচ্ছুৎ তারা আবার বলত, তোমরা করেছ কী! মেথরের ছেলেটাকে রেখেছ! (হাসি) মেথর আবার তাদেরও কাছে অচ্ছুৎ!

প্রশ্ন : মহারাজ, জামনগরের মহারাজের কথা একদিন বলেছিলেন। আর কিছু মনে পড়ে?

মহারাজ : হ্যাঁ, ওদের ওখানে তো গেছি। একবার এক অনুষ্ঠানে জামনগরের মহারাজকে দেখলাম। আর তার স্ত্রী মহারানি—নাম গোলাপকুমারবা। গায়ের রং গোলাপের মতো। আমি বলি, বাবা! এ তো সার্থক নাম

হয়েছে। তারপর আরেকবার তাকে দেখলাম তার বাড়িতে। সাজাগোজা অবস্থায় নেই। রঙ-চঙ নেই। আমি বলি, এ তো ঝিয়ের মতো!

প্রশ্ন : সেসময়ে জুনাগড়ের দেওয়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মহারাজ : না, জুনাগড়ের দেওয়ানের সাথে দেখা করতে পারিনি। জুনাগড়ের দেওয়ান নবাবকে নিয়ে শেষপর্যন্ত উড়ে চলে গেল পাকিস্তানে। যত টাকাকড়ি ছিল, সব নিয়ে।

—তখন পাকিস্তানের শাসক কে ছিল?

মহারাজ : ভুট্টো, জুলফিকর আলি ভুট্টো।

—হরিদাস বিহারীদাস দেশাই তো জুনাগড়েরই দেওয়ান ছিলেন।

মহারাজ : হ্যাঁ। তবে আমি যে-জায়গাটায় ছিলাম, সে-জায়গাটাই দেখেছিলাম। স্বামীজীর সময়কার বাড়িটা তো আর নেই। অন্য বাড়ি হয়েছে সেখানে।

—জুনাগড়ের দেওয়ানের সব পুরনো কাগজপত্র তাঁর নাতি, নাকি ছেলের কাছ থেকে আনা হয়েছে?

মহারাজ : দেওয়ানরা তো আসলে জুনাগড়ের লোক নয়। জুনাগড়ে চাকরি করত। সেখানকার মহারাজ খুব সরল লোক ছিল। মহারাজ হলেও মহারাজের মতো চাল ছিল না। পরে একবার দেখা হলে আমাকে বলেছিল : এরপর যখন আসবেন আমার প্রাসাদে উঠবেন অতিথি হয়ে।

—যাওয়া হয়েছিল, মহারাজ?

মহারাজ : না। তারপরে তো সে মারাই গেল। একবার আমি মহারাজার গাড়িতে যাচ্ছি, দেখি রাস্তার দুধারে লোকে প্রণাম করছে। ভাবলাম—হঠাৎ এত ভক্তি হয়ে গেল! আগে তো হন্যে হয়ে চারদিকে ঘুরেছি, তখন পাত্তা পাইনি। আর আমাকে এখন এত খাতির করছে! পরে বুঝলাম, প্রণাম আমাকে নয়, গাড়িকে। (হাসি)

একবার আসামের তেজপুরে গেছি। ভিখারি হয়ে পাত্তা পাই না কোথাও। তারপরে একদিন সিভিল সার্জনের অতিথি হয়ে তার গাড়িতে যাচ্ছি। সবাই দেখছে আর বলছে, সিভিল সার্জনের গুরু যাচ্ছেন। টাকা

তুলতে গিয়েছি। কিন্তু এত খাতির! তখন আমি পয়সা চাই কী করে? আমার একটা স্টেটাস হয়েছে। সিভিল সার্জনের অতিথি! তখন আর কী চাইতে পারি লোকের কাছে? যত দিন না চাওয়া যায়, খাতির পাই।

প্রশ্ন : শাস্ত্রে বলেছে—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। আচ্ছা মহারাজ, ব্রহ্ম কি জগৎ-রূপে সত্য?

মহারাজ : না, ব্রহ্ম জগৎ-রূপে সত্য নয়।

—জগৎটা ব্রহ্ম-রূপে সত্য, তার মানে তবে কী? ব্রহ্মই কি জগৎ-রূপে ব্যক্ত?

মহারাজ : এই। আসল কথা হচ্ছে এটাই।

—তাহলে জগৎ বলে আর আলাদা কিছু নেই, এটাই তো সারকথা?

মহারাজ : হ্যাঁ, জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়—এটাই সত্য। শুধু জগৎ নেই বললে বাস্তবকে পরিষ্কার করে বলা হল না। আসলে, জগৎ জগৎ-রূপে নেই—ব্রহ্ম-রূপে আছে। উপলব্ধিটা চাই। উপলব্ধি ভিন্ন কখনো বিচার হয় নাকি?

—উপলব্ধি ছাড়া তত্ত্ব আবিষ্কার করা বড় কঠিন।

মহারাজ : তোমরা তো কঠিনকে সরল করার জন্যই জন্মেছ।

—আর ব্রহ্মজ্ঞান এসে গেলে কিছুই বলার থাকে না। ব্রহ্মে পৌঁছে গেলে সবকিছু মূকাস্বাদনবৎ। মুখ বন্ধ তো!

মহারাজ : 'ব্রহ্ম' শব্দটা বলা হচ্ছে তো?

—তা বলা হচ্ছে।

মহারাজ : তাতে, সেটা তো আর ব্রহ্মের স্বরূপ হল না।

—যতক্ষণ শব্দ-ব্রহ্ম আছে, সেটি ব্রহ্মসত্তা নয়।

মহারাজ : কথা হচ্ছে, ব্রহ্ম কী? ঠাকুর বলেছেন, তা মুখে বলা যায় না। তাহলে যখন আমরা ব্রহ্ম বলছি, তখনো সেই 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে না।

—ব্রহ্মকে যদি আমরা অনুভব করতে চাই তাহলে আমাদের শাস্ত্র অর্থাৎ শব্দরাশি—সেটাকেই তো অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ শব্দই আমাদের অবলম্বন।

মহারাজ : যদি শব্দকে অবলম্বন কর, তাহলে ব্রহ্মকে ধরতে পারবে না।

—তাহলে ব্রহ্মকে ধরার উপায় কী?

মহারাজ : শাস্ত্র বলছে, তিনি অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্, অরসম্ ইত্যাদি।

—তিনি না হয় অশব্দম্ হলেন, কিন্তু আমরা যে শব্দ দিয়ে বলছি?

মহারাজ : আরে বাবা! তিনি ছাড়া আবার তোমরা আছ নাকি?

—সেই তো! 'আমরা যে আছি' তা তো প্রত্যক্ষ অনুভব হচ্ছে। আগে যেটা বললেন, প্রত্যক্ষকেও তো স্বীকার করতে হচ্ছে।

মহারাজ : প্রত্যক্ষ মানে কি শুধু চোখ দিয়ে দেখা?

—চোখ দিয়ে দেখা তো হচ্ছে। হ্যাঁ তাও হচ্ছে—

মহারাজ : না। তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না।

—আমরা তো নিজেদের অস্তিত্বটা সাক্ষাৎ অনুভব করছি। বুঝতে পারছি যে, আমরা আছি।

মহারাজ : হ্যাঁ। কথাটা হচ্ছে, ব্রহ্মের স্বরূপ কী তা মুখে বলা যায় না। এটি হচ্ছে সারকথা।

—কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দটা যে ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মকে যে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—সেটা কে বলছে?

মহারাজ : শাস্ত্র বলেছে।

—তাহলে সেটা উপলব্ধি হচ্ছে না কেন?

মহারাজ : ঐ বিষয়ে অজ্ঞান আছে বলে।

—তাহলে 'অজ্ঞান' আছে?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তাহলে অজ্ঞানকে মানতে হবে?

মহারাজ : অজ্ঞানকে না মেনে উপায় নেই। অজ্ঞান আমাদের কাছে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়।

—অজ্ঞানের যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহলে অজ্ঞানের কার্যটাও প্রত্যক্ষ।

মহারাজ : কী যে বলছ তার ঠিক নেই। অজ্ঞানের কার্য দ্বারাই তো অজ্ঞানকে আমরা দেখি, জানি। অজ্ঞানের কি হাত আছে, না পা আছে? অজ্ঞানকে তো আমরা তার কার্যের দ্বারাই বুঝি।

—সেটাই তো। অজ্ঞানের যে কার্য রয়েছে, আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—সেটি অবলম্বন করেই তো আমরা তাকে জানি।

মহারাজ : তা সত্যি বটে। কিন্তু তা দিয়ে কি ব্রহ্মকে ধরতে পারবে?

—তাছাড়া আর উপায় কী, মহারাজ?

মহারাজ : তাই বলা হয়, ব্রহ্মকে ধরার কোন বাহ্য উপায় নেই। তুমিই যদি ব্রহ্ম হও, তাহলে তুমি ব্রহ্মকে ধরবে কী করে?

—আর উপায়ই যদি না থাকে, তাহলে তাকে ধরার কথা বলছে কে?

মহারাজ : যে অজ্ঞান, সে বলছে।

—বুঝলাম না, মহারাজ।

মহারাজ : বেশ, আবার শোন। ব্রহ্মকে ধরবে কে? ব্রহ্ম ছাড়া যদি কেউ না থাকে, তাহলে ব্রহ্মকে ধরবে কে? ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে ধরবে যদি বল, তাতে দোষ হয়। কারণ, দুই না থাকলে 'ধরা'র প্রসঙ্গা আসতে পারে না। আর যদি বল, ব্রহ্মকে ধরার কেউ নেই, তাহলেও দোষ হবে। তাহলে জানছে কে?

—এরকম কথা বললে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাকিছু শাস্ত্রে বলা হচ্ছে, সেগুলো সব মিথ্যে হয়ে যায়।

মহারাজ : ঠিক তাই। মিথ্যাই হয়ে যায়। অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্যই তো এইসব বিচার। 'তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি'—ব্রহ্মলাভ হলে বেদ অবেদ হয়ে যায়।

—এই যে অশব্দম্, অস্পর্শম্ বলা হচ্ছে, সেটা তো শাস্ত্র শব্দ দিয়েই বলেছে। শাস্ত্র যেটা বলতে চায়, সেটা শব্দ দিয়েই তো বলা হয়।

মহারাজ : ধর কোন স্থান শব্দহীন। এটা বোঝাতে যখন বলা হচ্ছে 'শব্দ নেই'—এটা শব্দ (word) দিয়ে বলা হচ্ছে কিনা? এখানে ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে কি?

—না, বরং বিষয়টা ধরার জন্য বলা হচ্ছে। স্বরূপ না হলেও—

মহারাজ : 'শব্দ নেই' বলা মানে কি শব্দের প্রতিষ্ঠা হল?

—শব্দ নেই কেন? 'ব্রহ্ম' শব্দ তো ব্যবহৃত হচ্ছে। বেদে তো 'ব্রহ্ম' শব্দ দিয়েই উল্লেখিত।

মহারাজ : 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে বলা যায় না। অশব্দ মানেই হচ্ছে, তাঁর কোন শব্দ নেই। 'ব্রহ্ম' শব্দও তাঁর শব্দ নয়। ব্রহ্ম মানে সর্বব্যাপী সত্তা।

—মহারাজ, যার শব্দ নেই, স্পর্শ নেই অথচ জিনিসটি যে আছে—তার প্রমাণ কী?

মহারাজ : প্রমাণ দরকার হয় না। যে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সে-বিষয়ে প্রমাণ দরকার হয়। কিন্তু যে-বিষয় নিঃসন্দেহ, তার আর প্রমাণের দরকার হয় না।

—কী করে নিঃসন্দেহ হল? এরকম যে অশব্দম্, অস্পর্শম্ ব্রহ্ম—তার বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ!! দেখতেই পাচ্ছি না! অনুভবেই আসছে না!

মহারাজ : এখানে তোমরা কারা? তোমরা তো অজ্ঞান।

—তা না হয় হল। আমরা অজ্ঞান হতে পারি; কিন্তু ব্রহ্ম যে আছে—তার প্রমাণ যদি না থাকে তাহলে আর সেটি নিয়ে বিচার করে কী লাভ?

মহারাজ : আরে বাবা! সমস্ত প্রমাণই যে ব্রহ্মের দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাই তারা ব্রহ্মকে প্রমাণ করতে পারে না।

—তাহলে আর ওটা (ব্রহ্ম) নেই বলাই ভাল, মহারাজ।

মহারাজ : 'নেই' বলাটা তো একটা ব্যাখ্যা হল না। যে-বস্তু বলছে ব্রহ্ম নেই, সে-বস্তুটা কী বস্তু?

—সেটি হল সেই বস্তু, যাকে শব্দের দ্বারাও জানা যাচ্ছে, স্পর্শের দ্বারাও জানা যাচ্ছে। শব্দগম্য, স্পর্শগম্য সেই বলছে এই কথা।

মহারাজ : তাকে যদি খোঁজ কর, তার স্বরূপকে ধরতে চেষ্টা কর, তখন কি পাবে কিছু?

—যদি তার কিছু না থাকে, তাহলে সে তো শূন্য।

মহারাজ : 'শূন্য' বলতে গেলেও তো শব্দের দ্বারাই বলা হল।

—আমরাও তো তাই বলছি, শব্দের দ্বারা প্রকাশিত জিনিসই আছে আর শব্দের অতীত কোন জিনিস নেই।

মহারাজ : এই 'শব্দের অতীত' কথাটা বলেই ব্রহ্মের স্বরূপকে বোঝানো হল। কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপকে মুখে বলা যায় না। এই যে মুখে বলা যায় না, ব্রহ্মকে উচ্ছিষ্ট করা যায় না—এটাই হল ব্রহ্মকে বোঝানো।

—'বলা যায় না'—এটাও তো শুনছি এইমাত্র। এটা বুঝতে হবে। 'বলা যায় না' মানে, কোন্ পর্যায়ে কেন বলা যায় না?

মহারাজ : 'বলা যায় না'—এটাও তো বলা হচ্ছে। এ তো উলটো কথা। 'বলা যায় না' মানে, সেটিই সব শব্দের ধ্যেয়। অবশ্য তাতে আবার বলা যায় না, এটাই বলা হল। এ কোন্ দেশি কথা?

—পূর্বপক্ষীর তো এখানেই কথা যে, এরকম যাকে কোন উপায় নেই জানার, সেটি আবার আছে কী করে?

মহারাজ : না, না। বলছি। যার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তাকে আবার প্রমাণ করা যায় নাকি?

—কেন সন্দেহের অবকাশ নেই?

মহারাজ : বলছি, যেমন—তোমার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে?

—আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই।

মহারাজ : সন্দেহ নেই বলছ। কিন্তু এখন তোমার অস্তিত্বটি কী, সেটি বিচার করে দেখতে দেখতে সব শূন্য হয়ে যায়। তোমার অস্তিত্ব খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না কিছু। এই হল তোমার স্বরূপ!

—যদি কিছু না পাওয়া যায় মহারাজ, তাহলে ব্রহ্ম মানে শূন্য?

মহারাজ : শূন্য—বেশ। এটা একটা ব্যাখ্যা হল। তবে, তা নয়, প্রকৃতপক্ষে শব্দের অতীত তিনি।

—এটা তো মহারাজ, শ্রুতি থেকে কেবল বলছেন কথাটি। কিন্তু এটি কী কোন যুক্তিগ্রাহ্য—মানে যুক্তির মধ্য দিয়ে কি বলা যায় যে, শব্দাতীত বস্তু আছে?

মহারাজ : যুক্তি সেখানে পৌঁছাতে পারে না। মুশকিল হচ্ছে এটাই। যুক্তি সেখানে কাজ করে না। যেখানে যে-বস্তু কাজ করে না, তাকে সেখানে প্রয়োগ করে কী হবে?

—ও। তা আমরা বলব, ব্রহ্ম যে সিদ্ধ বস্তু, মানে সিদ্ধান্তী যেটা বলছে—এটাও সিদ্ধান্তীর বলা উচিত নয়।

মহারাজ : না না, সিদ্ধান্ত নয়। ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ।

—স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু! কিন্তু মহারাজ, স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুটাকে আবার যদি কেউ সিদ্ধ করতে চায়, তাহলে?

মহারাজ : ব্রহ্ম সর্বসিদ্ধি। যিনি সর্ব, তিনি সন্দেহের অতীত। সুতরাং তাঁর প্রমাণের কোন দরকার নেই। সর্বসন্দেহের অতীত। তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে কি?

—সন্দেহ আছে, মহারাজ।

মহারাজ : আছে নাকি? তাহলে তো আমরা তোমাকে আচার্য করে ভুল করেছি।

প্রশ্ন : মহারাজ, শাস্ত্রের সীমা তবে কোথায়?

মহারাজ : শাস্ত্র থেকে আদেশ পাওয়া যাবে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে গেলে আর তার বর্ণনা নেই। অশব্দম্ ইত্যাদি।

—বেদ থেকেই তো তাঁকে জানা যাবে, না আচার্যের দরকার আছে?

মহারাজ : বেদে আছে জ্ঞানাবস্থার কথা। তবে আচার্যের কাছ থেকে শুনতে হবে। শুনলে অধিক শক্তি পাওয়া যায়। শাস্ত্রে খালি লেখা আছে; সেগুলি কারো অনুভব হয় কিনা তা আচার্যের কাছে জেনে নিতে হবে।

—শ্রদ্ধা লাভ করা যায়?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—বেদে তো অনেক পথ আছে। তার মধ্যে কোন্‌টা আমার উপযোগী হবে, তা ঠিক করতে আচার্যের সহায়তা প্রয়োজন। এরকম বলা যায় কি?

মহারাজ : হ্যাঁ, তাও বলতে পার।

প্রশ্ন : আচ্ছা মহারাজ, মন-মুখ এক করা মানে যা মনে আসবে তা বলে দেওয়া?

মহারাজ : এটা প্রচলিত কথা রে বাবা! মনে এক, মুখে আর। বলছে : আপনি এসেছেন, বড় আনন্দ হয়েছে। মনে ভাবছে, ব্যাটা এল কেন?

—মুখে যা বলব, তাই মনে করব—এটা নয়? দুটোকে সমান করে দেওয়া—এটা নয়?

মহারাজ : মুখে যা বলব, তাই মনে করব—এটা তো উলটো হল। বরং মনটা আগে। মুখ তো মন ছাড়া কথা বলে না। মন আবার সব ইন্দ্রিয়কে চালায়। মুখ একটা কর্মেন্দ্রিয়। তাকেও মনই চালায়।

—মন-মুখ এক করা যদি মানে হয় যে, যা মনে হয় তাই বলে দেওয়া—

মহারাজ : তাহলে লোকে পাগল বলবে। একবার শুদ্ধানন্দ স্বামীর কী খেয়াল হল, তিনি সবাইকে লিখে পাঠালেন, 'হঠাৎ যদি ঘুম থেকে উঠে দেখ, জগতে কোন প্রাণী নেই, তুমি একা, তখন কী করবে?' সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। কেউ বলল পাগল হয়ে যাব, কেউ বলল প্রথমে মানুষ খুঁজব। তারপর কোথায় খাবার আছে, খুঁজব।

—আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

মহারাজ : মনে নেই এখন। গল্পটা শুনেছিলাম। মায়াবতীর প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক ছিলেন স্বামী অশোকানন্দ। তিনি বললেন : আমি পাগল হয়ে যাব। ধর ভূত দেখা। যদি সামনে এসে হাজির হয়, তাহলে কী করব, ভেবে পাই না। আমি অনেক ভূতের গল্প পড়েছি। আগে অনেক ম্যাগাজিন বেরত—অলৌকিক রহস্য বলে। মামার বাড়িতে স্তূপাকারে এইসব বই ছিল। আমি পড়তে আরম্ভ করলাম। Interesting-ও লাগে, ভয়-ভয়ও লাগে।

—আপনার তো ভয়ের কোন ব্যাপার নেই।

মহারাজ : কেন বল তো?

—আপনি তো ভূতেশানন্দজী। (হাসি)

মহারাজ : তখনো তো হইনি।

॥ ৫২ ॥

প্রশ্ন : উদ্বোধনে আপনার লেখায় বেরিয়েছে, মায়ের শরীর যখন মঠে আসে তখন রাজা মহারাজের লাগানো নাগলিঙ্গাম গাছের তলায় তাঁকে রাখা হয়েছিল। সেটা কোন্ জায়গাটা, মহারাজ?

মহারাজ : ঐ তো, নাগলিঙ্গাম গাছটা এখনো রয়েছে তো।

—পুরনো নাগলিঙ্গাম গাছটা মরে গেছে, মহারাজ। অন্য একটা গাছ লাগানো হয়েছে সেই জায়গায়। ওখানেই কি ঘাট ছিল?

মহারাজ : তখন তো পোস্তা ছিল না। একটা বাঁধানো ঢাল ছিল। নৌকো ওখানে এসে লাগল। ওখান থেকে উঠিয়ে আনা হল মায়ের শরীর।

—মহারাজ, এখানে যে-কয়টা গাছ আছে, তার মধ্যে রাজা মহারাজের হাতে লাগানো কোন্টা?

মহারাজ : আরে! রাজা মহারাজের কী আর কোন কর্ম ছিল না, হাতে করে লাগাবেন? তাঁর আগ্রহে হয়েছিল। রাজা মহারাজ নিজে লাগিয়েছেন নাকি?

—নাগলিঙ্গাম, পূর্ণা, ঠোঙা বট পরপর কয়েকটি গাছ আছে।

মহারাজ : ঠোঙা বটের ভাল নাম কি জান? গোকর্ণ বট। গরুর কানের মতো। তো, গরুর কানগুলো আরো লম্বা হতো। কলিকালে বেঁটে হয়ে গেছে। উঠছ যে! ভাল কথা এই হয়ে গেল!

—আজকে আর ভাল কথা হবে না, মহারাজ। সময় হয়ে গেছে।

মহারাজ : কবেই বা হয়! আমি তো জানি না।

—মহারাজ, আপনি যা বলেন সেটাই ভাল কথা।

মহারাজ : ও বাবা! আবার তালে বড়া তালে বড়া—

—তবে কী মহারাজ, এখানে একটু আসা হয়। আপনি কথা বললেন, আমরা শুনলাম, একটু হাসলাম। এই তো, আর কী!

মহারাজ : এক কাজ কর। সঙ্গে একখানা ক্যামেরা নিয়ে এস। হাসবে যখন তোমরা, ক্যামেরায় ধরে রাখবে। সেটি থাকবে।

—আপনার হাসিটাকে স্মৃতি হিসাবে আমরা ধরে রেখেছি।

মহারাজ : ধরে রেখেছ? দেখো, পালিয়ে না যায়। কারণ যে হাসছে, সে কিন্তু পালিয়ে যাবে।

—তাঁর পালাতে এখনো দেরি আছে।

মহারাজ : পালাতে দেরি কিনা, সেটা কেউ জানে না। কী একটা যেন গান আছে—'কেউ জানে না। মা তুমি কে কেউ জানে না।...'

—সে তো জানিই। একটা আধুনিক গান আছে।

মহারাজ : আধুনিক আর প্রাচীন—এ তো সব আপেক্ষিক শব্দ। এখন আমরা বলছি প্রাচীন, এরপরে তোমরা এই সময়টাকে বলবে প্রাচীন।

—এখন যেটা আধুনিক, ৫০ বছর পরে সেই-ই প্রাচীন। মহারাজ, একটা রবীন্দ্রনাথের গান আছে—'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।'

মহারাজ : সেই-ই...। আমার আজকাল কী হচ্ছে, কারো নাম বললে পুরনো সবার কথা মনে এসে যাচ্ছে। আমার তো সন্দেহ হয়, কে রে বাবা! স্বামী গম্ভীরানন্দের সচিব রাধাকৃষ্ণের নাম আত্মারামানন্দ। আমার এক বন্ধু ছিল আত্মারামানন্দ। তার কাশীপ্রাপ্তি হয়ে গেছে।

—আসি মহারাজ।

মহারাজ : এস, আর কী করবে?

॥ ৫৩ ॥

প্রশ্ন : রামকৃষ্ণ মিশনের এক শতাব্দী পার হয়ে গেল।

মহারাজ : এক শতাব্দী পার করলে, আর কিছুই না।

—পার হয়ে গেল। আমরা পার করিনি।

মহারাজ : বাবা! পার করে দিলে! জান, স্বপ্ন দেখলাম—সামনের দরজায় এক ব্রহ্মচারী নাড়ুগোপালের ভাবে হাত পেতে রয়েছে। আর লোকে

আধুলি, টাকা যা হয় দিচ্ছে। ব্রহ্মচারীকে পরিষ্কার দেখছি। হামাগুড়ি দিয়ে নাড়ুগোপালের মতো হাতটা এরকম করে রয়েছে। (মহারাজ দেখালেন)

—ব্রহ্মচারীকে আপনি চেনেন নাকি?

মহারাজ : না, চিনতে পারলাম না। (সরল হাসিতে উদ্ভাসিত মহারাজের মুখমণ্ডল)

—(নিজেদের দেখিয়ে) এর মধ্যে আছে মহারাজ? লোকে সব নাড়ু-টাড়ু দিচ্ছে?

মহারাজ : নাড়ু দিচ্ছে না, পয়সা দিচ্ছে। পয়সা মানে টাকা, আধুলি—এইসব।

—তার মানে, মনে হচ্ছে, এই শতবার্ষিকীতে প্রাপ্তিযোগটা ভালই, মহারাজ।

মহারাজ (মুখে ছদ্ম-গাম্ভীর্য) : হয়ে আর কী হবে! সবই তো ব্রহ্মচারীদের পেটেই যাবে। আজ তো উৎসব। (সাধারণ উৎসবের দিন পূজনীয় মহারাজের কাছে ব্রহ্মচারীরা মেলা দেখার জন্য কিছু টাকা-পয়সা চায়। প্রত্যেকবার কিছু না কিছু ব্যবস্থা থাকে। সেবিষয়ে ব্রহ্মচারীরা একান্তে এক সাধুর সঙ্গে পরামর্শ করছে দেখে মহারাজ বললেন) এরা সব কী গোপনে গোপনে ঠিক করে, আমি কিছু জানতে পারি না। বুঝছি, আমার সাক্ষাতেই ষড়যন্ত্র হচ্ছে! (সকলের হাসি)

—সুবর্ণ জয়ন্তীতে (৫০ বছরে) কিছু হয়েছিল?

মহারাজ : না না। কিছু হয়নি।

—মহারাজ, আগে তো সারদানন্দজী মহারাজ উদ্বোধনে থাকতেন। মিশন অফিস বলে আলাদা অফিস কবে থেকে হয়েছে?

মহারাজ : আরে! অফিস বলতে কী? তখন একটা লাইব্রেরি ছিল। তাতে চেয়ার-টেয়ার ছিল না। মাদুর পেতে বসত সব। মাদুরে বসে কে একজন খাতা লিখত। অফিসের কাজের মধ্যে কিছু চিঠিপত্র ছিল। অফিস মানে এই। পরেশ মহারাজ উকিলের কাছে যাওয়া-আসা করতেন। খাতাপত্র দেখতেন। পরেশ মহারাজ ছিলেন semi-মোহন্ত। Deputy নয়—semi।

—মহারাজ, মিশন অফিস বলে অফিসটা কার সময় থেকে হয়েছে?

মহারাজ : এ আমাদের আগে থেকে। কিন্তু অফিসঘর বলে কিছু ছিল না। ঐ তো বললাম, সেখানে বসে মুড়িও খাওয়া হতো, খাতাও লেখা হতো।

—ও-বাড়িটা সাধুনিবাস ছিল, আপনি বলেছিলেন—

মহারাজ : ও-বাড়ির কথা বলছি না। স্বামীজীর পাশের ঘর।

—সূর্য মহারাজ যেখানে থাকতেন?

মহারাজ : হ্যাঁ। তখন তো আর সুয্যি মহারাজ এরকম নন। তখন সুয্যি মহারাজ কোথায় থাকতেন, ঠিকানা নেই।

—লেগেট হাউসেও অফিস হয়েছে?

মহারাজ : সে পরে হয়েছে।

—মিশনের কাজকর্ম তো উদ্বোধনেই হতো, যতদিন শরৎ মহারাজ ওখানে থাকতেন।

মহারাজ : কাজকর্ম চালানো মানে, ওখানে চিঠিপত্র লিখতেন। কিন্তু মিটিং এখানেই হতো। মিটিং যে সর্বদা হতো, তা তো নয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী একবার হরমোহনকে ঠাকুরের 'হাতি-নারায়ণ মাহুত-নারায়ণ' গল্পটি সাতদিন ধরে বুঝিয়েছিলেন। কী তার বক্তব্য ছিল?

মহারাজ : স্বামীজী বলেছেন, সাতদিন ধরে গল্পটার মর্ম তিনি বুঝিয়েছেন। আমার কি সাধ্য আছে?

—সাতদিন না হলেও একদিন তো হতে পারে।

মহারাজ : একটি লোককে মাহুত-নারায়ণ বলছিল : সরে যাও, সরে যাও। সে সরে গেল না। তার মনে হল, হাতি নারায়ণ। গুরু বলেছেন, হাতি নারায়ণ হতে পারে। মাহুতও তো নারায়ণ, তার কথা শুনবে না কেন? অর্থাৎ সর্বত্র নারায়ণ দর্শন করলে যে সকলের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার হবে—তা নয়। ঠাকুর আরেকটা উপমা দিয়েছেন। কোন জলে হাত-পা ধোওয়া যায়, কোন জলে নাওয়া যায়। কোন জল আবার খাওয়া যায়। এত রকম নারায়ণেরও ভেদ আছে।

—মানে এক-এক নারায়ণের সঙ্গে এক-এক রকম ব্যবহার করতে হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—মহারাজ, তাহলে ভেদবুদ্ধি, নারায়ণবুদ্ধি দুটো একসাথেই থাকবে?

মহারাজ : কেন থাকবে না? তুমি যদি লাল জামা পর, সবুজ জামা পর, হলদে জামা পর—তুমি কি বদলে যাবে? তুমি তো তুমিই রইলে। ব্যবহারে ভেদ রইল, কিন্তু স্বরূপ তো একই রইল। ভাগবতে একটি শ্লোক আছে :

"ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো, বদন্ত্যনীহাদ-গুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে, ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ॥"

(১০।৩।১৯)

বলছেন : হে বিভু, বহু রূপধারী তোমার থেকে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হচ্ছে, কিন্তু তুমি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। তাহলে এইগুলো কেন তোমার দ্বারা হচ্ছে? তো বলল—তোমার দ্বারা হচ্ছে না, গুণের দ্বারা হচ্ছে। কিন্তু গুণ তোমাকে আশ্রয় করে রয়েছে বলে গুণের ক্রিয়া তোমাতে আরোপিত হচ্ছে। ব্রহ্ম আর ঈশ্বর এইজন্য পরস্পর ভিন্ন হচ্ছেন না। ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য—এটা ব্রহ্মের ওপরেই আরোপিত।

প্রশ্ন : মহারাজ, এখন আমাদের সংঘ বিস্তারলাভ করছে, অনেকেই join করছে, তাই ভাইদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এখন। ফলে যেটা হচ্ছে সেটা হল, আপনারা যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাঁরা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আগের মতো অত নজর দিতে পারছেন না। কিন্তু আগেকার দিনে সকলের বিষয়ে অনেক বেশি নজর দেওয়া হতো।

মহারাজ : না, অত নয়। যতটা বলছ ততটা নয়। তবে যারা নজর চাইত, তারা নজর পেত। যারা চাইত না, তারা দিব্যি ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

—আপনারা যখন সংঘে এসেছিলেন, আর এখন যে-সংঘ আপনি দেখছেন, এর মধ্যে কি কোন পরিবর্তন হয়েছে?

মহারাজ : পরিবর্তন বলা কঠিন। কারণ, আমরা এ-স্রোতে ভাসছি বলে কত দূরে গন্তব্যস্থল বা কোথায় যাত্রা শুরু—তা বলা খুব কঠিন। স্রোতে ভেসে যাচ্ছি।

—তাহলেও মহারাজ, আপনি যখন এসেছিলেন, ঠাকুরের পার্ষদরা তখন অনেকে ছিলেন—

মহারাজ : আরে বাপু! ঠাকুরের মতো আর দ্বিতীয় হয় না। ঠাকুরের সন্তানদের মতো ক্বচিৎ হয়। আর ঠাকুরের সন্তানদের বাদ দিলে তারপরে তো এরকমই হবে।

—তাহলে পরিবর্তন যে কিছু একটা হয়েছে, এবিষয়ে আপনি কী বলেন?

মহারাজ : পরিবর্তন হয়েছে নয়, বল—পরিবর্তন করেছি।

—না মহারাজ, আপনি তো দুটোই দেখলেন। এখনো দেখছেন, তখনো দেখেছেন। আপনি বলুন না, পরিবর্তন কী হয়েছে?

মহারাজ : পরিবর্তন একটা হয়েছে। জপ-ধ্যানটা ক্রমশ গৌণ হচ্ছে। একেবারে গৌণ হয়ে গিয়েছে বলছি না। ক্রমশ হচ্ছে।

—আর?

মহারাজ : আরেকটা হচ্ছে যে, এখন নিয়মকানুন বাড়ছে। তখন এত আইনকানুন ছিল না। সাধুরাও অনেকে বাইরে ঘুরে বেড়াত। এখন বাইরে ঘুরে বেড়ালে তাদের জবাবদিহি করতে হয়। তখন তা করতে হতো না।

—এটা ভাল না মন্দ?

মহারাজ : এটার ভাল ও মন্দ—দুটো দিকই আছে। যে-উদ্দেশ্যে আসা সে-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া, এটা মন্দ। তারপরে ঠাকুরের সন্তানদের মতো জ্বলন্ত আগুনের আঁচ যাদের গায়ে লেগেছে, সেইরকম ভাগ্যবান কটি আর? আমরা মনে করি, সকলেই ভগবান লাভ করে যাব। আরে, ভগবান লাভ করার জন্যে যে-প্রস্তুতি, সেটা আমাদের মনে নেই। কত চাবুক মেরে চলব? এই হয়েছে মুশকিল। সংগ্রাম এইজন্যই বেশি হচ্ছে, কারণ আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হওয়াটা কমে গিয়েছে। এই হয়েছে অসুবিধা।

তখনো আদর্শ ছিল, আদর্শ জীবন সামনে ছিল। তাহলে সকলেই কি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের সেইভাবে গড়তে চেষ্টা করেছে? তা তো নয়। মানুষের সেই গতানুগতিক চলা। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।" সিদ্ধির জন্য যত্ন করা—এ কদাচ কেউ করে, সকলে করে না। সেই প্রাচীনকালের কথা। গীতার কথা। আমরা এখনো সেটাই চাইছি। বলি, তোমরা যে বলছ সব recruit দেখে-শুনে করতে হবে—তা অত শুকদেব কোথায় পাব আমরা!

—মহারাজ, অনেক বৃদ্ধ সাধু কথায় কথায় বলেন যে, আমাদের সময় খুব ভাল ছিল। এখন খুব খারাপ হয়ে গেছে।

মহারাজ : ওকথা— "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে;
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।"

—তার মানে, হাহুতাশ করার মতো কিছু হয়নি। এখনকার অবস্থা কি হতাশ হওয়ার মতো?

মহারাজ : হতাশ হলে তো হয়েই গেল। মরেই গেলে। হতাশ হবে কেন? বুঝেছ? তবে, গতানুগতিক একটা ঘণ্টা পড়ছে, খেয়ে নিচ্ছি, কেউ না দেখলে ঘুমাচ্ছি—এই রকম হলে চলবে না। তখন যে সবই ভাল ছিল, তাও নয়। এখন যে সবই মন্দ, তাও নয়। তবে দৃষ্টিভঙ্গির একটু পার্থক্য রয়েছে। আচারেতে একটা পার্থক্য হয়েছে। আগে যেমন, একটা দৃষ্টান্ত বলছি—আগে সাধুরা অনেকে গৃহস্থের বাড়িতে থাকত। সেটা কেউ নিন্দনীয় বলে মনে করত না। এখন আর তা সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে দেখ, একটা শৃঙ্খলা এসেছে। সংঘের যে-ধারা, তাকে দৃঢ় করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যে আধ্যাত্মিকতা, সেদিকে দৃষ্টি অনেক কমে গেছে। পুরো কমে গেছে বললে হবে না, তবে খানিকটা হয়ত কমছে।

—স্বামীজী মঠের নিয়মাবলিতে বলেছেন যে, বিদ্যাচর্চাটা কমে গেলে সংঘ-জীবনের পরিণাম বিপর্যয়। আপনার কী মনে হয়? এই বিদ্যাচর্চাটাও

কমে গেছে কি? আপনি বললেন, শিক্ষিত ছেলেরা আসছে, বিদ্বান ছেলেরা আসছে—

মহারাজ : বিদ্যাচর্চাটা কমেছে। কারণ শাস্ত্রপাঠের দিকে দৃষ্টি—সাধনের সঙ্গে যেটার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেরকম বিদ্যাচর্চাটা কমেছে। কিন্তু আগে যেমন পড়াশোনা কেউ করল কী করল না—তাতে তাদের দিকে কেউ দৃষ্টি দিত না, এখন তা নয়। আর বিদ্যা মানে কেবল পড়াশোনা তো নয়। বিদ্যা মানে শাস্ত্রচর্চাও—সেটাও করতে হবে। তারপরে জ্ঞান বাড়াতে হবে। (অধ্যাত্ম) বিদ্যার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। স্বামীজী যা বলেছেন, বিদ্যার প্রসার, তা আমরা করছি। চেষ্টা করছি না, তা নয়। কিন্তু একটা Institution-এ ছেলেরা compete করে কজন stand করল—এটার ওপরে আমরা জোর দিই বেশি। কিন্তু ছেলেদের যে শিক্ষার মান, সেটা যাতে বাড়ে তার জন্যে কিন্তু চেষ্টাটা কম। মানে স্বীকৃতি কম। এই।

—আরেকটা যেটা হয় মহারাজ, তখনকার মঠ ও মিশনের সমস্যা বা কাজকর্মের সমস্যার সমাধান পার্ষদরা যেভাবে করতেন, এখন তা আর সেভাবে সম্ভব নয়।

মহারাজ : না, সম্ভব নয়, এবং করার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টাও করা উচিত নয়। যেমন কঠোরতা, তিতিক্ষা—এর ওপরে অত্যধিক জোর দেওয়া এখন চলবে না।

—তাহলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কী করে হবে?

মহারাজ : এখন সেই তিতিক্ষার ভাবটাকে উপলব্ধি করে আদর্শরূপে সেটাকে ধরে রাখতে হবে। তাতে হয়তো খানিকটা প্রতিষেধক হবে।

—আবার অনেকে বলছেন, মিশনের কাজ সমাজ-উন্নয়নমূলক। আমরা তো বলি, আমাদের সংঘ আধ্যাত্মিক সংগঠন। তো, লোককে কী করে বোঝানো যায় যে, এটা শুধু সমাজ-উন্নয়নমূলক সংস্থা নয়?

মহারাজ : ধর, বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যা, তা স্কুল, ডিস্পেনসারি আর লেকচার—এই দিয়ে হয়। কাজেই তারা এই দিক দিয়েই বিচার করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে তাদের বিচার বেশি

নয়। এখন একজন যদি একনিষ্ঠভাবে জপ-ধ্যান করে, এটাকেই প্রধান কাজ বলে গ্রহণ করে—কজন তাতে আকৃষ্ট হবে? আসল কথা হল, ভাল সাধু হওয়া। সাধুত্বকে সমাজের গ্রহণ করা, সমাজজীবনে তার প্রভাব বিস্তার করা—সেটা হয়তো আশানুরূপ হচ্ছে না।

—মহারাজ, এখন তো তপস্যার জন্য খুব বেশি সাধু যায় না, তবে অনেকে ছুটিতে যায়।

মহারাজ : হ্যাঁ, অনেকে ছুটিতে যায়। সেটা তো তিন মাস ছুটি নিয়ে যায় বড় জোর, তাতে কিছুই হয় না। জীবনে তপস্যার একটা ধারা চাই, স্বল্পসময়ে তেমন একটা ছাপ জীবনে পড়ে না।

—মহারাজ, আপনারা তো বিভিন্নভাবে মানুষের সঙ্গে মিশেছেন—

মহারাজ : আমার নিজের দৃষ্টান্ত বলছি। আমি যখন তপস্যা করতে গেছি, কেউ বলে দেয়নি যে, তা দু-মাসের জন্য, না ছ-মাসের জন্য নাকি একবছরের জন্য। মহাপুরুষ মহারাজ বলে দিয়েছিলেন : তপস্যা কর। তারপর এসে কাজ করবে। 'তারপর' মানে কার পর তা বলেননি এবং তার ফলে হয়েছে এই—দু-বছর করে দুবার বাইরে কাটিয়েছি। তখন বাধা হয়নি এতে। কেউ বাধা দেয়নি।

—মহারাজ, এখন কাজ বাড়ছে, কাজের মান কমছে—

মহারাজ : আমাদের কাজের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা খানিকটা কমেছে। বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস হোমের স্বামী নির্বেদানন্দ বলতেন যে, আমরা ছেলেদের তৈরি করতে চাই। তা করতে হলে সংখ্যা খুব সীমিত হওয়া দরকার। মাত্র ২৪ জন ছেলেকে আমরা ঠিকমত দেখাশুনা করতে পারি। তখন অন্যেরা এইরকম মত প্রকাশ করল যে, সংখ্যাটা আরো বাড়াতে হবে। তা না হলে দুটো জিনিস—অনেকে প্রার্থী হয়ে আসছে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সংঘের কাজ খুব ছোট থাকলে মানুষের দৃষ্টি সেদিকে যায় না। এজন্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। বাড়াতে বাড়াতে এখন কত—১০০ হয়েছে বোধ হয়। তার পরিণাম হচ্ছে এই যে, ছেলেদের সঙ্গে সাধুদের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকছে না, আগে যেটা ছিল। এবং

যে-উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান গড়া হল, সেই উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়ে গেল।

—আবার মহারাজ, মিশন থেকে দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটা। আগে খুব কম লোকই নিত, কদাচিৎ দীক্ষা হতো। এখন যেমন শয়ে শয়ে—

মহারাজ : তার কারণ, তখন এখানে দীক্ষা নেওয়ার আগ্রহ মানুষের তত ছিল না।

—মিশনের এই যে নাম, এটা কি শুধু প্রচারের জন্য, না আদর্শের পরিব্যাপ্তির জন্য হয়েছে?

মহারাজ : প্রসারের জন্য। লোক এবিষয়ে সচেতন হয়েছে বেশি। আগ্রহী হয়েছে বেশি। তবে সকলেই আদর্শ সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত হয়ে যে দীক্ষা নেয়, তা নয়। অনেকটা গতানুগতিক হয়ে যায়। তার প্রতিকূল অবস্থাটা এই যে, দীক্ষা হচ্ছে কিন্তু যাদের দীক্ষা হচ্ছে তারা তো অনেকে গুরুকেই চেনে না! অথচ দীক্ষা নিয়েছে। একবার কয়েকজন এসেছিল, বলছে : আমাদের গুরুদেব কোথায়? প্রশ্ন করা হয়েছিল, তোমাদের গুরুদেব কে? তখন যে বলছিল সে আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করল : কে রে? গুরুদেবকে চেনে না, নামও জানে না! এই যে এত দীক্ষার্থীর ভিড়, সকলে যে আগ্রহী হয়ে বা আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আসছে, তা নয়। আবার কেউ কেউ মনে করে, এটা একটা মর্যাদার প্রতীক যে, বেলুড় মঠে দীক্ষা নিয়েছি। এইরকম নানাভাবে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে আসছে। বিস্তার হয়েছে যেহেতু, সেহেতু এরকম হচ্ছে। প্রাচীনকালে যারা দীক্ষা নিতে আসতেন, রাজা মহারাজ তাঁদের সংখ্যা খুব সীমিত রাখতেন। খুব অল্প।

—না, তাহলে এই যে বেশি সংখ্যায় দীক্ষা হচ্ছে বা দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাতে কি আমাদের সংঘের উদ্দেশ্য কার্যকরী হচ্ছে?

মহারাজ : উদ্দেশ্যটা মানে তারা এর ভিতর দিয়ে মঠ-মিশনের আদর্শ এবং তাদের জীবন গড়ার উপায় জানতে পারে।

—না মহারাজ, যারা গতানুগতিক আসছে তাদের কথা বলছি।

মহারাজ : তাদেরও ধীরে ধীরে আদর্শের দিকে সচেতনতা আসবে—এরকম আশা করা যায়।

—আরেকটা ব্যাপার দেখা যায়, মঠ-মিশনে যখন কোন বিপদ আসে, কোন সমস্যা হয় তখন ভক্তদের দিক থেকে কোন সমর্থন আসে না।

মহারাজ : কিছু সমর্থন অবশ্যই আসে। আসে না—একেবারে তা নয়। আসে, কিন্তু তা যথেষ্ট হয় না। তার কারণ, তাদের সামর্থ্য কম। এবিষয়ে হয়তো তাদের চিন্তাও কম। তবে তারা চায়, মঠ-মিশন নির্বিঘ্নে তাদের কাজ করে যাক।

—আপনারা যখন কোন সেন্টারে কাজ করেছেন, রিলিফ বা অন্যান্য কাজ, তখন মিশনের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা কিরকম দেখেছেন?

মহারাজ : রিলিফের ক্ষেত্রে আমরা একেবারে অপরিচিতদের ভেতর কাজ করেছি। কাজেই, সেখানে লোকের আকর্ষণ হয়েছে কিছু পাবে বলে। তাদেরও যে কিছু দেওয়ার আছে, এটা তারা মনে করত না। কাজেই রিলিফে ঐভাবে আদর্শের প্রতিফলন ঘটত না। তবে এতে সাধুদের জীবনে একটা উন্নতির উপায় হয়। কিন্তু সমাজ সেসম্বন্ধে বেশি সচেতন নয়।

—রিলিফ ছাড়াও সাধারণভাবে মিশনের অন্যান্য কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা এমনিতে আসছে, না আদর্শের দিকে একটা অনুপ্রেরণা নিয়ে আসছে?

মহারাজ : দেখ, সাধুদের দিকে বা আদর্শের দিকে যে আকর্ষণ, সেটা সমানভাবে জনগণের থেকে পাওয়া যায় না। কখনোই পাওয়া যায় না। কোন যুগেই এটা হয়নি। তবে এর ভেতর থেকে যারা উৎসাহী তারা জীবনকে তৈরি করার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া অধিকাংশই গতানুগতিক।

—আপনি তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন, বিভিন্ন কাজ করেছেন। তা স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সঙ্গে মিশনের সম্পর্ক—

মহারাজ : স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ভেতরে দুটি থাক ছিল। এক থাক হচ্ছে, যারা আমাদের খুব সুনজরে দেখত না। আরেক থাক, যারা

আমাদের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট ছিল। তারা কেউ কেউ এখানে সাধু হিসাবে যোগ দিয়েছে। আর তা না হলে তারা এই আদর্শকে গ্রহণ করে নিজের ভাবে চলেছে।

—মিশনের কাজও তো এর জন্যে কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। ভারত সরকার মিশনের ওপর নানারকম ভাবনা-চিন্তা গ্রহণ করেছে।

মহারাজ : স্বাধীনতা-সংগ্রামী যারা, বিশেষ করে বিপ্লবীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকায় তখনকার দিনে বিদেশি গভর্নমেন্ট আমাদের দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখত এই ভেবে যে, এরা হল বিপ্লবীদের প্রেরণার স্থল। তার একটা দৃষ্টান্ত এইরকম—বাবুরাম মহারাজ তখন আছেন। পুলিশ এসে বলল : "আপনাদের এখানে যারা যাওয়া-আসা করে, তাদের নাম দিতে হবে।" তা বাবুরাম মহারাজ সতেজে বললেন : "আমরা এরকম নাম দিতে পারব না। তোমাদের ইচ্ছা হয় তোমরা গেটে লোক রেখে নাম লেখ। আমরা নাম দেব—এটা আশা করা যায় না।" তা এরকম সন্দেহের দৃষ্টিতে গভর্নমেন্ট আমাদের দেখত। অবশ্য স্বাধীনতার পর আর সেই ভাব রইল না।

—স্বাধীনতার আগে মিশনের বিস্তার আর স্বাধীনতার পরে মিশনের বিস্তার—এই দুটো কিরকম মনে হচ্ছে আপনার?

মহারাজ : স্বাধীনতার পরে কাজের বিস্তার দ্রুত হয়েছে। স্বাধীনতার আগে কাজ এত দ্রুতগতিতে বাড়েনি। দুটো কারণে এটা হয়েছে—প্রতিবন্ধকতা কমেছে এবং গভর্নমেন্টের সাহায্য বেড়েছে। এজন্য আমাদের সব কেন্দ্রে কাজের প্রসারও খুব।

—এই জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজী—স্বাধীনতার পরে যাঁরা দেশ গঠনে এগিয়ে এলেন তাঁরা মিশনকে সাহায্য করেছেন, কিছু জানা আছে আপনার?

মহারাজ : নেহেরু, গান্ধীজী? গান্ধীজী খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। আমাদের কাজকর্মকে তিনি কী দৃষ্টিতে দেখতেন, জানি না। তবে নেহেরুজীর শ্রদ্ধা ছিল। হয়তো মনে করতেন, আমরা এই দেশের উন্নতির কাজে

তাঁদের মতো করে যোগ দিতে পারিনি, কিন্তু আদর্শবাদী হিসাবে আমাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন।

—আমাদের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার তখন অনুদান দিত?

মহারাজ : সরকার দিয়েছে। তা কেন্দ্র হোক, রাজ্য সরকার হোক। রাজ্য সরকার তো আমাদের অতি ভক্ত। বাংলায় প্রচুর টাকা দিয়েছে। বিভক্তের পরেও দিয়েছে। তার ফলে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হুহু করে বেড়ে গেছে। আমাদের সাধ্যের অতীত কাজ আমরা নিয়ে নিয়েছি। তার ফলে এখন বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এখন বলছি, তাই তো সামলাই কী করে? যেমন স্বামীজী কারিগরি শিক্ষার ওপর খুব জোর দিয়েছেন। আমাদের কারিগরি শিক্ষার জন্যে খুব বেশি প্রচার হয়নি। বরং করতে গিয়ে বাধা পেয়েছি। কারণ, যারা এখানে শিক্ষক বা ছাত্র তারা ঠিক আদর্শবাদী নয়। আমাদের আদর্শকে তারা নেয়নি। লৌকিক দৃষ্টিতে সুবিধে হবে বলে, শিক্ষা হবে বলে তারা এসেছে। কাজেই তাদের ভেতরে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। নানান জায়গাতে এজন্য আমাদের অবস্থা বিপন্ন হয়েছে। এবং সে-ভাবটা এখনো কেটেছে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন : ঠাকুরের সন্তানদের মহাসমাধির পরে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা মিশন কী করে কাটিয়ে উঠল?

মহারাজ : শূন্যতা—এক হিসাবে যে, ঠাকুরের সন্তানদের মতো আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আমাদের ভেতরে সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠেনি, উঠবেও না। তারপর, কাজের দিক দিয়ে খুব বিস্তার হয়েছে। তাঁদের পরেও কাজের ক্ষেত্র অনেক বেড়ে গেছে। তা তো আগেই বলেছি, তাতে আধ্যাত্মিক জীবন খানিকটা ব্যাহত হয়েছে।

—স্বামীজী মেয়েদের শিক্ষিত করা বা তাদের উন্নয়নের কথা খুব বলেছেন। এতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টা কতটা সফল হয়েছে?

মহারাজ : হ্যাঁ, স্বামীজী মেয়েদের শিক্ষার কথা খুব বলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের আওতায় ছিল নিবেদিতা স্কুল, তার পরে হল স্ত্রীমঠ। এখন স্ত্রীমঠের বহু শাখাবিস্তার হয়েছে। তার কাজ বাড়ছে এবং এ-দুটি প্রতিষ্ঠানই

আদর্শকে গ্রহণ করে—আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থেকেই কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু অসুবিধা এই যে, বেশি কাজ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গো আমাদের যোগাযোগ সীমিত হয়ে গেছে। সীমিত হওয়ার কারণ, আগেই বলেছি, বেতনভুক কর্মী বেড়ে গেছে এবং আমরা তাদের সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। কাজের বিস্তার হলে এটা বাড়বে বৈ কমবে না। একটা লেখায় পড়েছিলাম—এক শয়তান আর এক ভক্ত একসঙ্গো যাচ্ছে। ভক্তটি বলছে : শয়তান, তোমার রাজ্য গেল। শয়তান বলল : কেন? ভক্ত বলল : একজনকে দেখলাম নির্ভেজাল সত্য কুড়িয়ে পেয়েছে, কাজেই তোমার তো অবস্থা গেল। শুনে শয়তান বলল : ভেবো না, তাদের আমি সংঘবন্ধ হতে প্রলুব্ধ করব। আমরা এখন সংঘবন্ধ হতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। (সকলের হাসি)

—আপনার কী মনে হয়, আমাদের কাজ এখন না বাড়ানো উচিত? কাজ বাড়ানো মানেই তো নতুন কেন্দ্র খোলা।

মহারাজ : আমরা সবসময় বলি কাজ বাড়াব না। কিন্তু কাজের গতি—ধারা এমন যে, তা সর্বদা বেড়েই যায়।

—এখনো পর্যন্ত দেখা গেছে, ভারতের সমস্ত প্রদেশে আমাদের কেন্দ্র হয়নি।

মহারাজ : না, হয়নি।

—এবিষয়ে আপনি কী মনে করেন, কেন হচ্ছে না?

মহারাজ : কারণ, আমরা ঐভাবে প্ল্যান করে কিছু করিনি। এখনো অবধি প্ল্যান করে হচ্ছে না। কেবল যেখানে ভক্তরা খুব আগ্রহ করে চেয়েছে, সেখানে আমাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে প্রসার হয়েছে। ঠিক ভৌগোলিক দৃষ্টিতে প্রসারিত হয়নি। এখনো অবধি তাই। তবে অন্য রাজ্যের লোকেরাও চাইছে। আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমরা কোথাও হয়তো তাদের সাহায্য করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করছি। কোথাও পারছি না। এখনো অবধি এই অবস্থা চলছে। এককথায়, আমরা কোন পরিকল্পনা করে করিনি।

—বিদেশে তো অনেক জায়গায় নতুন কেন্দ্র করার আবেদন আসছে বা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

মহারাজ : আমরা খুলছিও। খুলছি না যে তা নয়। যেমন ফ্রান্সে, সুইজারল্যান্ডে, রাশিয়াতে হয়েছে। এইগুলি তো পরে হয়েছে। জাপানে হয়েছে। আবেদন তো অস্ট্রেলিয়া থেকেও এসেছে। আরো বহু জায়গা থেকে আসছে। ব্রাজিলে হয়নি। [পরবর্তী সময়ে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল ও নেপালে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।] তবে সাউথ আমেরিকার আর্জেন্টিনাতে হয়েছে। সে ঠাকুরের সন্তানরা থাকতে থাকতেই হয়েছে।

—এখানে একটা কথা যে, ঠাকুরের সন্তানরা থাকতে থাকতে আমেরিকা বা ইউরোপে যত কেন্দ্র হয়েছে, পরবর্তী কালে বিস্তারের ক্ষেত্রটা অত বাড়েনি। মানে, সেইভাবে বাড়েনি। আমেরিকাতেই ১২টা কী ১৩টা কেন্দ্র হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। সেইভাবে যদি অন্য প্রান্তে—

মহারাজ : এখন আমাদের বাইরের কেন্দ্র বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি নেই। আমরা এখন এই ভেবে সঙ্কুচিত যে, চালাব কী করে? এই ভয়ে আমরা কেন্দ্র খুলছি না। তখন তো খুব কম ছিল—কয়েকটা মাত্র। এখন কেন্দ্র অনেক বেড়েছে।

—না। আমেরিকাতে ১২টা কেন্দ্র হয়েছে, আরো হচ্ছে। সেই হারে একটা নতুন দেশে নতুন কেন্দ্র হলে তার প্রভাবটা—

মহারাজ : তা হয়েছে। যেমন ফ্রান্সে হয়েছে, রাশিয়াতে হয়েছে, সুইজারল্যান্ডে হয়েছে।

—আনুপাতিক হিসাবে—

মহারাজ : আনুপাতিক বলা যায় না কিছু। তখন শুধুমাত্র ঠাকুরের সন্তানদের উৎসাহেই যে হয়েছে, তা নয়। স্থানীয় ভক্তদের আগ্রহতেও আশ্রম হয়েছে। এখন সেরকম আগ্রহ থাকলেও তাকে সেইভাবে—

—গ্রহণ করতে পারছেন না।

মহারাজ : ঠিক তাই। কিন্তু সাধুর সংখ্যা বেড়েছে। আবার প্রত্যেক কেন্দ্রে কাজের প্রসারও অনেক বেড়ে গেছে। সব জায়গাতেই বলছে—লোক

দাও, লোক দাও। আমরা দিতে পারছি না। কাজেই মর্যাদা ওদিক দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

—চারিদিকে আমাদের কাজের খুব প্রশংসা হচ্ছে যে, রামকৃষ্ণ মিশন খুব ভাল কাজ করছে এবং আপনি আগে যেটা বলেছিলেন, স্বাধীনতালাভের পরে সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছিল। উদ্দেশ্য, রামকৃষ্ণ মিশনকে টাকা দিলে সদ্ব্যবহার হবে। এখনো সেই ভাবটা রয়েছে পুরোদমেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও টাকা দেয় মিশনকে, যাতে ভাল কাজ করে। তবে এই যে এত কাজ হচ্ছে, তাতে ঠাকুরের শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ আমরা কতটা সফল করতে পেরেছি?

মহারাজ : এটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। যারা কাজ করছে, তাদের যদি এই বিষয়ে চেতনা থাকে যে, এর দ্বারা আমরা শিবজ্ঞানে জীবসেবা করছি, তাহলেই সেটা সার্থক। আর তা না হলে এর দ্বারা আমাদের সামাজিক স্বীকৃতি হবে, আমরা লোকসমাজে স্বীকৃতি পাব, কিন্তু তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না।

—যার ফলে আজকাল শোনা যাচ্ছে যে, রামকৃষ্ণ মিশন খুব ভাল কাজ করছে।

মহারাজ : কারণ, সাধু যাঁরা—তাদের ভেতরে অন্য কোন মতলব নেই। তারা স্বার্থবুদ্ধি থেকে কাজ করে না, ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ বলেই করে। সুতরাং সে-কাজে খুব dedication আছে। অর্থাৎ কাজটাকে নিখুঁতভাবে করার খুব আগ্রহ আছে, যা বেতনভোগীদের থাকে না। এজন্য আমরা স্বীকৃতি পাচ্ছি। কিন্তু এই স্বীকৃতি আমাদের যেন বিপরীতমুখী না করে। এই বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে, যাতে আমরা আমাদের আদর্শকে ধরে রাখতে পারি। অনেক সময় মনে হয় যে, এখন কাজ করা খুব কঠিন হয়েছে। আবার আরেক দিক দিয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ বেড়েছে। তখন সরকার আমাদের কাজ সম্পর্কে উদাসীন ছিল, এখন যে যে কাজকর্ম আমরা করি তাতে সরকারের দৃষ্টি থাকে। সরকারের প্রশংসালাভ হয় কিনা—তাই। কাজেই আমাদের কাজের ক্ষতি

হচ্ছে এইদিক দিয়ে যে, তারা যেখানে বলছে, যেমন বলছে অনেকটা সেইভাবেই কাজ করতে হচ্ছে।

—আপনি তো রিলিফ সেক্রেটারি ছিলেন একসময়। তখনকার রিলিফ থেকে এখনকার রিলিফের গুণগত মান কি বেড়েছে? কারণ, পরিমাণগত দিকটা তো বেড়েছে।

মহারাজ : হ্যাঁ, অনেক বেড়েছে।

—কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে আমাদের কাজের যে-উন্নতি হচ্ছে, সেটা কী দেখে মনে হচ্ছে আপনার?

মহারাজ : সেভাবে দেখলে বলতে হবে, গুণগত দিক দিয়ে আমাদের যে খুব বেশি পার্থক্য হয়েছে, তা নয়। তবে কাজের প্রসার হয়েছে এবং আমাদের কার্যক্ষমতা বেড়েছে। কাজের জন্যে সরঞ্জাম প্রভৃতি বেড়েছে। কিন্তু আদর্শের দিক দিয়ে যে বেশি বেড়েছে, তা মনে হয় না। আবার কমেছে বেশি—তাও বলতে পারি না। তখন আমাদের কাজ ছিল খুব সীমিত। এখন বিশাল। এবং সেই কাজের জন্য আমাদের লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে, বেতন দিয়েও লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে পুনর্বাসনের কাজের জন্য। এটিই মুশকিল হয়েছে।

—এটা তো হচ্ছে ঠিকই। প্রশংসা হচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে অনেকে বলছে যে, তাৎক্ষণিক রিলিফে মিশন অতটা এগিয়ে যেতে পারছে না।

মহারাজ : ঐটা ভুল ধারণা। আমাদের অসুবিধে হচ্ছে এই অর্থে, কাজটাকে ভাল করে করার জন্যে একদল লোককে আমরা কিন্তু আলাদা করে রাখি না। মানে, রাখতে পারি না। লোকসংগ্রহ করতে হয় বিভিন্ন আশ্রম থেকে। তারা আবার সব অন্য কাজে ব্যাপৃত আছে। সেসব কাজ থেকে সাময়িকভাবে ছাড়িয়ে এনে রিলিফের কাজে লাগাতে হয়। এজন্য সময় লাগে। লোকের আগ্রহ তড়িঘড়ি করব। অন্য কিছু সংগঠনের অন্যান্য বিষয়ে এত engagement নেই। তারা চলে যায়। গিয়ে কদিন কাজ করে ফিরে আসে। স্বীকৃতি হল—দেখ দেখি, কেমন সুন্দর কাজ এদের, সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে! আমাদের মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাজ করলেই

কি যথেষ্ট কাজ হল? কাজের ধারা অনুসারে যাতে ঠিক ঠিক কাজ হয়, ঠিক ঠিক লোক বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও উপকৃত হয়—এটা দেখতে হবে। এই জিনিসটা আমরা যত চেষ্টা করি, এতটা অপরে করে না।

—আরেকটা কথা বলা হয় মহারাজ, স্বামীজী গ্রামের লোকের সার্বিক উন্নতি চেয়েছেন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রগুলো তো বলতে গেলে সবই শহরকেন্দ্রিক।

মহারাজ : না, শহরকেন্দ্রিক নয়। যেমন ধর, নরেন্দ্রপুর—গ্রামেতেই কাজ তাদের। শহরকেন্দ্রিক নয়।

—একটা শাখা ওদের গ্রামের—লোকশিক্ষা পরিষদ।

মহারাজ : আর তাছাড়া তাদের যে-ধরনের প্রতিষ্ঠান, তাতে আমরা তো এরকম করি না। কেবল শহরের লোকরাই তার দ্বারা উপকৃত হবে—এই দৃষ্টিতে আমরা করি না। তবে শহরে আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বেশি। তার কারণ হচ্ছে, সেখানে লোক সাহায্য করে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে গড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এইজন্য শহরেতে আছে। কিন্তু বাইরের ছাত্রও তো অনেক আসে। স্কুলে যেমন বাইরের ছাত্র আসে, হসপিটালেও বাইরের লোক আসে। শহরের লোকের তুলনায় বাইরের লোক খুব যে কম আসে—তা নয়। স্বামীজী যখন বলেছিলেন, তখনকার পরিস্থিতি আরেক রকম ছিল। বলেছিলেন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে ম্যাজিক লন্ঠন নিয়ে তাদের শেখাতে হবে। এখন আর সেরকমটা দরকার হয় না। এখন ধারা অন্যরকম হয়েছে। আমরা স্কুলের কাজে গ্রামের লোকদের সাহায্য যে পাই না তা নয়, তবে শহরের ক্ষেত্রে মনে হয় যেন বেশি। যেমন ডিস্পেনসারি ইত্যাদি। তাছাড়া গ্রামোন্নয়নের জন্য যে-চেষ্টা—তাও হচ্ছে। সীমিত হলেও হচ্ছে। পল্লিসেবা—বহু জায়গাতেই এরকম চেষ্টা হচ্ছে।

প্রশ্ন : আমাদের প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন মূলত আধ্যাত্মিক সংগঠন; আধ্যাত্মিকতা নিয়েই এর জন্ম। আধ্যাত্মিক নবজাগরণে রামকৃষ্ণ মিশন সাধু-সমাজে কতটা পরিবর্তন আনতে পেরেছে? ভারতীয় সাধু-সমাজের ধারাবাহিকতায় মিশন কতটা রূপান্তর আনতে পেরেছে?

মহারাজ : সাধু-সমাজের ভেতরে এখন একটা ভাব—এটা সকলে বুঝেছে যে, সেবা তাদের করতে হবে কিছু কিছু। এতদিন সেটার দিকে তেমন দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু সেবা এখন সব কেন্দ্রে কমবেশি হয়। সাধু-সমাজেও কিছু সেবাভাব রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই একটা বিশেষ অবদান বলতে পারি।

—প্রথম দিকে রামকৃষ্ণ মিশনকে তো পুরনো সাধু-সমাজ গ্রহণই করেনি।

মহারাজ : না। তবে এখন করছে। তার জন্য দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাচ্ছে।

—আরেকটা কথা শুনেছিলাম যে, ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকীতে নিরঞ্জনী আখড়া ওদের সোনার সিংহাসনে ঠাকুরের ছবি বসিয়েছিল। যাঁদের ভারতীয় অবতার বলে মানা হয়, তাঁদেরই সোনার সিংহাসনে বসানো হয়।

মহারাজ : বিষয়টা আমি জানি না।

—শতবার্ষিকীতে ওরা শোভাযাত্রায় ঐ সিংহাসন দিয়েছিল ঠাকুরের প্রতিকৃতি বসানোর জন্য।

মহারাজ : বলতে পারি না। তবে ঠাকুরকে ওরা স্বীকৃতি জানায়। কিন্তু আমাদের কাজকর্মকে অতটা স্বীকার করত না। ঠাকুরকে স্বীকার করার ভেতরেও reservation আছে। তাছাড়া এখন আমাদের কাজকর্মকে প্রশংসা করে, কিন্তু নিজেদের জীবনকে সেদিকে প্রবাহিত করতে খুব একটা চেষ্টা করে বলে মনে হয় না।

—আপনি একটা ঘটনা বলেছিলেন, সেই দুজন সাধু ছিল কুঠিয়াতে। একজনের অসুখ হল, আরেকজন চলে যাচ্ছে।

মহারাজ : দুজন নয়। একটা দল। দলের ভেতরে একজনের অসুখ হয়েছে। অসুখ মানে কলেরা-টলেরা এসব কিছু। তো সব দল পালিয়ে গেল। কেননা, 'বিক্ষেপ হোতা হ্যায়'—এই বলে পালিয়ে গেল।

—স্বামীজীর কনখল আশ্রম প্রতিষ্ঠা তো এই সাধুসেবার জন্য।

মহারাজ : হ্যাঁ, কনখল আশ্রম প্রথমে সাধুসেবার জন্য শুরু হয়েছিল। তারপরে সেটা আর শুধু সাধুদের জন্য রইল না।

—সেসময়ের কোন ঘটনা আপনার মনে আছে?

মহারাজ : অখন আর মনে নেই। তবে জানতাম। আমাদের সাধুদের ভিক্ষা দিত না ছত্রে। আমাদের এরা 'ভাঙ্গি সাধু' বলত। সাধু-সমাজে তখন স্বীকৃতি ছিল না। তবে এখন খুব স্বীকৃতি হয়েছে। ভাণ্ডারার সময় মোহন্তদের যে-পর্যায়, তাতে আমাদের সাধুদের বসায়। এরকমভাবে স্বীকৃতি হয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমাদের ভাব কতটা তারা গ্রহণ করেছে, জানি না। তবে আমাদের দ্বারা তারা উপকৃতও হয়। এও একটা কারণ। তাছাড়া একটু ভাবের বদলও হয়েছে। তারা নিজেরা যে এতে খুব সক্রিয়ভাবে লেগেছে, তা মনে হয় না। বহু টাকা তাদের আছে, কিন্তু সে-টাকার সদ্ব্যবহার এভাবে করে না। সাধুদের ভাণ্ডারা দেয়। দরিদ্রসেবা এখনো তাদের ভেতরে শুরু হয়নি।

—এ হল আধ্যাত্মিক জগতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব। সাংস্কৃতিক জগতে?

মহারাজ : সাংস্কৃতিক জগতে আমাদের অবদান গৌণভাবে হয়েছে। কারণ, পুস্তকের খুব প্রচার হয়েছে। বই বেরিয়েছে অনেক। লোকে পড়ছে। পড়ে তাদের ধারণা হচ্ছে যে, এই একটা আদর্শ, এটাকে উৎসাহ দেওয়া দরকার। এজন্য আমাদের টাকাকড়ি যথেষ্ট আসছে। কিন্তু লোক এগিয়ে এসে যে সেবা করবে, সেরকম খুব কম।

—না। আরো তো রয়েছে উপনিষদ্ গ্রন্থাদি ও বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ, যেগুলো খুব কমই ছিল আগে—

মহারাজ : হ্যাঁ। এগুলো অনেক বেড়েছে। যেভাবে প্রচার বললাম, এগুলো তার ভেতরে নিহিত।

—এই যে আমাদের নানারকম শতবার্ষিকী হচ্ছে—ঠাকুর, মা, স্বামীজীর; তারপরে বিভিন্ন সম্মেলন; এসব উৎসব সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? এসব উৎসবে কি লোকহিতকর কিছু হচ্ছে?

মহারাজ : লোকহিতকর কিছু হচ্ছে তো বটেই। তবে এখন যা হচ্ছে, তা বহু ব্যয়সাধ্য।

॥ ৫৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি তো দুটো মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন—১৯২৬ সালে এবং ১৯৮০ সালে। এ-দুটোর মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ করেছেন? ১৯২৬ সালের এত বছর পরে আরেকটা হল। আগেরটাতে যেমন ঠাকুরের সন্তানরা ছিলেন, পরেরটাতে ছিলেন না।

মহারাজ : তাঁদের প্রভাব ভক্তদের ওপরে স্বভাবতই বেশি। জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব যে কতখানি, তা ঠিক বলতে পারব না।

—মানে চরিত্রগত কোন পার্থক্য?

মহারাজ : তাঁদের জীবন আদর্শময়। সেই জীবন দ্বারা যারা প্রভাবিত হয়েছে, তারা বেশির ভাগই সাধু হয়েছে। গৃহস্থ মাঝামাঝি। তবে সমাজের খুব দরিদ্র, অনুন্নত যেসব অংশ, তাদের ওপরে কতটা প্রভাব পড়েছে, বলতে পারছি না।

—আর আপনাকে কেন্দ্র করে একটা প্রশ্ন মনে আসছে। এতদিন ধরে সংঘে থাকার বিরল দৃষ্টান্ত আপনি। বিশেষ করে এত সুদীর্ঘকাল ধরে সংঘে আছেন, এখন আর তেমন কেউ নেই। এছাড়াও আপনি ছোট বয়স থেকে মঠের কাছাকাছি থাকতে পেরেছেন। সেটাও একটা বিরল দৃষ্টান্ত। তারপরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সংঘের সেবা করেছেন। বিভিন্ন ভাবে মানে বিভিন্ন পদে থেকে। 'পদ' কথাটি যদিও ঠিক নয়, তবু বলছি। কখনো কর্মী হিসাবে, কখনো কেন্দ্রের ভার নিয়ে প্রশাসক হিসাবে, তারপরে সংঘগুরু। এই রূপান্তরগুলোর মধ্য দিয়ে আপনি এই যে বর্তমান অবস্থার মধ্যে আছেন, এই যে অভিজ্ঞতা আপনার সারা জীবনের—এর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

মহারাজ : ধারণা বদলায়নি।

—আগে কী ধারণা ছিল? কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণা—

মহারাজ : না, না। আমার কথাটা শেষ করি। ছেলেবেলা থেকে যে-ধারণা ছিল, ঠাকুরের সন্তানদের সান্নিধ্যে এসে যে-ধারণা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সে-ধারণা যে পরিণত হয়েছে তা বলতে পারি।

বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে সমাগত সন্ন্যাসীবৃন্দ : (১) মাধবানন্দ (২) বীরেশ্বরানন্দ (৩) নির্বাণানন্দ (৪) সম্বুদ্ধানন্দ (৫) সুবিমলানন্দ (৬) প্রমাণানন্দ (৭) শুদ্ধসত্ত্বানন্দ (৮) গৌর মহারাজ (৯) প্রমানন্দ (১০) সাধন মহারাজ (১১) নাগরাজ মহারাজ (১২) দিবাকরানন্দ (১৩) সগুণানন্দ (১৪) অভয়ানন্দ (১৫) দয়ানন্দ (১৬) হরিপ্রেমানন্দ (১৭) অমোঘানন্দ (১৮) গৌরীশ্বরানন্দ (১৯) সূর্যানন্দ (২০) রঙ্গানাথানন্দ (২১) অজয়ানন্দ (২২) নিরাময়ানন্দ (২৩) লোকেশ্বরানন্দ (২৪) প্রজ্ঞানন্দ (২৫) জ্ঞানাত্মানন্দ (২৬) ভূতেশানন্দ (২৭) বিমল মহারাজ (খেতড়ি) (২৮) পরাশিবানন্দ (২৯) ঈশানানন্দ (৩০) শিশির মহারাজ (৩১) স্মরণানন্দ (৩২) ভাস্করানন্দ (৩৩) জীবানন্দ (৩৪) ধ্যানাত্মানন্দ (৩৫) নারায়ণ মহারাজ (৩৬) নিত্যানন্দ (৩৭) ত্রিবিক্রমানন্দ (৩৮) রসজ্ঞানন্দ (৩৯) সম্ভবানন্দ (৪০) কৈলাসানন্দ (৪১) সুনীল মহারাজ (৪২) নিত্যস্বরূপানন্দ (৪৩) যোগীশানন্দ (৪৪) সংযমানন্দ (৪৫) পুণ্যানন্দ (৪৬) শক্তিরূপানন্দ (৪৭) বগলানন্দ (৪৮) অসীমানন্দ (৪৯) অনুপমানন্দ (৫০) গৌর মহারাজ–২ (৫১) হিতানন্দ (৫২) ব্রহ্মেশ্বরানন্দ।
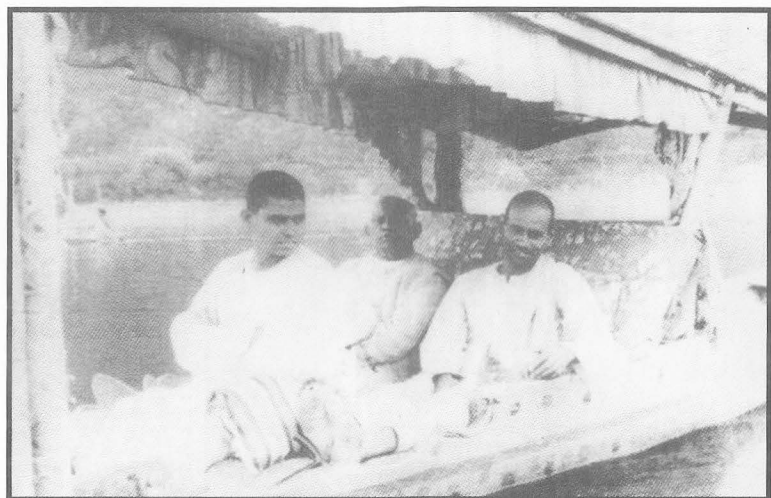
—বর্তমানে যে সংঘের রূপান্তর দেখছেন এবং সংঘের ভবিষ্যৎ—সে-সম্বন্ধে কী বলেন? এবিষয়ে আপনার বিস্তারিত ধারণাটা—প্রথম থেকে শেষ অবধি একটু বলুন না।

মহারাজ : দুরূহ প্রশ্ন। দুরূহ প্রশ্ন এইজন্য যে, আমরা ছেলেবেলায় আধ্যাত্মিক পিপাসা মেটানোর জন্যই এখানে সাধুদের সংস্পর্শে এসেছি। সংঘগুরু ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশে জীবনটা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। ধীরে ধীরে কর্মের প্রতি যে অনীহা ছিল সেটা কমেছে। আমার জীবনে এবং সমাজজীবনেও কতকটা কর্মের প্রতি অনীহা ছিল। এখন যারা আসছে, তাদের ভিতরেও আধ্যাত্মিক পিপাসা যে নেই, তা নয়। আছে।

—মূলত এটা নিয়েই তো আসে সবাই।

মহারাজ : কিন্তু ধীরে ধীরে কাজেতে এত জড়িয়ে পড়ে যে, ঐদিকে আর অত প্রবল দৃষ্টি থাকে না। ঘটনা তাতে কেন্দ্রীভূত থাকে না। ছড়িয়ে যায়। এই। ভবিষ্যতের কথা বললে বলব, আমরা ভবিষ্যৎকে তৈরি করব। ভবিষ্যৎ—এটা আপনা-আপনি যে হবে তা নয়। আমাদের চেষ্টার ভেতর দিয়ে, আমাদের জাগৃতির ভেতর দিয়ে, আমাদের গুরুদের পদাঙ্ক অনুসরণ সম্বন্ধে সচেতনতার দিক দিয়ে যেমনভাবে আমরা চলব, তার দ্বারাই সংঘের ভবিষ্যৎ নির্মিত হবে। এটা ঠিক—চেষ্টা যে নেই, তা নয়। চেষ্টা আছে। কিন্তু এখন বিস্তারটা ব্যাপক হওয়ার ফলে যারা আসছে তাদেরও আমরা খুব বেছে বেছে নিতে পারছি না। আর যাদের নিয়েছি তাদেরও কাজে এত জড়িয়ে রেখেছি যে, তাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের খুব সতর্ক দৃষ্টি নেই। এই একটা মুশকিল। তার ফলে সংঘের অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং এইজন্য চেষ্টাও করা হচ্ছে যাতে সেই দুর্ঘটনা না ঘটে। আমরা যাতে আবার জাগ্রত হয়ে উঠি—এইদিকে নজর দেওয়ার কথা মনে হচ্ছে।

—এর সঙ্গে আরেকটা কথা মহারাজ, রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব আধ্যাত্মিক সংঘকেও তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে।

মহারাজ : রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা মানে—আমাদের নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে তো বটেই, তবে তার দ্বারা আমরা আমাদের আদর্শকে dilute করিনি।

—তার প্রভাব তো পড়বে?

মহারাজ : হ্যাঁ, প্রভাব পড়ে। সরকারি অনুদান নেওয়ার ফলে তাদের নির্দিষ্ট যে-কাজ, তাই করতে হয় এবং যেমনভাবে তারা চায়, তেমনভাবে করতে হয়। এটা আমাদের কাছে খুব একটা অভিপ্রেত নয়।

—আশ্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও তো কিছু কিছু হস্তক্ষেপ হচ্ছে।

মহারাজ : হ্যাঁ, তা কিছু কিছু হচ্ছে।

—এতে যে-প্রভাব পড়ছে তাতেও তো রূপান্তর হচ্ছে। আপস করতে হচ্ছে কিছুর সঙ্গে। আমাদের এই আপস মূল ধারণা বা গতিবিধিকে কতটা প্রভাবিত করছে?

মহারাজ : যদি মূল আদর্শের দিকে আমাদের সচেতনতা থাকে তাহলে এই বাধাগুলো আমাদের হয়তো সাময়িকভাবে কিছুটা দমিয়ে রাখবে। কিন্তু আমাদের আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করতে পারবে না।

—আমাদের যে-কার্যপ্রণালী সেটা তো সমাজকে নিয়ে, মানুষকে নিয়েই হবে।

মহারাজ : তা তো বটেই।

—সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও তো কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন করতেই হবে।

মহারাজ : পদ্ধতির পরিবর্তন কোন্‌দিক দিয়ে হচ্ছে? পদ্ধতির পরিবর্তন হয়নি। আমরা যে সেবা করতে চাইছি, তা তখনো করতে চেয়েছি, এখনো করতে চাইছি। তবে তফাত হচ্ছে এই যে, তখন ক্ষেত্র খুব সীমিত ছিল এবং অল্প কয়েকজন সাধু তাঁদের জীবনকে ঐ কাজে একেবারে উৎসর্গ করে কাজ চালিয়েছেন। এখন তা সম্ভব নয়। এখন আমাদের বিস্তার এত হয়েছে যে, আমাদের পরিচালকবর্গের প্রশ্ন—এর চেয়ে ভাল কোথায় পাব? এই দৃষ্টিটা তৈরি হয়েছে। যাকে আপাত-অযোগ্য বলে মনে হচ্ছে, তাকেও আমরা কাজের ভার দিয়ে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি।

—তাতে কি আমাদের গুণগত মান নেমে যায় না?

মহারাজ : হ্যাঁ, নেমে যায়। তবে সমষ্টিগত দিক দিয়ে অত হয়তো নামে না। কিন্তু ক্ষেত্র হিসাবে নেমে যায়। আর আমাদের বিস্তার এত ব্যাপক হয়েছে যে, সব দিকে নজর রাখাও এখন সম্ভব হচ্ছে না। তবে সবসময় সতর্ক থাকা দরকার, সংঘ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

—ভবিষ্যতে এর ব্যাপকতা তো আরো বাড়বে। এই একশো বছরে আমরা যতটা দেখছি, আগামী একশো বছরে এর থেকে অনেক বেশি বিস্তৃতি হবে। কাজেই আগামী একশো বছরে আমাদের এই যে কর্মপদ্ধতি, সেটাকে কি কিছু বদলাতে হবে?

মহারাজ : পদ্ধতি বদলাবে কী বদলাবে না, এখন বলা যায় না। তবে আমাদের দিক দিয়ে যদি আদর্শকে ধরে রাখতে পারি তাহলে আমরা আদর্শভ্রষ্ট হব না। তার প্রয়োগ তখন কী করে হবে, কর্মপদ্ধতি কী হবে —সে ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করবে, পরিস্থিতি যেমন যেমন হবে।

—যেমন বৌদ্ধ সংঘ।

মহারাজ : বৌদ্ধ সংঘ ক্রমশ অবনত হয়েছে। সব জায়গায় হয়েছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও হয়েছে।

—তা, এটা কি অবশ্যম্ভাবী?

মহারাজ : অবশ্যম্ভাবী মানে, এক হিসাবে বলা যায় অবশ্যম্ভাবী। দেখ, খ্রিস্টানদের গোড়ার দিকে আধ্যাত্মিকতার যে-মান ছিল, এখন তা অনেক নেমে গেছে। ক্যাথলিকদের জীবন দিয়ে দেখ। তারপর মাঝে মাঝে এক এক জন ধর্মনেতা এসে ধর্মকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন, সেন্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি। তাঁকে প্রথমে খ্রিস্টান সংঘ স্বীকার করেনি, কিন্তু তারপরে তাঁকে সেন্ট করেছে। এরকম পরিবর্তন তো হবেই। স্বামীজীর এবিষয়ে একটা ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, পাঁচটা প্রজন্ম ক্রমশ অবক্ষয় হতে থাকবে। তারপর তার একটা এমন উত্থান নাকি হবে যে, অতীতের গৌরবকে ছাড়িয়ে যাবে।

—একটা সংঘের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একশো বছর কি অনেকটা সময়? কী মনে হয় আপনার? এই একশো বছর—এটা কি পরিণত হওয়ার সময়? নাকি এটাকে পরিণত অবস্থা বলা হবে?

মহারাজ : এটা ক্রমে ক্রমে হচ্ছে। পরিণত মানে যার পরে আর পরিবর্তন নেই। এক্ষেত্রে তা তো নয়। একটা সংঘ—ক্রমাগত তার বিস্তার আছে, তার কার্যকারিতা আছে।

—সেটা আছে। আমি বলছি যে, আমাদের তো একটা লক্ষ্য আছে—সেটাতে কি আমরা পৌঁছাতে পেরেছি? অন্তত কিছুটা—

মহারাজ : লক্ষ্য আমাদের সামনে আছে, সেই লক্ষ্যকে জীবনে রূপায়িত করা একটা পরীক্ষা।

—সেটা কতটা আমরা পেরেছি, কিরকম মনে হয় আপনার?

মহারাজ : তা বলতে পারি না।

—আমাদের লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে বলছি। স্বামীজীর ভাবগুলি কতটা পূরণ করতে পেরেছি।

মহারাজ : ঐ তো বলছি, লক্ষ্যপূরণের দিক দিয়ে, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সংঘের সামগ্রিক উন্নতি বোঝা খুব সহজ নয়। তবে ব্যক্তিজীবনে অবনতি হতে পারে এবং তা একটু লক্ষ করলে বোঝাও যায়।

প্রশ্ন : মহারাজ, সংঘের বিভিন্ন ধরনের কাজ করার সময় সাধুদের নিজেদের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হয় না, বাইরের লোকের সাহায্য নিতেই হয়। কিন্তু তাদের দিয়ে কাজ করাতে করাতে আমাদের মধ্যে একটা superiority complex তৈরি হয় এবং নিজেদের অহংকার, কর্তৃত্বাভিমান প্রকাশ পায়। এভাবে কি কর্মযোগ করা সম্ভব?

মহারাজ : নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কে বলল সম্ভব? এ নিয়ে আমি স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের সঙ্গে তর্ক করেছিলাম। তিনি বলতেন, একজন paid worker-কে দিয়ে যে-কাজ করানো যায়, আমাদের একজন সাধু বা ব্রহ্মচারীকে দিয়ে তা করানো হলে আমাদের একজন man-power-এর অপব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের কাজের ক্ষেত্র এখন এমন

প্রসারিত যে, আমরা নিজেরা সব কাজ করব বললে তা করা সম্ভব হবে না। পুরনো দিনে আমরা নিজেরাই যখন অনেক কাজ করতাম, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) বলতেন : "যারা আশ্রমে (paid worker হিসাবে) কাজ করছে, মনে করবি তারা তোদের সাহায্য করবার জন্য কাজ করছে। কখনো তাদের তুচ্ছ মনে করবি না। মনে করবি তারা তোদের কাজের সহায়ক।" আমরাও তখন যথাসাধ্য ঐ ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতাম। আশ্রমে বাইরের লোক যারা কাজ করত, তাদের আমরা অসম্মান করে কথা বলতাম না। তাদের খাওয়ার দিকে তখন যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হতো। ঠাকুরের প্রসাদী ফল-মিষ্টি চাকর-বামুনদের জন্য রেখে তবে ভাণ্ডারে খরচ করা হতো। মনে করা হতো যে, ওরা গরিবের ঘর থেকে এসেছে, ওদের আগে দেখতে হবে। অবশ্য আমরা সব যে বড়লোকের ঘর থেকে এসেছিলাম তা নয়, বলা যেতে পারে মধ্যবিত্তদের ঘর থেকে আমরা এসেছিলাম। তখন এই দৃষ্টি ছিল। আমি এখনকার কথা জানি না, কিন্তু এখনো তাই থাকা উচিত।

পাশ্চাত্যে কাজের লোককে চাকর বলে না, বলে সহায়ক। চাকর বললে তারা অসম্মানিত হয়। আর কাজের বাইরে তারা এই পার্থক্যটাকে বজায় রাখে না। কাজটা করে একসঙ্গে বসে তারা খাওয়া-দাওয়া করে। আমাদের দেশ এই dignity of labour-টা হারিয়ে ফেলেছে। এখানে এই সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের দেশে কিন্তু তা নয়। তুমি যেটা পার না আমি সেটা করছি। তোমাকে সাহায্য করছি। তোমার কাজের আংশিক ভার আমি বহন করছি। ওদেশে যেসব মেয়েরা waitress-এর কাজ করে, কাজের পর পোশাক-পরিচ্ছদ বদল করে তারাই আবার ম্যানেজারের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে। সকলেই সমপর্যায়ে—সেখানে কোন উচ্চপর্যায় নিম্নপর্যায় ভেদ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে কর্তৃত্ব যার আছে, এমন কারুর সামনের চেয়ারে কি কোন কাজের লোক বসতে পারে? না, পারে না। এটা আমাদের দেশে এসেছে প্রধানত ইংরেজদের কাছ থেকে। ইংরেজরা আমাদের দেশে যখন প্রথম

এল, তাদের আগে থাকতেই শিখিয়ে রাখা হয়েছিল যে, নেটিভদের সঙ্গো বেশি মিশো না। তোমাদের পর্যায়ে তাদের বেশি ঘেঁষতে দিও না। তাহলে তোমরা শাসন করতে পারবে না। ফলে কাজের লোকদের সঙ্গো তারা দাসের মতো ব্যবহার করে তাদের দূরে সরিয়ে রাখত। আমরা এই অপগুণগুলো পেয়েছি। আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু এরকমটা ছিল না। আমাদের পূর্বাশ্রমের বাড়িতে যে কাজ করত, মা তার সঙ্গো ছেলের মতো ব্যবহার করতেন। আমরা যা খেতাম, তাকেও তাই দেওয়া হতো। সে যেন আমাদের বড় ভাইয়ের মতো ছিল। সেই সম্পর্ক এই ইংরেজি প্রভাবের মধ্যে এসে নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ পরিবেশটা ফিরিয়ে আনার জন্য এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এখন এইটুকুই বলব যে, ঐ প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা ভাল নয়। সব কাজ কেউই একলা করে উঠতে পারে না। কাজেই পাঁচজনের সাহায্য নিতেই হয়। আমাদের সময় রিলিফের কাজ, এমনকি মোট বওয়ার কাজও আমরা করেছি। কিন্তু তখন কাজের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। সর্বোচ্চ হয়ত পাঁচ মাইলের মধ্যে রিলিফ চলত। কিন্তু এখন কাজের ক্ষেত্র এত বিশাল যে, আমরা একা ঐ কাজ করতে পারব না। কাজেই আর পাঁচজনের সাহায্য নিতেই হবে। কিন্তু সঙ্গো সঙ্গো ঐ দৃষ্টিটুকুও আমাদের ঠিক রাখতে হবে—কী, না—এরা আমাদের সহকারী। যে-কাজ আমরা নিজেরা পারি না, সেই কাজে এরা আমাদের সহায়তা করছে। এটা গুরুত্ব-সহকারে ভাববার কথা। তোমরা রিলিফের কাজে যখন যাবে তখন 'আমরা এই non-monastic-দের থেকে superior'—একথা যেন কখনোই তোমাদের মনে না আসে।

তারপর কথা হচ্ছে এই যে, আমরা যাদের সাহায্য করছি, তাদের থেকে আমরা superior—একথা সহজেই আমাদের মনে আসতে পারে। কারণ, তারা আমাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের এরকম ভাববার কিছুমাত্র অধিকার নেই। আমরা অপরের কাছ থেকে যে-ভিক্ষা পাই, তাই সাহায্যপ্রার্থীদের দিই। সেটা তাদেরই প্রাপ্য। আমরা তাদের দয়া করছি না। মাঝখানে থেকে, দানের মাধ্যম হিসাবে থেকে

আমরা তাদের সেবা করছি—এই বুদ্ধি রাখতে হবে। এই সেবাভাবের ওপর স্বামীজী খুব জোর দিয়েছেন। ঠাকুরের কথা—দয়া নয়, সেবা। এই ভাবটি যদি না থাকে, তাহলে আমাদের কর্ম ভূতের বোঝা বওয়া হবে। এই ভাবটিকে হারিয়ে ফেললে তা সর্বনেশে জিনিস হবে। আমাদের প্রাচীনরা সর্বদাই এই ভাব জাগানোর জন্য বলতেন—ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কাজ। স্বামীজীর কাজ—এই কথাটার তখন বেশ প্রচলন ছিল। স্বামীজীর কাজ মানে, আমরা তাঁর সেবক হয়ে সেখানে কাজ করছি। এ-বুদ্ধি থাকলে তবেই তা সাধনা হবে। আর তা না হলে তা আমাদের অহংকার, অভিমান ইত্যাদিকে বাড়িয়ে তুলবে। হয়তো বলতে পার যে, এটা আদর্শ হতে পারে, কিন্তু সে-আদর্শ নিয়ে আমরা কতটা চলতে পারি? একথা সত্যি। কিন্তু দেখ, জপ মানেও তো মন-প্রাণ একেবারে তাঁর চরণে অর্পণ করে তাঁর চিন্তা করা। কিন্তু তাও আমরা কতটুকু পারি? সব কাজ সম্পর্কেই এই কথা। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যা করব, সেটাই ঠিক ঠিক সাধন হবে। তা না হলে মনে হবে—'ও কী টো টো করে বেড়াচ্ছে; আমি একা দশ হাজার জপ করি।' তাতেও অভিমান বেড়ে যাবে। কোথায় জপ করে অভিমান দূর হবে—তা না, অভিমান বাড়ছে! তাহলে কি জপ করা বন্ধ করে দিতে হবে? তা নয়। সুতরাং কাজ করার সময় ভাবটি যাতে বজায় থাকে, সে-ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার।

আমি তোমাদের সঙ্গে একমত যে, কথাটা বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন। আদর্শকে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা কঠিন। কিন্তু আদর্শকে লক্ষ করে আমরা সকলেই চলতে পারি। কঠিন কাজ, কিন্তু যে-পথে এসেছি, সেই পথটাই তো কঠিন। তোমরা বলবে : 'আপনি কি পুরো করেন?' আমি বলব—না, আমিও পুরো পারি না। কিন্তু আদর্শ জীবন আমরা চোখে দেখেছি, জানি। সে-আদর্শ যদি আমি মেনে চলতে না পারি, সে আমার ত্রুটি। কিন্তু আদর্শকে ধরে রাখতে হবে। আদর্শহীন হলে আমাদের জীবন হবে হালছাড়া নৌকোর মতো। ঠাকুর, মা, স্বামীজী—এঁরা হলেন আদর্শ, আমাদের চোখের সামনে রয়েছেন। শাস্ত্র

শুধু নয়, জ্যান্ত শাস্ত্র। শাস্ত্র যাঁদের দ্বারা প্রমাণিত হয়, এমন মানুষ এঁরা। এরকম চরিত্রকে লক্ষ করে চললে আমাদের মান অন্তত কিছুটা উন্নত হবে। কারণ, আমাদের দেখেই লোকের ঠাকুর-স্বামীজী সম্পর্কে ধারণা হবে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা সাধারণ মানুষ নই। আমরা ঠাকুর-স্বামীজীর প্রতিনিধি। মনে খুব করে সংকল্প করতে হবে, যাতে আমরা নিজেদের বড় না ভাবি। স্বামী যোগানন্দ বাগানের মালি ভেবে ঠাকুরকে বলেছিলেন : "এই মালী, ঐ ফুলটা তুলে দাও তো।" ঠাকুর কিছু না বলে ফুলটি তুলে দিয়েছিলেন। পরে জানতে পেরে যোগানন্দজী অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। ঠাকুর কিন্তু কিছু মনে করেননি। এত অভিমানশূন্যতা! আমরা যদি নিজেদের তাঁর দাসানুদাস বলি, আবার কর্তৃত্বাভিমানী হই, তাহলে আমরা তাঁদের অস্বীকার করছি। আমরা যে তাঁর দাস—এই কথা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা অস্বীকার করছি।

কর্তৃত্বাভিমান থাকলে কর্মযোগ হবে না। 'আমি' 'আমি' যদি কর, তাহলে তাঁর কাজ হবে না। তোমার কাজ হবে। তখন ভুগতে হবে। আর যদি 'তাঁর কাজ'—এই বোধ থাকে, তাহলে কর্মের ফল থেকে নিষ্কৃতি পাবে। যদি ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তাঁর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তাহলে আর বেচালে পা পড়বে না।